অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য
সম্পাদিত

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬০

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রক—মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

টেম্পল প্রেস

২, ন্যায়রত্ন লেন

কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই—

বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

ভূমিকা

১

উৎসমুখে আধুনিক বাংলা ছোটগল্প গঙ্গা-যমুনার যুগলধারায় প্রবহমান
ন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার। রবীন্দ্র-কবিমানসের স্বর্মন্দাকিনীই ছোটগল্পে
ভাগীরথীরূপে মানুষের আনন্দ-বেদনায় কলনাদিনী; তাই তার
পাবন-প্রবাহে মৃৎপুত্তলিকাও ক্ষণে ক্ষণে দেবতার অমর মহিমায়
দীপ্তিমান। প্রভাতকুমারের যমুনা মৃত্যুসহোদরা কালিন্দী, তার
নির্মল নীলাভ জলে পার্থিব জীবনেরই স্বমহিমচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত
র কূলে কূলে হৃদয়বৃন্দাবনে যে প্রেমের বংশীধ্বনি ওঠে তা
মৃত্যুশাসিত মরজীবনেরই প্রাণবায়ুতে নিঃশ্বসিত।

প্রভাতকুমারের আবির্ভাব [১২৭৯-১৩৩৮] রবীন্দ্রনাথের প্রায় এক
পরে। গল্পরচনার ক্ষেত্রেও উভয়ের যাত্রারম্ভে যুগান্তরের ব্যবধান
'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম গল্প 'ঘাটের কথা' ১২৯১ সালে রচিত আর
প্রভাতকুমারের প্রথম গল্পসংকলন 'নবকথা'র রচনাকাল ১৩০
কে ১৩০৬ সাল। বর্তমান সংকলনের গল্পমালা কালানুক্রমিক ভাবে
জ্জিত। প্রথম গল্প 'কুড়ানো মেয়ে' রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের তি
খণ্ড 'গল্পগুচ্ছে'র চুরাশীটি গল্পের তিপ্পান্নটি লেখা শেষ হয়ে গেছে। কিন্ত
কালের অভিজ্ঞানে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের অনুযাত্রী হলেও শিল্পের
অভিজ্ঞানে তিনি পূর্বসূরির সার্থক উত্তরসাধক মাত্রই নন, দৃষ্টিতে ও
সৃষ্টিতে তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে ও স্বকীয়তায় অনন্যপরতন্ত্র। ব্যক্তিগত
ভাবে জীবনের প্রারম্ভে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও সাহচর্য
লাভ করেছিলেন। সেদিক দিয়ে রবীন্দ্র-গোষ্ঠীভুক্ত হলেও রবীন্দ্র
গোত্রের শিল্পী তিনি নন।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি, প্রভাতকুমার মূলত কথাকোবিদ
রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্প কল্পনাভূয়িষ্ঠ, প্রভাতকুমার বাস্তব
সত্যে নিষ্ঠাবান। 'গল্পগুচ্ছ' যেখানে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে

সেখানে জীবনের কবিভাষ্যই মুখ্য, প্রভাতকুমারের যেখানে উৎকর্ষ সেখানে জীবনই আত্মস্বরূপে প্রকাশপরায়ণ। রবীন্দ্রনাথের রচনায় কবিধ্যেয় ভাবসত্যই গল্পদেহে বিরাজমান, প্রভাতকুমারের গল্পে প্রাথমিক আবেদন গল্পের মধ্যেই। ভাবাত্মা তাঁর গল্পদেহে অনুবি নয়, গল্পদেহেই তার উদ্ভব। তাঁর রচনা পরিদৃশ্যমান জীবনে পরিচ্ছন্ন অনুকৃতি। তাই জীবনের ব্যাখ্যান নয়, প্রকাশনেই তাঁর শিল্পকর্মের পরা-গতি। সমকালীন লোকপ্রিয়তায় প্রভাতকুমার বাংলা মোপাসাঁ বলে অভিহিত হতেন। ছোটগল্পের রূপসৃষ্টিতে মোপাসাঁ এখনো পৃথিবীর সাহিত্যে অননুকরণীয় শিল্পী বলেই মনে হ প্রভাতকুমার মোপাসাঁর মতই ছোটগল্পের রূপদক্ষ শিল্পী। মোপাস মতই প্রভাতকুমারও জীবনের ভাষ্যকার নন, উন্মেষকার। এদি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মোপাসাঁর সঙ্গেই তাঁর শিল্পের গোত্র-বং সমধিক সাদৃশ্য।

কিন্তু পার্থক্যও আছে। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধের অধিক ফরাসী কথাশিল্পীর মত মোপাসাও 'প্রকৃতিবাদী'। মানুষে ও পশু জীবলোকে ও নিসর্গলোকে একই প্রাকৃতিক শক্তির সার্বভৌম উ রহস্যকে স্বীকার করাই প্রকৃতিবাদের মূল কথা। এই দৃষ্টিভঙ্গি মোপাস সাহিত্যে তির্যকভাবে ক্রিয়াশীল। মানুষ তার সত্তায় এক আ পশুকে বহন ক'রে চলেছে। তার সমস্ত সভ্যতা ও শোভনতার অন্তরা তার এই পশুপ্রবৃত্তির তাড়নাই মুখ্য। জীবনের নাটকীয় মুহূ যখন সমস্ত ভব্যতার মুখোশ খসে যায় তখন এই পশুর আত্মপ্রক ঘটে। মোপাসাঁর সাহিত্যে মানুষের ধাতুপ্রকৃতিতে এই পাশব-সত্ত লীলারহস্যই বারবার উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু প্রভাতকুমারের সাহিত্যে মানুষের পশুপ্রবৃত্তি নয়, হৃদয়বৃত্তিরই জয়গান। সে হৃদয়বৃত্তি আ রতিপরায়ণ জৈবধর্মের উর্ধে প্রিয়জন-প্রীতিকামনায় মধুর ও সুন্দর। প্রভাতকুমার স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে পৃথিবীর নরনারী মা

মধ্যেই স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার এক চিরন্তনী ফল্গুধারার সন্ধান করেছেন। এদিক দিয়ে তাঁর 'দেশী ও বিলাতী' গল্পমালায় 'বিলাতী' পর্যায়ের গল্পগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়। বর্তমান সংকলনে 'ফুলের মূল্য' ও 'মাতৃহীন' গল্প দু'টি এই পর্যায়ভুক্ত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ইংরেজ-শাসিত ভারতের দৃষ্টিতে ইংরেজ জাতি সম্পর্কে দু'টি মনোভাবই স্বাভাবিক হল। প্রথমত শাসক হিসেবে ওদের প্রতি ক্ষমাহীন ঘৃণা ও বিদ্বেষ, এবং দ্বিতীয়ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত এক শক্তিমান জাতি হিসেবে ওদের প্রতি ঈর্ষাবিমিশ্র শ্রদ্ধা। কিন্তু শাসকের প্রতি শাসিতের দুর্বল মনোভাব থেকে প্রভাতকুমারের শিল্পদৃষ্টি মুক্ত ছিল। বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে তিনি ইংরেজ সমাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে আসেন এবং তারই ফল স্বরূপ কয়েকটি সার্থক রচনা ক'রে বঙ্গভারতীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। বিদেশী সমাজ বিদেশের নরনারী নিয়ে গল্প-প্রবন্ধ প্রভাতকুমারের আগেও লেখা হয়েছে, পরেও হচ্ছে। সেগুলি হয় রোমান্স-রাগ-রঞ্জিত, নয় বিশ্লেষণ-রীতি-মুখর। কিন্তু প্রভাতকুমারের সৃষ্টি সমপ্রাণতার রসে অভিষিক্ত, সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদনায় মধুস্বাদী। মানব-হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রভাতকুমারের দৃষ্টি যে দেশবিদেশের ভৌগোলিক গণ্ডি অতিক্রম ক'রে এক সর্ব-মানব-সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছিল আলোচ্য পর্যায়ের গল্পগুলি তারই উজ্জ্বল নিদর্শন।

'ফুলের মূল্য' গল্পটি এক প্রবাসী যুবকের জন্য জননী ও ভগিনীর -উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল হৃদয়ের মর্মস্পর্শী আলেখ্য। তিনটি প্রাণী নিয়ে একটি দরিদ্র ইংরেজ পরিবার। পুত্র গিয়েছে ভারতবর্ষে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যরক্ষীবাহিনীর সৈনিকের চাকরি নিয়ে। জরাতুরা জননী দীর্ঘ-কাল সুদূরপ্রবাসী সন্তানের কোনো সংবাদ না পেয়ে অধীর হয়েছেন। দশবর্ষীয়া কিশোরী কন্যা সিভিল সার্ভিস স্টোর্সে টাইপিস্টের কাজে সামান্য উপার্জন করে তাই দিয়ে দায়িত্ব নিয়েছে পরিবার প্রতি-পালনের। দরিদ্র ইংরেজ জননীর কাছে ভারতবর্ষ সর্প ব্যাঘ্র আর দুরারোগ্য ব্যাধির দেশ। এমন ভয়ংকর দেশে গিয়ে পুত্র কেমন আছে নিয়ে জননীর দুর্ভাবনার অন্ত নেই। সৈনিক পুত্র মাকে পাঠিয়েছে

ভারতীয় যোগী-প্রদত্ত একটি স্ফটিকখচিত যাদু-অঙ্গুরীয়। সংযত চিত্তে স্ফটিকের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে দূরবর্তী যে-কোনো মানুষের চিন্তা কর তার কার্যকলাপ নাকি ওতে প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্ধবিশ্বাসে মাতাপু অঙ্গুরীয়-দর্শনে দূরযানীকে নিকটে দেখার বৃথা চেষ্টা করেছে বারবার। ওদের ধারণা কোনো নিষ্ঠাবান হিন্দুর দ্বারা এ চেষ্টা সফল হবে। ত বহুসন্ধানে লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্র গুপ্তের সন্ধান পেয়ে মেয়েটি সকাত অনুনয়ে তাঁকে নিয়ে গেছে মা'র কাছে। ধীরে ধীরে মা ও মেয়ে সঙ্গে এই অপরিচিত বিদেশী যুবকের গড়ে উঠল ঘনিষ্ঠতা। ভারতে তখন চলছে সীমান্ত যুদ্ধ; পুত্রটি যে-বাহিনীতে আছে তারা ঐ যুদ্ধে লিপ্ত। সংবাদ শুনে জননী শয্যা নিয়েছেন। মেয়েটি ডেকে নি গেল গুপ্তকে। সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, ঐ কাচ-বসানো পেতলে আংটির দিকে তাকিয়ে গুপ্ত মাকে আশ্বাস দিয়ে বলুন, তাঁর ছেলে ফ্রাঙ্ক জীবিত আছে, সুস্থ আছে। জননীকে প্রবোধ দেবার জন্য গুপ্তকে মিথ্যাই বলতে হল। বিশ্বাসের বলেই হয়ত মা সে-যাত্রা সেরে উঠলেন, কিন্তু পুত্র ফ্রাঙ্ক সীমান্ত যুদ্ধেই নিহত হল। অবশেষে গুপ্তর যখন দেশে ফেরার সময় এল তখন বোনটি শেষবিদায় নিতে এসে তাঁর হাতে তুলে দিলে একটি শিলিং। বললে, দেরা-গাজিখাঁর কাছে ফোর্ট মনরোতে ফ্রাঙ্কের সমাধি রয়েছে, গুপ্ত যখন সেখানে যাবেন তখন যেন এ শিলিঙের বিনিময়ে কিছু ফুল কিনে ফ্রাঙ্কের সমাধির উপর সাজিয়ে দেন।

নিতান্তই একটি শিলিং। অর্থজগতে কিই-বা তার মূল্য! কিন্তু প্রাণের জগতে তার কি কোনো পরিমাপ আছে? দরিদ্রের সংসারে বহুশ্রমার্জিত সামান্য আয় থেকে সঞ্চিত এই শিলিংটি মৃত্যু-শোকাহত মানবহৃদয়ের পবিত্র স্পর্শে অসামান্য।

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব-চেয়ে পুরাতন কথা, সব-চেয়ে
গভীর ক্রন্দন, "যেতে নাহি দিব।" হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

মর-জীবনের এই চিরন্তন ট্রাজেডিই 'ফুলের মূল্য' গল্পে বাঙ্ময় রসমূর্তি লাভ করেছে।

'মাতৃহীন' গল্পটি একটি পূজারিণী-হৃদয়ের পবিত্র মাধুর্যে অপূর্ব সুন্দর। ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে আবিষ্কৃত বর্ষীয়সী শুভ্রকেশিনী ইংরেজ মহিলার চরিত্রটি ত্যাগে ও নিষ্ঠায় দেশকাল-নিরপেক্ষ মানব-মাহাত্ম্যে সর্বজনপূজ্য। 'মাতৃহীন' প্রেমের গল্প। জীবন-রঙ্গমঞ্চে একটি গার্হস্থ্য নাটকের ট্রাজিক কাহিনী। লণ্ডনের অনতিদূরবর্তী একটি শহরতলীতে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের তরুণী কন্যা মিস ক্যাম্বেল এর নায়িকা, আর নায়ক একজন বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় শিক্ষার্থী যুবক। তরুণ তরুণী উভয়েই সুশিক্ষিতা এবং সুকর্ষিতমনা। মে মাসের পরিষ্কার নীল আকাশের নীচে বাটারকপ, প্রিমরোজ আর ডেজি ফুলের বাগানে মীনকেতুর দৌত্যে প্রেমের স্বপ্ন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিবাহের অনুমতি চাইতে গেলে কন্যার উদার পিতা উভয়কে এক বৎসর আত্মপরীক্ষা করতে বললেন। এক বৎসরের বিচ্ছেদে প্রেম উজ্জ্বলতর হল। যুবক দেশে পিতার অনুমতি ও আশীর্বাদ চেয়ে পত্র লিখল। কিন্তু অনুমতি দেওয়া কি এতই সহজ? একমাত্র পুত্রের বৃদ্ধ পিতা ছুটে গেলেন লণ্ডনে। এ বিবাহ ঘটলে জন্মের মত পুত্রের জাতিচ্যুতি ঘটবে—বংশাবলীক্রমে আর কখনো সমাজে ওঠবার আশা থাকবে না। ছেলেকে ঘরে নেওয়া যাবে না, পিতা-মাতার মৃত্যুকালে তাঁদের মুখে জলগণ্ডূষ তুলে দেবার অধিকার পর্যন্ত তার থাকবে না। এ অসম্ভব! পুত্র কিন্তু নিজের সংকল্পে অটল। আশ্চর্য, শেষটায় বেঁকে বসল মেয়েটি। আকর্ষণ যত দুর্নিবারই হোক, পিতামাতার বুক থেকে একমাত্র ছেলেকে ছিনিয়ে নেওয়াতে কল্যাণ নেই। প্রেমিক ভুল বুঝল, ঐকান্তিকতায় সন্দেহ করল। কিন্তু মেয়েটি তখন ত্যাগের মন্ত্রে সর্ববিজয়িনী। পুত্র চলে গেল পিতার সঙ্গে। মেয়েটি বেঁচে রইল তার আজীবনব্যাপী তপশ্চর্যায় প্রেমের সাধনাকে অমর ক'রে যেতে। নাটকের শেষ অঙ্কে এই মেয়েটিই ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে বর্ষীয়সী শুভ্রকেশিনী মহিলা। প্রিয়তমের মৃত্যুসংবাদ জেনে হিন্দুবিধবার নিষ্ঠায় প্রতীক্ষা করছেন মৃত্যুর। ইহ-জগতের পরপারে বাঞ্ছিতের সঙ্গে চিরমিলন হবে—এই বিশ্বাসেই প্রেমের পূর্ণাহুতি দিচ্ছেন। ইহজীবনে প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর

হল না, কিন্তু দৈবযোগে জীবনের গোধূলি-লগ্নে যার সঙ্গে দেখা হ'ল সে যে তাঁরই চিরবাঞ্ছিতের ঔরসজাত পুত্র! নাই বা তাকে গর্ভে ধারণ করলেন, তবু অমলিন মাতৃস্নেহে তাকেই পুত্র বলে স্বীকার ক'রে নিলেন।

বলাই বাহুল্য, বিলিতি সমাজের নরনারীদের যে ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে, তার সঙ্গে প্রভাতকুমারের সৃষ্ট নরনারীর তেমন মিল নেই। হয়ত প্রভাতকুমারের দৃষ্টি বাস্তবকে ভাবলোকের অম্লান সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করেছে। কিন্তু প্রভাতকুমার স্থান-কাল ও সমাজভেদ সত্ত্বেও মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার মধ্যে একটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন হৃদয়-সত্তার সন্ধান করেছেন এবং সে সত্তা মানুষকে পশুর পর্যায়ে অবনমিত করে না, তাকে মনুষ্যত্বের বিশিষ্ট মহিমায় প্রাণপর্যায়ের সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত করে।

এই অধিমানসিক রসপিপাসা দিয়ে প্রভাতকুমার মানবহৃদয়ের সঙ্গে মানবেতর প্রাণীরও রাখীবন্ধন করেছেন। 'আদরিণী' গল্পে জয়রাম মোক্তার এবং তাঁর কন্যাপ্রতিমা হস্তিনী 'আদরিণী'কে নিয়ে যে মিলন-বিচ্ছেদ-কথা রচিত হয়েছে তা বাংলার আগমনী-বিজয়ার মতই বাৎসল্য-রসমধুর। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়বে বাল্জাকের অবিস্মরণীয় 'মরুর মায়া' বা 'প্যাশন ইন দ্য ডেজার্ট' গল্পটি। 'মরুর মায়া' ফরাসী প্রকৃতিবাদের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মরুভূমির গুহাশ্রয়কামী পলাতক সৈনিকের প্রতি বাঘিনীর যে ভাবাবেশ এ গল্পে পরিস্ফুট হয়েছে, এবং চরম বিশ্বাসঘাতকতায় মানুষের যে হিংস্র আচরণ তাকে বন্য শ্বাপদের চেয়েও হীনতর ক'রে তুলেছে, তার রহস্যময় বর্ণনায় বাল্জাক অত্যুৎকৃষ্ট কবিকৃতির পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাল্জাকের গল্পে শেষপর্যন্ত পরস্পর-সংগ্রামশীল জীবজগতের আত্ম-রক্ষার আদিম প্রবৃত্তিই জয়যুক্ত হয়েছে। এখানেই বাল্জাকের সঙ্গে প্রভাতকুমারের পার্থক্য। প্রভাতকুমারের 'আদরিণী'তে পারস্পরিক স্নেহাকর্ষণই সর্বজয়ী। অবস্থার বিপাকে পড়ে সেই স্নেহসম্পর্কের অবমাননা করতে গিয়েই ঘনিয়ে এসেছে অন্তিম পরিণাম। বামুন-হাটে চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা থেকে ফিরে আসার পরও যখন আবার

রসুলগঞ্জের হাটে আদরিণীকে বাধ্য হয়ে পাঠাতে হল তখন সে আঘাত এই অবোলা জীবের পক্ষে যতটা মর্মান্তিক, জয়রাম মুখুজ্জের পক্ষেও ততটাই দুর্বিষহ। তাই আদরিণীর মৃত্যুর দু'মাসের মধ্যেই মুখুজ্জে মশায়ও এই নিষ্ঠুর সংসার পরিত্যাগ ক'রে গেলেন।

৩

আসলে প্রভাতকুমারের গল্পে মানবহৃদয় এক উন্মুক্ত উদার নীলাকাশে সীমাহীন প্রসারতা লাভ করেছে বলেই সেখানে আকাশের হাসি মধুর জ্যোৎস্না হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রভাতকুমার হাস্যরসিক নন, কিন্তু হাসি তাঁর গল্পদেহে স্নিগ্ধ লাবণ্যের মত নয়নাভিরাম। তাঁর দৃষ্টিতে আছে প্রসাদগুণ, তাই তাঁর সৃষ্টিতে হাসির মধুস্বাদ। জীবনকে উদার চোখে দেখার সঙ্গে সহজ চোখে দেখারও সাধনা তিনি করেছেন। কবিগুরুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনিও যেন আপন শিল্পিমানসকে বলতে চেয়েছেন,

'ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন শিরীষফুলের অলকে।'

বিশুদ্ধ শিল্পদৃষ্টি একেবারে দার্শনিকের 'তটস্থ দৃষ্টি' হওয়া হয়ত সম্ভব নয়, তাই শিরীষ ফুলের অলকে শিশিরবিন্দুর কল্পনাটি শিল্পসম্মত অনাসক্তিযোগের অনবদ্য উদাহরণ। কি ভাবে যে কতটুকু লগ্ন হয়ে আছে, আর কখন যে টুপ্ ক'রে আলগা হয়ে গেল, তা যেন প্রত্যক্ষগোচরতার বাইরে। শিল্পী প্রভাতকুমারের এই দৃষ্টিসাধনার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে বিশেষ ক'রে 'বলবান জামাতা', 'প্রণয় পরিণাম' এবং 'নিষিদ্ধ ফল' গল্প তিনটিতে।

'প্রণয় পরিণাম' বাল্যপ্রণয়ের হাস্যমধুর কাহিনী। নায়ক মাণিকলাল হিন্দু বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। বয়স চতুর্দশ বৎসর। নায়িকা কুসুমলতা সবেমাত্র একাদশে পদার্পণ করেছে। প্রতিবেশী দুই পরিবারের এই দু'টি বালকবালিকা আবাল্য একসঙ্গে কত খেলাধূলো করেছে,

কোনোদিন চিত্তচাঞ্চল্যের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু চৌদ্দ বছরে পা দিয়ে মাণিকলাল একদিন কুসুমদের বাগানে পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা খেতে খেতে হঠাৎ সদ্যস্নাতা একাদশী কুসুমলতাকে সম্মুখ দিয়ে যেতে দেখে প্রেমে পড়ে গেল। সদ্যপঠিত উপন্যাসমালার প্রেম-রসে তখন মাণিকের কিশোর-হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ। তার চোখে পৃথিবীর চেহারা বদলে গেল, উপন্যাসের নায়িকা নেমে এল প্রতি-বেশিনীর তনুদেহকে আশ্রয় ক'রে। মাণিক আর ফুটবল খেলে না, জিম্‌ন্যাস্টিক করা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, দুপুরে ইস্কুল পালিয়ে গঙ্গাতীরে বসে কবিতা লেখে; আর প্রভাতে সন্ধ্যায় নানা ছলে কুসুমদের বাড়ি গিয়ে কুসুমকে দেখে আসে।

প্রেমযাত্রায় পথপ্রদর্শকের অভাব হল না। মাণিকের পিসতুতো দাদা প্রভাস হল উপদেষ্টা। কুসুমরা যখন মাণিকদের স্বঘর তখন মিলন হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়! সর্বাগ্রে প্রয়োজন কুসুমের মন জেনে নেওয়া। কবিতায় প্রণয় নিবেদন ক'রে সেদিকটারও আভাস পাওয়া গেল। এখন চাই পিতৃদেবের অনুমতি। মাণিকের পিতা নন্দ চৌধুরী গ্রামের ডাক্তার, প্রচুর পশার। অত্যন্ত রাশভারি লোক। সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে, তবু প্রভাস দৌত্যকার্যে সম্মত হল। কিন্তু, কবি সত্যই বলেছেন, যথার্থ প্রণয়ের পথ কখনো মসৃণ হয় না! নন্দ চৌধুরী যথাকালে পুত্রের সংবাদ পেলেন এবং যথোচিত ব্যবস্থার জন্য তাকে কাছে ডেকে পাঠালেন। এক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাই হল। পিতার রোষকষায়িত নেত্র, কর্ণমর্দন, এবং গণ্ডদেশে কয়েকটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত-বর্ষণেই অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল।

বলাই বাহুল্য, গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে শুদ্ধমাত্র পরিবেশনের মুন্সিয়ানায়। কিশোর-মনের প্রথম প্রণয়-চাঞ্চল্য কোথাও স্বাভাবিকতা হারায় নি। কৈশোরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে বালকের যুবকোচিত আচরণের মধ্যে যে হাস্যোদ্দীপকতার সৃষ্টি হয় লেখক স্মিতহাস্যমণ্ডিত কৌতুকের সঙ্গেই তা প্রকাশ করেছেন। প্রবীণের চোখে শিশুর আচরণ চিরদিনই বাৎসল্যরস-সঞ্চারী স্নিগ্ধহাসির উপকরণ। প্রভাত-কুমার প্রাজ্ঞের সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে অবাস্তব-স্বপ্নদেখা কিশোরের আচরণের

মধ্যেও মধুর হাস্যরসের সন্ধান করেছেন। কিশোর-কিশোরী-লীলার দেশে তাঁর এই নতুন দৃষ্টি জীবনের নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে।

'বলবান জামাতা' গল্পে মুখ্যত ঘটনাসংস্থানের দ্বারাই রস-পরিবেশন সার্থক হয়েছে। এককালে 'গ্রহের ফের' নামে নাট্য-রূপায়িত হয়ে এই কাহিনী রঙ্গমঞ্চে প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। 'বলবান জামাতা' নামকরণের মধ্যেই গল্পের ভাবসংকেতটি লুক্কায়িত আছে। নলিনীকান্তের যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর মূর্তিটি দিব্য গোলগাল নন্দদুলালি ধরণের ছিল। গাল দু'টি টেবো টেবো, হাত দু'খানি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠদেশের কোমল অস্থিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন। বাসরঘরে বিদুষী শ্যালিকার ক্ষুরধার রসনা এ নিয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে নলিনীবাবুকে জর্জরিত করেছে। সুন্দরী-মুখনিঃসৃত শ্লেষবাক্যে চরম অপমানিত হয়ে নলিনীবাবু প্রতিজ্ঞা করলেন, এ কলঙ্ক মোচন করতেই হবে। তারপর দু'বছর ধরে চলে স্যাণ্ডোর ডাম্বেল সহযোগে নিয়মিত ব্যায়াম। নলিনীকান্ত থাকেন কলকাতায়। বিয়ের পর নববধূ এলাহাবাদে পিত্রালয়েই ছিলেন। দু'বছর পরে নিজের সাধনালব্ধ পুরুষত্ব নিয়ে নলিনীকান্ত এলাহাবাদে শ্বশুরগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পরিধানে পায়জামা ও লম্বা পাঞ্জাবি কোট, মস্তকে পাগড়ি। হাতে একটি বৃহদায়তন লাঠি এবং মালপত্রের সঙ্গে একটি বন্দুকের বাক্স। এলাহাবাদ স্টেশনে নেমে গাড়োয়ানকে মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাড়ি পৌঁছে দিতে বলায় সে সানন্দে আদেশ পালন করল। গৃহকর্তা তখন পাশার আড্ডায় অন্যত্র গিয়েছিলেন। জামাতার আবির্ভাবে বাড়ির চাকর দারোয়ান এবং নেপথ্য-চারিণীরা যথাসাধ্য আদর আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু কিছু পরেই বুঝতে পারা গেল যে, গাড়োয়ান ভুল ক'রে নলিনীবাবুকে অন্যের বাড়িতে তুলে দিয়েছে। বাড়ির লোক বাড়িতে ডাকাত পড়েছে ভেবে কর্তাকে ডাকতে গেল। আসলে শহরে তখন দু'জন মহেন্দ্রবাবু উকিল ছিলেন। একজন ঘোষ আর একজন বন্দ্যোপাধ্যায়। গৃহকর্তা ফিরে আসার পর নলিনীকান্ত তাঁকে এই দৈব-বিড়ম্বনার কথা ব'লে সহাস্যে নিজের শ্বশুরগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা

করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আপন-শ্বশুরও পাশার আড্ডায় তাঁর মিত্র-গৃহে ডাকাত-পড়ার সংবাদ শুনে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছেন। কিছু-ক্ষণ পরেই কম্পাউণ্ডে ভাড়াটে গাড়ি থেকে নামলেন বৃহৎ যষ্টিহস্তে ষণ্ডামার্কা আকারের তথাকথিত জামাতা। কিন্তু মাত্র দু'বছর আগে যে নবনীতকোমল নন্দদুলাল জামাতাকে তিনি সজ্ঞানে বরণ করে-ছেন তার কি এরকম গুণ্ডার মত চেহারা হতে পারে? ডাকাত ভেবে নলিনীকান্তের শ্বশুর জামাতাকে বাড়ি থেকে দিলেন তাড়িয়ে।

একই নামে একই বৃত্তিসম্পন্ন দুই ব্যক্তি থাকার ফলে এ জাতীয় ভ্রান্তিবিলাস অসম্ভাব্য নয়, এবং প্রভাতকুমার ঘটনাসন্নিবেশের চমৎ-কারিত্বে গল্পটিতে অট্টহাসির অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু রমণীশোভন কমনীয়তার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় নলিনী-কান্তের ডাম্বেল-সাধনা লেখকের প্রচ্ছন্ন কৌতুকের বিষয়ীভূত হবার ফলেই গল্পের হাস্যরস জীবনের তাপে দানাবাঁধার সুযোগ পেয়েছে।

জীবনের স্বাভাবিকতাকে উদ্ভট বিধিনিষেধের দ্বারা অবরুদ্ধ ক'রে কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টায় যে বক্রগতির সৃষ্টি হয় তারই আলেখ্য 'নিষিদ্ধ ফল' গল্পটি। ভবানীপুরের রায়বাহাদুর প্রফুল্ল-কুমার মিত্র প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েও আদর্শবাদী সজ্জন। বিবাহে তিনি পণপ্রথার ভয়ঙ্কর বিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্রের তিনি ছেলে-বেলাকার বন্ধু। সেই সুবাদে বঙ্কিমকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন 'লভ্ আর লড়াই'এর গল্প ছেড়ে দেশের উপকার হয় এমন খানকয় বই যেন তিনি লেখেন। বন্ধুর হিতকথায় বঙ্কিম কর্ণপাত করেন নি; তাই রায়বাহাদুর নিজেই 'সামাজিক-সমস্যা-সমাধান' নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্র হেমন্তকুমার বি-এ পড়ছে। বাগবাজারের দরিদ্র দুর্গাচরণবাবুর দ্বাদশী কন্যাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করতে তাঁর আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু একটিমাত্র শর্ত, বাল্য-বিবাহে তাঁর আপত্তি না থাকলেও মেয়ের বয়স ষোল আর ছেলের বয়স চব্বিশের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হওয়া চলবে না। অগত্যা রায় বাহাদুরের বিপুল সম্পত্তি আর পাত্রের যোগ্যতার কথা চিন্তা ক'রে দুর্গাচরণবাবু সেই শর্তেই সম্মত হলেন। পরবর্তী ফাল্গুনেই বিয়ে

হয়ে গেল। হেমন্তকুমারের বি-এ পরীক্ষার বৎসর। কিন্তু আষাঢ় মাস এলে সে মেঘদূত মুখস্থ ক'রে আর পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরহমূলক নানা কবিতা লিখে বর্ষাযাপন করতে লাগল। বিয়ের পর গৃহের বহির্মহলে সে নির্বাসিত হয়েছে, অন্দরমহলে নববধূ। আহার বা জলযোগের সময় ছাড়া অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুমতি নেই। কিন্তু তারই মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হতে লাগল। ক্রমে পত্র-বিনিময়, তাম্বুল-বিনিময়ের চোরাগলিপথে নিষেধের বাঁধ ভাঙতে শুরু হল। পুত্ররচিত 'চকোরের ব্যথা' কবিতা পড়ে রায়বাহাদুর অবিলম্বে বউমাকে পিতৃগৃহে পাঠালেন। কিন্তু সেখানে চৌর্যমিলনের পথ প্রশস্ততর হল মাত্র। পরীক্ষার ফল বেরুলে পুত্রের নাম গেজেটের কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। পিতা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন পুত্রকে মেসে পাঠিয়ে। তারই ফলস্বরূপ একদিন দুপুর রাতে চোর ধরতে গিয়ে রায়বাহাদুর আবিষ্কার করলেন পুত্রবধূর শয়নগৃহের জানলায় দড়ির মই ঝুলছে। চোর তাড়া খেয়ে মই বেয়ে মুক্ত জানলাপথে সে গৃহে প্রবেশ করল। তারই অনুসরণ ক'রে রায়বাহাদুর দেখলেন, তস্করবেশী তাঁরই পুত্র পালঙ্কের ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

এ গল্পে প্রভাতকুমারের শিল্পসংযম বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। চতুর্থ পর্বের উপসংহারে লেখকের নিষ্ঠুর নীরবতা পাঠকের পক্ষে মর্মবিদারী! এ গল্পে এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রেমের গল্পে, যেখানে পদে পদে এগিয়ে যাওয়ার প্রলোভন দুর্বার, সেখানে প্রভাতকুমার অবিমিশ্র শিল্পরসিকের আদর্শ অনুসরণ ক'রেও সংযমের সীমানা লঙ্ঘন করেন নি। অথচ জীবন-রসিক হিসেবে তিনি সহজ পথের পন্থী। বাস্তব জীবনে যেমন তাঁর অনুপ্রবেশ ব্যাপক ও গভীর তেমনি জীবনরহস্যের সন্ধানে তাঁর কবি-মানস স্বভাবসত্যের উপাসক।

৪

জীবনকে আপন স্বরূপে দেখার সহজ-দৃষ্টি-সাধনায় প্রভাতকুমার পারংগম। কিন্তু তাঁর সহজ-দৃষ্টি সহজিয়া দৃষ্টি নয়। জীবন-জিজ্ঞাসায় তিনি বিদ্রোহী নন; নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির চেয়ে চিরাগত মূল্যবোধের

পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকেই তাঁর প্রবণতা। আমাদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে সমাজ-স্বীকৃত সম্পর্কের নিষ্ঠা ও পবিত্রতার যথাযথ মূল্য তাঁর সাহিত্যে প্রতিশ্রুত। 'মরম না জানে ধরম বাখানে' এমন তিনি নন, তাই মানব-হৃদয়ের 'ভিতর দুয়ার' খোলবার জন্য তার 'বাহির দুয়ার' বন্ধ করার প্রয়োজন তাঁর হয় না। তাঁর সাহিত্যে বাহির ও ভিতরের, সমাজ ও ব্যক্তির, নীতিধর্ম ও প্রাণধর্মের ভারসাম্য কদাচিৎ বিচলিত হয়েছে।

ব্যক্তিজীবনে উৎকেন্দ্রিতা অবশ্যই স্বীকার্য। এবং তারই ছিদ্রপথে ব্যক্তিগত স্খলন-পতন-ত্রুটিকে আশ্রয় ক'রেই নেমে আসে অদৃষ্টের বিধান। প্রভাতকুমারের সাহিত্যে তাই মানুষের চরিত্রই তার নিয়তি। সে নিয়তির অমোঘ বিধানে যখন জীবনের করুণ পরিণতি ঘনিয়ে আসে তখন প্রভাতকুমার তাকে হাস্যপরিহাসে তরল ক'রে তোলার দিকেই তাঁর শিল্পকর্মকে পরিচালিত করেন। অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তিবিধানে তাঁর বিচারবুদ্ধি নিত্যজাগ্রৎ, কিন্তু তাঁর শিল্পবুদ্ধি দুঃখকে পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য হাসির পরিবেশ রচনায় সর্বদাই ক্লান্তিহীন।

'কুড়ানো মেয়ে' গল্পে নবগ্রামের মহাকৃপণ বৃদ্ধ সীতানাথ মুখুজ্জের কার্পণ্য ও অর্থগৃধ্নুতার যে পরিণতি ঘটেছে তা একাধারে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং অদৃষ্টের অট্টহাসি। কনিষ্ঠা পুত্রবধূ পিতৃগৃহে গিয়ে একটি কচি মেয়ে রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিন্তু বধূমাতার অলঙ্কারগুলি উদ্ধার না করা পর্যন্ত বৃদ্ধের মনে শান্তি নেই। বৈবাহিক-গৃহে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কামার ডেকে সিন্দুক ভাঙিয়ে গয়নাপত্র কেড়ে নেওয়াতে আর-যাই-হোক্ কৃপণের দৃষ্টিতে নিষ্ঠুরতার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। প্রত্যাবর্তনের পথে নৌকোডুবির ফলে সীতানাথের ধনপ্রাণ সবই যেতে বসেছিল। চাঁদবাড়ির ভূধর চাটুজ্জে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ধনের কথা বলতে সে বলে, ছোট ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তবেই গয়নাপত্র ফিরিয়ে দেবে, নইলে নয়। বৃদ্ধের কাছে প্রাণের চেয়েও ধন বড়। কিন্তু বিপত্নীক কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অন্নদাচরণ পুনর্বিবাহে কিছুতেই রাজি নয়। অগত্যা ধনোদ্ধারের আশায় বৃদ্ধ নিজেই বালিকার পাণিপীড়নে কৃতসংকল্প হল। প্রায় দশ বৎসর গৃহিণীর মৃত্যু

হয়েছে, ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি ভরা সংসার। কর্তার এই মতি-চ্ছন্নতায় পরিবারের সবাই একজোট হলেন। হাজার খানেক টাকা দিয়ে মেয়ের অন্যত্র বিবাহের বন্দোবস্ত করার জন্য কনিষ্ঠ পুত্র চাঁদবাড়ি যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে যখন শুনলেন যে কুড়নো মেয়েটি তাঁরই লোকান্তরিতা পত্নীর সহোদরা তখন তিনি বিপত্নীকব্রতে জলাঞ্জলি দিয়ে শালীবাহন হয়ে ফিরে এলেন ঘরে। এ গল্পের উপসংহার রচনায় গল্পসত্য ক্ষুণ্ন হয়েছে সন্দেহ নেই ; প্রথমাংশে পল্লীচিত্র ও কৃপণের চরিত্র-চিত্রণে প্রভাতকুমার যে তীক্ষ্ণ বাস্তব-দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ সত্ত্বেও, সেদিন তা অনাস্বাদিতপূর্ব ছিল। কিন্তু গল্পের উত্তরভাগ রচনায় লেখক দ্রষ্টার আসন থেকে নেমে এসে গল্প বানাবার মোহে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পে কিন্তু দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা দুয়েরই সার্থক সম্মিলন ঘটেছে। এ গল্পে প্রভাতকুমার বঙ্গভারতীর আসন বিছিয়েছেন বাংলার ভৌগোলিক সীমানার বাইরে। গাজিপুর শহরের গোরা-বাজার মহল্লার লালাজাতীয় অবস্থাপন্ন যুবক রাম অওতার এর নায়ক। রাম অওতার গোলাপ-দেওয়া সিদ্ধিপানে অভ্যস্ত। একদিন সিদ্ধির প্রসাদে যখন মেজাজ শরীফ্ তখন একখানি ছেঁড়া পুরনো কাগজে তার চোখে পড়ল এক লোভনীয় বিবাহের বিজ্ঞাপন। 'প্রার্থনাসমাজ'ভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যার জন্য কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যক। বিবাহান্তে বিলেত প্রেরণের প্রতিশ্রুতি। রাম অওতার আবাল্যবিবাহিত। কিন্তু এতে একটা মজার স্বাদ সে পেল। কিছুদিন কোর্টশিপ ক'রে তারপর চম্পট দেওয়া যাবে! সে বিজ্ঞাপনে সাড়া দিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই পাত্রী সন্দর্শনের জন্য এল সাদর আমন্ত্রণ। উৎফুল্ল রাম অওতার কাশীর কেদারঘাটে রোমান্টিক অভিযানে যাত্রা করল এবং যথাকালে কাশীর প্রসিদ্ধ গুণ্ডা মহাদেও মিশ্র ও তার প্রিয় শাকরেদ কাহ্নাইয়ালালের খপ্পরে পড়ল। তারপর একপেয়ালা ভাঙ্ এবং একটু ধুতুরার রস। অচেতন রাম অওতারের যথাসর্বস্ব, এমন কি তার জামাকাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়ে সশিষ্য মহাদেব তাকে সন্ন্যাসী বানিয়ে ছেড়ে দিলে। দিন কয় পরে

সন্তানকামনায়ও বটে, আর রসময়ীর রুদ্রাণী মূর্তির হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভের আশাতেও বটে, ক্ষেত্রমোহন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের গোপন বাসনা মনে মনে পোষণ করেন। একবার একটি সম্বন্ধ পাকাপাকি হবার বন্দোবস্ত হয়েছে এমন সময় রসময়ী তাঁর দিদি বিনোদিনীকে সঙ্গে নিয়ে কন্যার পিতৃগৃহে চড়াও হয়ে গৃহিণীকে ঝাঁটাপেটা ক'রে এসেছিলেন, প্রয়োজন হলে আঁশবঁটিরও সদ্ব্যবহার করতে তিনি পরাঙ্মুখ নন তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। বলাই বাহুল্য, এমন সতীনের ঘরে কন্যাদান করার প্রশ্নই উঠল না! ক্ষেত্রমোহনের একমাত্র ভরসা মহাকাল। রসময়ীর অবশ্য ইচ্ছা ছিল স্বামীর বিয়ে করার বয়স নিঃশেষে গত হলে তবে ইহজগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। কিন্তু সে সাধ অপূর্ণই রয়ে গেল। পরকালের ডাকে তাঁকে অকালেই সাড়া দিতে হল। পত্নীর মৃত্যুর মাস ছয় পরে ক্ষেত্রমোহন নিজেকে নিষ্কণ্টক ভেবে যেই বিয়ের আয়োজন করেছেন অমনি এক ভৌতিক কাণ্ড ঘটল। তাঁর মৃতা স্ত্রী স্বহস্তে পত্র লিখে তাঁকে শাসালেন, বিয়ে করলে ললাটে অশেষ' দুর্গতি লেখা আছে! রসময়ী মৃত্যুর পর বাড়ির বটগাছ আশ্রয় ক'রে স্বামীর প্রতিটি গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন! মৃত্যুতে তাঁর শক্তি দ্বিগুণিত হয়েছে, রৌদ্ররসের সঙ্গে মিশেছে ভয়ানক রস। ক্ষেত্রমোহন বিভীষিকা দেখতে লাগলেন। থিয়োসফিস্ট মহলে এই ভৌতিক পত্রমালা নিয়ে সোরগোল পড়ে গেল। অবশ্য গল্পশেষে ভৌতিক আচরণের রহস্যোদ্ধার হয়েছে এবং হাস্যরসই জয়যুক্ত হয়েছে। এ গল্পে একপত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুরুষ-চিত্তে পত্ন্যন্তর গ্রহণের বাসনা উপহাসের বিষয় হয়েছে, তার সঙ্গে মিলেছে ভূতের ভয় এবং ভূততত্ত্ববিশ্বাসীদের প্রতি লঘু কৌতুকের বক্রহাসি। স্বামীর ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে রসময়ীর দূরদৃষ্টি এ গল্পের মুখ্যগ্রন্থি। সেখানে প্রভাত-কুমার যে কাল্পনিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তার অভিনবত্ব হাস্য-রসসৃষ্টির নতুন উপাদান রচনা করেছে। কিন্তু জীবনের একটি গভীর সত্যের সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে বলেই সে হাসি নিম্নস্তরের রঙ্গরসমাত্রেই পর্যবসিত হয় নি, অশ্রু ও হাসির মিশ্র কলধ্বনিতে জীবনের গভীর স্বরও প্রতিস্পন্দিত হয়েছে।

প্রভাতকুমার জীবনের অশ্রুহাসির যুগল প্রবাহ থেকেই তাঁর বিচিত্র শিল্প রচনা করেছেন। বাঙালী জীবনের চিরপ্রবহমান ভাগীরথী-ধারাতেই তাঁর রসের গাগরী পূর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু চলমান জীবনের আলোছায়ার লীলাতেও তাঁর শিল্পলোক কম সমৃদ্ধ হয় নি। বর্তমান সংকলনে 'খোকার কাণ্ড' এবং 'বি-এ পাস কয়েদী' গল্প দু'টি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। স্বভাবতই এজাতীয় গল্পে তৎকালিক এবং তৎস্থানিকতার প্রতিবেদনই মুখ্য। যুগচেতনায় যে সঞ্চারী ভাবগুলি প্রাধান্য লাভ করে এই ধরণের গল্প তাকে আশ্রয় ক'রেই গড়ে ওঠে, কিন্তু সমসাময়িক বিষয়ের মধ্যেও নিত্যকালের ব্যঞ্জনা-সৃষ্টিতে প্রভাতকুমার সুদক্ষ।

'খোকার কাণ্ড' গল্পে স্বামী-স্ত্রীর ধর্মবিশ্বাসের বিরোধকে অবলম্বন ক'রেই হাস্যরস ঘনীভূত হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধটি এবং লেখকের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও পক্ষপাতিত্বটুকুও গল্পপরিবেশনের অসামান্য কুশলতাকে পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠেছে। বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপক হরসুন্দরবাবু বিয়ের দু'তিন বৎসর পরেই নববিধান মতে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সংসারে স্ত্রী পঙ্কজিনী আর তিন বৎসরের শিশুপুত্র—নাম সত্যসুন্দর ওরফে খোকা। হরসুন্দরবাবু কাসিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, সুচিকিৎসা দ্বারাও বিশেষ কোনো ফলোদয় হচ্ছিল না। মানুষের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলে স্বভাবতই অতিপ্রাকৃতের ওপর তার নির্ভরপ্রবণতা বেড়ে যায়। অবস্থা যখন নিতান্তই খারাপ তখন পঙ্কজিনীর সখী শরৎ-শশীর পরামর্শে বাবা ষণ্ডেশ্বরের কাছে পূজোর মানত ক'রে তাঁর প্রসাদী বিল্বপত্র ও ঠাকুরের দেওয়া তেল-পড়া আনিয়ে স্বামীর অজ্ঞাতসারে স্ত্রী ব্যবহার করতে লাগলেন। ব্রাহ্মবন্ধুরাও রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে উপাসনা করলেন। বলা বাহুল্য, ডাক্তারি চিকিৎসাও

সন্তানকামনায়ও বটে, আর রসময়ীর রুদ্রাণী মূর্তির হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভের আশাতেও বটে, ক্ষেত্রমোহন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের গোপন বাসনা মনে মনে পোষণ করেন। একবার একটি সম্বন্ধ পাকাপাকি হবার বন্দোবস্ত হয়েছে এমন সময় রসময়ী তাঁর দিদি বিনোদিনীকে সঙ্গে নিয়ে কন্যার পিতৃগৃহে চড়াও হয়ে গৃহিণীকে ঝাঁটাপেটা ক'রে এসেছিলেন, প্রয়োজন হলে আঁশবঁটিরও সদ্ব্যবহার করতে তিনি পরাঙ্মুখ নন তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। বলাই বাহুল্য, এমন সতীনের ঘরে কন্যাদান করার প্রশ্নই উঠল না! ক্ষেত্রমোহনের একমাত্র ভরসা মহাকাল। রসময়ীর অবশ্য ইচ্ছা ছিল স্বামীর বিয়ে করার বয়স নিঃশেষে গত হলে তবে ইহজগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। কিন্তু সে সাধ অপূর্ণই রয়ে গেল। পরকালের ডাকে তাঁকে অকালেই সাড়া দিতে হল। পত্নীর মৃত্যুর মাস ছয় পরে ক্ষেত্রমোহন নিজেকে নিষ্কণ্টক ভেবে যেই বিয়ের আয়োজন করেছেন অমনি এক ভৌতিক কাণ্ড ঘটল। তাঁর মৃতা স্ত্রী স্বহস্তে পত্র লিখে তাঁকে শাসালেন, বিয়ে করলে ললাটে অশেষ দুর্গতি লেখা আছে! রসময়ী মৃত্যুর পর বাড়ির বটগাছ আশ্রয় ক'রে স্বামীর প্রতিটি গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন! মৃত্যুতে তাঁর শক্তি দ্বিগুণিত হয়েছে, রৌদ্ররসের সঙ্গে মিশেছে ভয়ানক রস। ক্ষেত্রমোহন বিভীষিকা দেখতে লাগলেন। থিয়োসফিস্ট মহলে এই ভৌতিক পত্রমালা নিয়ে সোরগোল পড়ে গেল। অবশ্য গল্পশেষে ভৌতিক আচরণের রহস্যোদ্ধার হয়েছে এবং হাস্যরসই জয়যুক্ত হয়েছে। এ গল্পে একপত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুরুষ-চিত্তে পত্ন্যন্তর গ্রহণের বাসনা উপহাসের বিষয় হয়েছে, তার সঙ্গে মিলেছে ভূতের ভয় এবং ভূততত্ত্ববিশ্বাসীদের প্রতি লঘু কৌতুকের বক্রহাসি। স্বামীর ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে রসময়ীর দূরদৃষ্টি এ গল্পের মুখ্যগ্রন্থি। সেখানে প্রভাত-কুমার যে কাল্পনিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তার অভিনবত্ব হাস্য-রসসৃষ্টির নতুন উপাদান রচনা করেছে। কিন্তু জীবনের একটি গভীর সত্যের সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে বলেই সে হাসি নিম্নস্তরের রঙ্গরসমাত্রেই পর্যবসিত হয় নি, অশ্রু ও হাসির মিশ্র কলধ্বনিতে জীবনের গভীর সুরও প্রতিস্পন্দিত হয়েছে।

প্রভাতকুমার জীবনের অশ্রুহাসির যুগল প্রবাহ থেকেই তাঁর বিচিত্র শিল্প রচনা করেছেন। বাঙালী জীবনের চিরপ্রবহমান ভাগীরথী-ধারাতেই তাঁর রসের গাগরী পূর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু চলমান জীবনের আলোছায়ার লীলাতেও তাঁর শিল্পলোক কম সমৃদ্ধ হয় নি। বর্তমান সংকলনে 'খোকার কাণ্ড' এবং 'বি-এ পাস কয়েদী' গল্প দু'টি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। স্বভাবতই এজাতীয় গল্পে তৎকালিক এবং তৎস্থানিকতার প্রতিবেদনই মুখ্য। যুগচেতনায় যে সঞ্চারী ভাবগুলি প্রাধান্য লাভ করে এই ধরণের গল্প তাকে আশ্রয় ক'রেই গড়ে ওঠে, কিন্তু সমসাময়িক বিষয়ের মধ্যেও নিত্যকালের ব্যঞ্জনা-সৃষ্টিতে প্রভাতকুমার সুদক্ষ।

'খোকার কাণ্ড' গল্পে স্বামী-স্ত্রীর ধর্মবিশ্বাসের বিরোধকে অবলম্বন ক'রেই হাস্যরস ঘনীভূত হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধটি এবং লেখকের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও পক্ষপাতিত্বটুকুও গল্পপরিবেশনের অসামান্য কুশলতাকে পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠেছে। বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপক হরসুন্দরবাবু বিয়ের দু'তিন বৎসর পরেই নববিধান মতে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সংসারে স্ত্রী পঙ্কজিনী আর তিন বৎসরের শিশুপুত্র—নাম সত্যসুন্দর ওরফে খোকা। হরসুন্দরবাবু কাসিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, সুচিকিৎসা দ্বারাও বিশেষ কোনো ফলোদয় হচ্ছিল না। মানুষের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলে স্বভাবতই অতিপ্রাকৃতের ওপর তার নির্ভরপ্রবণতা বেড়ে যায়। অবস্থা যখন নিতান্তই খারাপ তখন পঙ্কজিনীর সখী শরৎ-শশীর পরামর্শে বাবা ষণ্ডেশ্বরের কাছে পুজোর মানত ক'রে তাঁর প্রসাদী বিল্বপত্র ও ঠাকুরের দেওয়া তেল-পড়া আনিয়ে স্বামীর অজ্ঞাতসারে স্ত্রী ব্যবহার করতে লাগলেন। ব্রাহ্মবন্ধুরাও রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে উপাসনা করলেন। বলা বাহুল্য, ডাক্তারি চিকিৎসাও

চলতে লাগল। অবশেষে নিরাকার পরব্রহ্মের অনুকম্পাতেই হোক অথবা বাবা ষণ্ডেশ্বরের তেল-পড়ার গুণেই হোক;—ডাক্তারি ওষুধের প্রভাবেই হোক অথবা রোগভোগের কাল উত্তীর্ণ হবার ফলেই হোক, হরসুন্দরবাবু সেরে উঠলেন। এবার বাবা ষণ্ডেশ্বরের কাছে পূজো দেবার পালা। গুডফ্রাইডে উপলক্ষে হরসুন্দরবাবু ব্রাহ্মবন্ধুদের নিয়ে হালিশহর অঞ্চলে ব্রহ্মসংকীর্তন করতে গেলেন; পঙ্কজিনীও সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন। কিন্তু গ্রহের ফেরে ট্রেনে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি স্বামীর কাছে পড়লেন ধরা। ধর্মবন্ধুদের সামনে সহধর্মিণীর এই গর্হিত আচরণে হরসুন্দরবাবুর মাথা কাটা গেল। কিন্তু ট্রেনে লেখক যে হাস্যময় পরিবেশ রচনা করেছেন, বিশেষত ভিড়ের মধ্যে পিতাকে দেখতে পেয়ে খোকা যে কাণ্ড করল, তা প্রচুর হাসির খোরাক যুগিয়েছে। মাতাপুত্রের দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত জননীর আবরণ ভেদ ক'রে পুত্র যখন পিতার কাছে ছুটে এল তখন হরসুন্দরবাবু দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর পরিধানে তসরের শাড়ি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলায় সিন্দুর ও চন্দনলিপ্ত ফুলের মালা—আঁচল থেকে কতকগুলো চন্দনমাখা ফুল ও বেলপাতা গাড়ির মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। এ জাতীয় গল্পে লেখকের ব্যক্তিগত মতামতের প্রভাব একেবারে কাটিয়ে ওঠা প্রায়-অসম্ভব; কিন্তু পরবর্তী কালে, এমন কি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যেও, যে তিক্ততা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সৃষ্টি করেছে সেক্ষেত্রে প্রভাতকুমার নির্মল হাস্যকৌতুকের মধ্যেই ট্রাজিক পরিবেশকে অনেকখানি হালকা ক'রে তুলেছেন।

'বি-এ পাস কয়েদী' গল্পে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের তির্যক্ ছায়াপাতে কাহিনীতে নতুন উপাদানের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমের একটি শহরের জেলখানা এ গল্পের পটভূমি। জেলর সান্যাল-গৃহিণী মনোরমা বরিশাল জেলার মোক্ষদা নাম্নী একটি অনাথা ব্রাহ্মণকুলবধূকে গৃহকর্মে নিযুক্ত ক'রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তাই নিয়ে গল্প। কিছুদিন পরে জেলর-গৃহের পাচক-ঠাকুর ছুটি নিয়ে গেল দেশে। তার স্থানে স্বেচ্ছায় এসে যোগ দিল শরৎ বাঁড়ুজ্জে নামে এক অদ্ভুত কয়েদী। বি-এ পাস ক'রে

হেডমাস্টারি করত, স্বদেশী ডাকাতিতে ধরা পড়ে শাস্তি ভোগ করছে। সোনার ছেলে শরৎ, তার আচার আচরণে দুদিনেই জেলর-পরিবারে সে সবার প্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু স্বদেশী ডাকাত, অধিক দিন এক জেলে রাখা নিরাপদ নয়; তাই শরতের বদলির আদেশ এল, বক্সার সেণ্ট্রাল জেলে তাকে চলে যেতে হবে। অবশেষে বিদায়ের দিন যখন অত্যাসন্ন তখন একদিন জেলর-গৃহিণী হঠাৎ রান্নাঘরে গিয়ে এক অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখে চমকে উঠলেন। দেখলেন, শরৎ আর মোক্ষদা দু'জনে জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মোক্ষদার মাথা শরতের কাঁধের ওপর, দুজনে একেবারে জ্ঞানশূন্য। তারপর মোক্ষদার মাথাটা শরৎ তুলে, তার মুখে চুমু খেয়ে, চোখ মুছতে মুছতে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। এই কাণ্ড দেখে গৃহিণা যখন ভ্রষ্টচরিত্রা মোক্ষদার মুণ্ডপাত করছিলেন তখন শরতের পরিত্যক্ত 'আত্মজীবনী' পড়ে সমস্ত রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হল। জানা গেল যে মোক্ষদা শরতেরই স্ত্রী। স্বামীর জেল হবার পর স্বামী সন্দর্শন মানসে জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশের এই ছলনাটুকুই সে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করেছে। স্বামী স্ত্রীর এই মিলন পূর্বপরিকল্পিত। স্বদেশী যুগ নিয়ে প্রভাতকুমার একাধিক সার্থক গল্প রচনা করেছেন, কিন্তু সেই 'মদে মাতাল ভোরে'ও তাঁর শিল্পদৃষ্টি সর্বদাই দেশপ্রেমের প্রবল উত্তেজনা থেকে দূরে রয়েছে। নবযুগের নতুন নতুন উপাদানকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বিশুদ্ধ শিল্পীর স্বধর্ম থেকে কখনো বিচ্যুত হন নি। শরতের আচরণে বিপ্লবী নেতার বীরত্ব-মহিমা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মিলন-পিপাসার মধ্যে চিরন্তন মানব-হৃদয়েরই বিজয়-ধ্বজা উড্ডীন হয়েছে।

৬

উনিশ শ' তেরো সালে একখানি পত্রে ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত স্বর্গত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভাতকুমারকে লিখেছিলেন, 'বড় বড় ফরাসী গল্পলেখকদের গল্প অপেক্ষা তোমার গল্প কোনো অংশে হীন নহে।' এ প্রশংসাবাণীর মধ্যে কিছুটা স্নেহরস হয়ত মিশ্রিত আছে,

কিন্তু প্রভাতকুমারের প্রতিভাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখকদের প্রতিভার সঙ্গে তুলনা করতে কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই। গল্পের পরিমিতিবোধ, ব্যবহৃত উপকরণের অত্যাবশ্যকতা, কাহিনী-বিন্যাস এবং গল্পগ্রন্থনের সুনিপুণ দক্ষতায় প্রভাতকুমার অসামান্য। তাঁর গল্পবলার ভঙ্গি এত স্বাভাবিক ও অনায়াসপ্রকাশ যে, জীবনের মতই যেন তা স্বতঃস্ফূর্ত। সত্যপ্রকাশের নাটকীয় শিখরে আরোহণ করার জন্য অতিনাটকীয় কোনো পরিস্থিতির সুযোগ তাঁকে কদাচিৎ গ্রহণ করতে হয়। অথচ জীবনের যে খণ্ডাংশ তিনি বেছে নেন তার উপসংহারে ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে আকস্মিক বিদ্যুচ্চমকের মতই ভাব-সত্যের পূর্ণ উন্মেষ ঘটে। আকস্মিকতায় বিদ্যুচ্চমকের সঙ্গেই সে উন্মেষ তুলনীয় বটে, কিন্তু সেই হঠাৎ-আলোর-ঝলকানিতে জীবনের ওপর যে আলোকপাত হয় তা ক্ষণপ্রভার আলো নয়, নিশান্তের আকাশে প্রভাত-আলোর আত্মপ্রকাশের মতই তা নির্মল ও ভাস্বর।

প্রভাতকুমারের প্রতিভার সার্থকতম নিদর্শন হিসেবে বর্তমান সংকলনে গ্রথিত 'দেবী' ও 'কাশীবাসিনী' গল্প দু'টির উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পশিল্পের দুর্লভ আদর্শ রূপেই এই দু'টি গল্পকে গ্রহণ করা যায়। অলৌকিক ধর্মবিশ্বাসের সূত্র ধ'রে জীবনে যে কতবড় ট্রাজেডির সৃষ্টি হ'তে পারে 'দেবী' গল্পে তারই প্রকাশ। এখন থেকে দেড়শতাধিক বৎসর পূর্বেকার বাংলার পল্লী-পরিবেশে প্রভাতকুমার গল্পটিকে বিন্যস্ত করেছেন। বিংশতিবর্ষীয় যুবক উমাপ্রসাদ আর তার ষোড়শী স্ত্রী দয়াময়ীর মধুময় দাম্পত্যমিলনের নিশান্ত-চিত্র দিয়ে গল্পের আরম্ভ। কিন্তু নিবিড়তম আশ্লেষ-মিলনের মধ্যেও প্রেমবৈচিত্ত্যের সুর বাজতে থাকে। দয়াময়ী হঠাৎ বলে ওঠে, 'মনে হচ্ছে আর যেন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।' মনের এই ভীরু আশঙ্কা প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই নিয়তির নির্মম পরিহাস হয়ে দেখা দিল। উমাপ্রসাদের পিতা কালীকিঙ্কর রায় গ্রামের জমিদার, পরম পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান শক্তি-উপাসক। প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ ব'লে, আদ্যাশক্তির বিশেষ অনুগৃহীত ব'লে, গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

প্রভাত না হতেই পিতা উমাপ্রসাদের শয়নগৃহ-দ্বারে আঘাত

করলেন। পরিধানে রক্তবর্ণ কোষেয় বস্ত্র, স্কন্ধে নামাবলী উত্তরীয়, গলে রুদ্রাক্ষমালা। শক্তিপূজারী খুঁজছেন তাঁর ছোটবৌমা দয়াময়ীকে। তাকে দেখবামাত্রই তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে বিস্ময়াবিষ্ট পুত্রকে বললেন, গত রজনীতে স্বপ্নযোগে তিনি প্রত্যাদেশ পেয়েছেন, জগন্ময়ী কৃপা ক'রে ছোটবৌমার মূর্তিতে তাঁর গৃহে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েছেন। 'দয়াময়ী ছিল মানবী—সহসা দেবীত্বে অভিষিক্ত হল।'

ধূপ দীপ জ্বেলে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে ষোড়শোপচারে চলল দেবীপূজা। কিন্তু বিমূঢ় দয়াময়ীর দুচোখে ক্রন্দনের আর শেষ নেই। তার সুখের জীবনে অকস্মাৎ এ কি হল! রাত্রে গোপনে উমাপ্রসাদ তার সঙ্গে দেখা করতে এলে সে এই দুর্দৈবের হাত থেকে অবিলম্বে নিষ্কৃতি চাইল। ঠিক হল দিন সাত পরে দু'জনে পালিয়ে গিয়ে সুদূর পশ্চিমে নতুন ক'রে জীবন শুরু করবে। ইতিমধ্যে এই সাত-দিনে নানা আলোকিক ঘটনায় দেবীমহিমা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচারিত হতে লাগল। দেবীর কৃপায় মুমূর্ষু শিশু প্রাণ পেয়েছে, চরণামৃত পান ক'রে গর্ভবতী অক্লেশে সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করেছে। এই সব অলৌকিক ঘটনায় সবারই বিশ্বাস অটুট হতে লাগল, এমন কি, স্বয়ং দয়াময়ীর মনও বিচলিত হতে লাগল। সাত দিন পরে স্বামী যখন তাকে নিতে এল তখন সে তার বাহুবেষ্টনী থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে বলল, 'তুমি আর আমাকে স্ত্রীভাবে স্পর্শ কোরো না। আমি যে দেবী নই, আমি যে তোমার স্ত্রী, তা আর নিশ্চয় ক'রে বলতে পারিনে।' স্বামীর আবেদন-নিবেদন সবই ব্যর্থ হল। পালিয়ে যাওয়া আর হল না। চরম ক্ষোভে ও বেদনায় উমাপ্রসাদ নিশীথের অন্ধ-কারে গেল হারিয়ে। দেবী একা দেবীত্বে এল ফিরে।

কিন্তু কিছুদিন পরেই এল দেবীত্বের চরম অগ্নিপরীক্ষা। দয়াময়ীর কোনো সন্তান হয় নি। ভাসুরপুত্র খোকাই এই পরিবারের একমাত্র বংশধর। সেই খোকার হল জ্বর। দয়াময়ী তার দেবীত্ব-গর্বে জানাল, বৈদ্য ডাকার প্রয়োজন নেই। সেই তাকে ভাল ক'রে দেবে। কিন্তু কিছুতেই খোকাকে বাঁচানো গেল না। সেই চূড়ান্ত আঘাতে দয়াময়ী নিজের দেবীত্বে অবিশ্বাসিনী হল। তারপর গল্পের উপসংহার।—

"পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্বনাশ!—পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছে।"

প্রভাতকুমার নিজেই বলেছেন, গল্পটির আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া। রবীন্দ্রনাথের নিজেরও একাধিক রচনায় অনুরূপ সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে। 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতি-গোবিন্দমাণিক্যের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েও তার রূপ তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ধর্মবোধ শাক্ত-বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে দুর্বল করেছে। রঘুপতির ধর্মবিশ্বাস শিথিল ছিল বলে তাকে যে-পরিমাণে প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে হয়েছে, নাটকীয় ট্রাজেডিও সেই পরিমাণেই তরল হয়ে এসেছে। কিন্তু প্রভাতকুমারের গল্পে কালীকিঙ্করের বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত অবিচলিত, তাই এখানে ট্রাজেডির বেদনা জীবনের গভীরতম উপলব্ধিকে শুধু স্পর্শই করে না, প্রচণ্ড আঘাতে তার মর্মমূল পর্যন্ত প্রকম্পিত ক'রে তোলে। 'দেবী' গল্প রচনার পর পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ধরে বাংলা ছোটগল্প অনেক পথ অতিক্রম করেছে, কিন্তু ছোট-গল্পের সর্বাঙ্গীণ বিচারে এর সাফল্য ও উৎকর্ষ এখনো অনতিক্রম্য বলে মনে হয়।

'কাশীবাসিনী' গল্পে প্রভাতকুমারের প্রতিভার স্বকীয়তা আরো স্বচ্ছ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'দেবী' গল্পের শিল্পকৌশল স্থাপত্যধর্মী। ইস্পাতকঠিন কাঠামোকে আশ্রয় ক'রে সুপরিকল্পিত উপকরণে গল্পরূপ গড়ে উঠেছে। কিন্তু 'কাশীবাসিনী'তে যেন পূর্বকল্পিত কোনো ছক তৈরি নেই। সহজ সাবলীল গতিতে অনিবার্য পরিণামের পথে গল্পটি স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছে। অথচ এই রহস্যময়ী নারীর পরিচয় সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহলও ক্রমশই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। জীবনের একটি খণ্ডাংশে পাঠকমনের দুর্দমনীয় কৌতূহল উদ্রেক ক'রে গল্পের পরিসমাপ্তিতে সেই কৌতূহল নিবৃত্ত করার মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে যদি ছোটগল্পের রসপরিবেশনের রীতি বলে স্বীকার করতে হয় তাহলে 'কাশীবাসিনী' তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। খগোল থেকে তাড়িঘাট স্টেশনে বাসা বদল করতে গিয়ে গয়নার বাক্সচুরি এবং কাশীবাসিনীর ওপর

সন্দেহের মধ্যে কৌতূহল তুঙ্গশিখরে আরোহণ করেছে। শেষ পরিচ্ছেদে অবশ্য তার অবসানে রসমুক্তি ঘটেছে। আকস্মিক দৈববিড়ম্বনায় পদস্খলিতা এক নারীর সন্তানস্নেহের অমৃতধারায় এ গল্প সুধাস্বাদী। 'কাশীবাসিনী'র রচনাকাল বৈশাখ, ১৩০৮; তখনো শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন নি। রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' অবশ্য তার পূর্বগামী। কিন্তু অঙ্গুরীয়ের অভিজ্ঞানের চেয়ে মাতৃত্বের অভিজ্ঞানে নারীমহিমাকে আবিষ্কার করা নাট্যগুণে লঘু হলেও স্বভাবগুণে অধিকতর সত্য। 'কাশীবাসিনী'তে শরৎ-সাহিত্যের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। শরৎচন্দ্র যেখানে আবেগোচ্ছ্বসিত, প্রভাতকুমার সেখানে শান্ত ও সমাহিত। গল্পের উপসংহারে কন্যার কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে কাশীবাসিনী বলছেন, 'জীবনে একবার যে পাপ করেছি, আজ চৌদ্দ বছর ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম।' সে প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে শুধু পাপ থেকেই মুক্ত করল না, সন্তানস্নেহের শেষমোহ থেকেও মুক্তিদান করল। গল্পের শেষে বাৎসল্যরস শান্তরসে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। 'কাশীবাসিনী'র মধ্যে জীবনের এই বৈরাগ্যমহিমায় প্রভাতকুমারের দৃষ্টিতে ভারতীয় জীবনবোধেরই চূড়ান্ত প্রকাশ। রসমোক্ষের পথে কাশীবাসিনী জীবনের যে স্তরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, সেখানে অতটা অনায়াসে ভারতের শিল্পীই পৌঁছতে পারেন, অন্য দেশের পক্ষে তা কল্পনাতীত না হলেও অতটা সহজসাধ্য নয়।

বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের মত প্রভাতকুমারও উত্তরসূরিদের অফুরন্ত প্রেরণার নিত্য উৎস। পরবর্তীকালের অনেক খ্যাতিমান লেখকের সার্থক রচনায়ও তাঁর প্রভাব পরিদৃশ্যমান। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও এক সুবিশাল ঐতিহ্যের স্রষ্টা। অজস্রতায় ও বৈচিত্র্যে, দৃষ্টি ও সৃষ্টির অনায়াস ভঙ্গিতে, সর্বোপরি প্রসাদগুণান্বিত রচনাশিল্পে প্রভাতকুমার অদ্বিতীয়। তাঁর প্রেরণায় অনেক প্রশংসনীয় রচনা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তাঁর শিল্পোৎকর্ষ এখনো অনধিগম্য।

বঙ্গবাসী কলেজ
চৈত্র, ১৩৫৯

জগদীশ ভট্টাচার্য

প্রভাতকুমারের লেখা

ছোট গল্পের বই

নব-কথা
ষোড়শী
দেশী ও বিলাতী
গল্পাঞ্জলি
গল্পবীথি
পত্রপুষ্প
গহনার বাক্স
হতাশ প্রেমিক
বিলাসিনী
যুবকের প্রেম
নূতন বউ
জামাতা বাবাজী

উপন্যাস

রমাসুন্দরী
নবীন সন্ন্যাসী
রত্নদীপ
জীবনের মূল্য
সিন্দুর কৌটা
মনের মানুষ
আরতি
সত্যবালা
সুখের মিলন
সতীর পতি
প্রতিমা
গরীব স্বামী
নবদুর্গা
বিদায় বাণী

সূচিপত্র

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ২২ মাঘ ১২৭৯, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ ; মাতুলালয়ে বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে। আদিনিবাস হুগলি জেলার গুরুপ। পাটনা কলেজ থেকে বি-এ পাসের পর কিছুদিন সিমলা ও কলকাতায় সরকারি কেরানি ছিলেন। পরে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। ১৯১৬ সাল থেকে আজীবন আইন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪ বৎসর 'মানসী ও মর্মবাণী'র সম্পাদনা করেন। বিয়ে হয় আঠারো বছর বয়সে, দুই পুত্র—অরুণকুমার ও ৺প্রশান্তকুমার।

কবি হিসেবেই সাহিত্যের যাত্রা শুরু। 'অভিশাপ' নামে একখানি ব্যঙ্গকাব্য পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে গল্প ও উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। গল্পসংকলন গ্রন্থের সংখ্যা ১২, তাতে মোট ১১৮টি গল্প আছে। উপন্যাসের সংখ্যা ১৩। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেক রচনা সাময়িক পত্রিকায় এখনো ছড়িয়ে আছে।

ব্যক্তিজীবনে মৃদুভাষী, নিরহংকার ও শিষ্টাচারপরায়ণ ; আন্তরিকতা ও বন্ধুবৎসলতাগুণে ছিলেন বন্ধুজনপ্রিয়। লোকলোচনের অন্তরালে থেকে নীরব সাহিত্যসাধনাই ছিল তাঁর জীবনব্রত। মৃত্যু : ২২ চৈত্র ১৩৩৮, ৫ এপ্রিল ১৯৩২ ॥



কুড়ানো মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেহাই বাড়ী

অপরাহ্ণ কাল। শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা মতিগঞ্জের ঘাটের অশ্বত্থ-মূল লেহন করিয়া বহিতেছে। একখানি জীর্ণকলেবর ভাউলে আসিয়া ঘাটে লাগিল। একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাবধানে সন্তর্পণে তীরে অবতরণ করিলেন। মাঝি তাঁহার ব্যাগটি, ছাতাটি, লাঠিখানি নামাইয়া দিল। তিনি সেইগুলি হাতে লইয়া, দাঁড়ি মাঝির খোরাকীর জন্য একটি সিকি বাহির করিয়া দিলেন। মাঝি সিকিটি হাতে করিয়া বলিল—"কর্ত্তা, আমরা পাঁচটি প্রাণী, চার আনায় কি করে পেট ভরবে?"

"সে কিরে, চার আনা কি অল্প হল?"

"হুজুর, চার সের চাউল কিনতেই ত চার আনা লাগে। হাঁড়ি আছে, কাঠ আছে, নুনতেল আছে—"

"নে নে—আর দু গণ্ডা পয়সা নে।" বলিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত সাবধানে দুই তিনবার গণিয়া, আটটি পয়সা মাঝির হাতে দিলেন। তবু মাঝি সন্তুষ্ট হইল না। বলিল—"মশাই পাঁচ পাঁচটা পেট, সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গা মেহন্নতের পর—না হয় আট গণ্ডাই পূরোপূরি দিন।"

উভয়পক্ষে কিয়ৎক্ষণ কথা কাটাকাটির পর বৃদ্ধ আর চারিটা পয়সা ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে মাঝিকে বলিলেন—"যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কি করতে এসেছ, বলিস্ আমাদের ঠাকুরমশাই একটা বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছেন।"

তাহার পর বৃদ্ধ ধীরে ধীরে রাস্তায় উঠিলেন। ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থান অভিমুখে চলিলেন। দোকানী পশারীরা এই নূতন লোকটির পানে মুহূর্ত্তের জন্য কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার স্ব স্ব কার্য্যে মন দিল।

বৃদ্ধের নাম সীতানাথ মুখোপাধ্যায়। নিবাস নবগ্রাম। সকাল

বেলায় লিখিতে বসিয়াছি, অদৃষ্টে কি আছে বলিতে পারি না;—নবগ্রামের কেহ আহারের পূর্ব্বে এই বৃদ্ধের নামোচ্চারণ করে না। তাঁহার কৃপণতাখ্যাতি বহুদূর ব্যাপ্ত। মতিগঞ্জে তাঁহার বেহাই বাড়ী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামের শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অন্নদাচরণের বিবাহ হইয়াছিল। বৎসর খানেক হইবে তাঁহার বধূমাতা সন্তানসম্ভাবনাবশতঃ পিতৃগৃহে আনীত হইয়াছিলেন। আজ পাঁচ ছয় মাস হইল, একটি কচি মেয়ে রাখিয়া বধূটি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। একদা উৎসববেশ পরিধান করিয়া বাদ্যভাণ্ডের সহিত সীতানাথ এই পথে পাল্কী করিয়া বর লইয়া গিয়াছিলেন, আজ সেই সমস্ত অতীত কথা স্মরণ হইতে লাগিল। মনটা, বিশেষ নহে, একটু যেন বিষণ্ণ হইল।

বৈবাহিকের বাটী পৌঁছিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। বৈঠকখানা খোলা ছিল, সীতানাথ সেইখানে গিয়া উপবেশন করিলেন। সেই কক্ষের ভিত্তিগাত্রে বসুধারার সপ্তরেখা আজিও বিদ্যমান। মনে হইল, পুত্রের বিবাহান্তে এই কক্ষে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহের সমকালে তাঁহার বৈবাহিক হৃষীকেশের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। তিন হাজার টাকা খরচ করিয়া তিনি একমাত্র কন্যাটির বিবাহ দিয়াছিলেন। হৃষীকেশ চালানের ব্যবসায় করেন। পাঁচ বৎসরকাল উপর্য্যুপরি লোকসান দিয়া তিনি এখন শুধু নিঃস্ব নহেন, ঋণে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। বসুধারার চিহ্নগুলি যে রহিয়া গিয়াছে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে কক্ষভিত্তিতে যে একটিবারও চূণ পড়ে নাই, সামান্য হইলেও তাহাও এই অস্বচ্ছলতার একটা নিদর্শন।

এক ছোঁড়া চাকর বাহিরে বাগানের বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে সীতানাথের প্রতি আড়চক্ষে চাহিতেছিল। বোধ হয় ভাবিতেছিল, বুড়া নিশ্চয়ই তামাক চাহিবে, এবং তামাক সাজিতে গিয়া নিশ্চয়ই সেও দুটান টানিয়া লইবে। বেচারী নূতন তামাক খাইতে শিখিয়াছিল, ধূম-পিপাসাটা তখন তাহার অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু সীতানাথের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইবামাত্রই তিনি বলিলেন—"ওহে, বাবুকে একবার খবর দাও, নগাঁয়ের সীতেনাথ মুখুয্যে এসেছেন।"

আশাহত বালক এ অনুরোধে বাক্যমাত্র ব্যয় না করিয়া নীরবে আগন্তুকের প্রতি একবার চাহিল। গম্ভীরভাবে কাস্তেখানি বেড়ার গায়ে ঝুলাইল। দড়ির তালটা ধীরে ধীরে গুটাইয়া ভাল জায়গায় রাখিল। তাহার পর অপ্রসন্ন মুখে মন্থরপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

অনতিবিলম্বে হৃষীকেশ আধময়লা ধুতি পরিয়া, একটি মোটা চাদর গায়ে দিয়া, বাহির হইয়া আসিলেন। সীতানাথ দেখিলেন, বৈবাহিকের সে স্থূলবপু নাই, অঙ্গে সে লাবণ্য নাই, চক্ষু কোটরগত। দুইজনে নমস্কারের আদান প্রদান হইল, কোলাকুলি হইল, কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা হইল। হৃষীকেশের চক্ষু ছলছল; গোটাকত বড় বড় জলবিন্দু গণ্ড বহিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্রে পতিত হইল।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিয়া গেল। দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে ধূমপান করিলেন, কাহারও মুখে কথাটি নাই।

অবশেষে সীতানাথ বলিলেন—"ভাই, যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, সে ত আর ফিরিবে না, বৃথা আক্ষেপ করিয়া কি হইবে বল? মেয়েটিকে একবার আন, দেখি।"

হৃষীকেশ উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিলেন। পশ্চাতে ঝি, তাহার কোলে ফরাসি ছিটের দোলাই জড়ান, মাতৃস্তনবঞ্চিত, শীর্ণকায় শিশুকন্যা। সে হাসিতেছে না, কাঁদিতেছে না, নিতান্তই নির্লিপ্তের মত একদিক পানে চাহিয়া আছে।

তাহার পিতামহ তাহার মুখ দেখিবার জন্য নগদ একটি আধুলি বাহির করিয়াছিলেন। কি ভাবিয়া আবার আধুলিটি রাখিয়া একটি টাকা বাহির করিলেন। মুখুয্যে মহাশয় ইহজীবনে এরূপ বদান্যতা ও ত্যাগস্বীকারের পরিচয় আর কখনও দেন নাই—এবার একটু বিশেষ কারণ ছিল। টাকাটি দিয়া নাতনির মুখ দেখিলেন।

ঝি টাকাটি হাতে লইয়া অসন্তুষ্টের মত অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বলা বাহুল্য, মেয়ের আদর এখন সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করিয়াছে। কলেজের নব্যবাবু শ্বশুরালয়ে গিয়া, গিনি দিয়া প্রথমা কন্যার মুখ দেখিলে, পাড়ার লোক সেটাকে বাড়াবাড়ি বলিয়া আর হাস্য করে না। সুতরাং টাকাটি ঝির মনে ধরিবে কেন?

সে ভাবিল, 'মর মিন্‌ষে, এত কষ্টের প্রথম মেয়েটি,—আহা, তাতে আবার মা-মরা,—একটু সোণা জুটল না মুখ দেখতে!'

ক্রমে অন্ধকার হইল। মুখোপাধ্যায় হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যাবন্দনার জন্য বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। পূজার আসনে বসিবামাত্র শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বেহাইন, "ওগো মা আমার কোথায় গেলিগো" বলিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছেন। মাতৃহৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত শোকার্ত্তরবে সন্ধ্যাদেবী যেন শিহরিয়া উঠিলেন। হৃষীকেশের চক্ষু হইতেও ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সীতানাথ মূঢ়ের মত পূজার আসনে বসিয়া রহিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"হা নারায়ণ, কি করলে!"

কান্না থামিলে সীতানাথ সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিলেন। তাহার পর জলযোগে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরটা কে যেন টিপিয়া ধরিয়া থাকিল। যে কাযের জন্য এতখানি গঙ্গাপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ত এখন পর্য্যন্ত একটি কথাও বলা হইল না। বৈকাল হইতে কতবার বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারেন নাই। শেষকালে স্থির করিলেন—'দূর হোক্ গে, কাল সকালেই বলব, রাত্রিটে কোন মতে কাটিয়ে দিই।'

আহারান্তে বৈঠকখানাতেই তাঁহার শয্যা প্রস্তুত হইল। হৃষীকেশ রাত্রির মত বিদায়গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকথিত ভৃত্যবালক, সেই ঘরেই একপাশে কম্বল পাতিয়া শুইল।

দুশ্চিন্তায় সমস্তরাত্রি ব্রাহ্মণের নিদ্রা হইল না। যে কাজের জন্য আসিয়াছেন, তাহা সফল হইবে কি হইবে না, এই ভাবিয়া ভাবিয়াই রাত্রি কাটিল। তামাক সাজিতে সাজিতে চাকর ছোঁড়ার প্রাণান্ত হইল। রাত্রি তিনটার সময় যখন সীতানাথ তামাক সাজিবার জন্য আবার তাহাকে জাগাইলেন, তখন সে বলিল, "তামুক আর নেই ঠাকুর, সব ফুরিয়ে গিয়েছে।" বেগতিক দেখিয়া শেষবারে তামাক সাজিবার সময় সে বাকী তামাকটুকু জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কার্য্যোদ্ধার

সকাল হইলে দুর্গা দুর্গা বলিয়া সীতানাথ গাত্রোত্থান করিলেন। বৈবাহিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ধূমপান করিতে করিতে সীতানাথ স্থির করিলেন এইবার বলি। মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সূচনাটা এইরূপ হইল।—

"বেহাই মশাই—অদৃষ্ট ছাড়া ত আর পথ নেই, আমাদের যা অদৃষ্টে ছিল তা কে খণ্ডন করবে বল? আমার আর চারটি বউ আছে, কিন্তু ছোট বউমা যেমন ছিলেন, তেমনটি কেউ নয়। আমার এত গুণের বউকে গিন্নী দেখে যেতে পান নি, সেই দুঃখই চিরকাল থাকবে। মার আমার যেমন রূপ তেমনি গুণ ছিল। তাঁর গুণে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বশ হয়েছিল। বাড়ীতে রাঙী বলে একটা গাই আছে, এমনি বজ্জাত, তার ত্রিসীমানায় কেউ যেতে পারে না, শিঙ পেতে গুঁতোতে আসে, কেবল ছোট বউমা কাছে গেলে সে কিছু বলত না। যায়ে যায়ে ঝগড়া কলহ, এ ত চিরদিন সকল সংসারে চলে আসছে, কিন্তু আমার অন্য বউরা, ছোট বউমাকে নিজেদের সহোদরা ভগ্নীর মত মনে করতেন। দুঃসংবাদটা শুনে বড় বউমা একেবারে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন। তিন দিন, তিন রাত্রি, জলস্পর্শ করেন নি। আজও বলেন, আমার পেটের সন্তান গেলে এতটা হত না।"

হৃষীকেশ চক্ষুর জলে মাটি ভিজাইতেছিলেন। কম্পিতস্বরে বলিলেন—"বেয়াই মশাই, থাক আর সে সব কথা কয়ে ফল কি, অন্য কথা বলুন।"

সীতানাথ চুপ করিলেন। তাঁহার ভূমিকাই তাঁহাকে মাটি করিয়া দিল। নীরবে নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ

হৃষীকেশ মনে মনে বলিলেন—'না বাঁচ ত ঐ গহনাতে তোমার শ্রাদ্ধের যোগাড় করা যাবে।' প্রকাশ্যে বলিলেন—"তা হলে আপনার গহনা আমাদেরই কাছে থাকবে। ঐ গহনা দিয়ে আপনার পৌত্রীর বিবাহ দেব।"

সীতানাথ শ্লেষের স্বরে বলিলেন—"তুমি কি মনে করেছ, আমার নাতনী চিরদিনই তোমার ঘরে থাকবে? একটু বড় হলেই ওকে আমি নিয়ে যাব। বড় বউমা মেয়েটিকে দেখবার জন্যে পাগল। আসবার সময় আমাকে বললেন—'বাবা আমিও তোমার সঙ্গে যাব খুকিকে দেখে আসব?' বিবাহের কথা বলছ, তা ভাই আমাদের এমন কপাল কি হবে? ঐ মেয়ে কি আর বাঁচবে? ওর যে রকম চেহারা দেখলাম তাতে কোন মতেই ত সে আশা করা যায় না।"

হৃষীকেশ ব্যবসায়বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক—স্তোকবাক্যে ভুলিবার পাত্র নহেন। বলিয়া ফেলিলেন—"তা গহনা এখন থাকুক না। যখন মেয়ে নিয়ে যাবেন তখনি গহনা নিয়ে যাবেন।"

কথাটা শুনিয়া সীতানাথ জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ভায়া হে, আমাকে কি অবিশ্বাস করলে? জিনিষগুলি আটক করে ব্রাহ্মণকে মনঃক্ষুণ্ণ করে ফিরিয়ে দিলে কি তোমার মঙ্গল হবে?"

হৃষীকেশ বেহাইয়ের চরিত্র পূর্ব্বাবধিই জানিতেন। তিনি যখন ধরিয়াছেন গহনা লইয়া যাইবেন, তখন যে না লইয়া ফিরিবেন এমন আশা নাই। সুতরাং আর আপত্তি উত্থাপন করা নিষ্ফল মনে করিলেন। বলিলেন—"তবে নিয়ে যান।"

সীতানাথের মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। বলিলেন, "আহারাদির পর সকাল সকাল আজই বেরুতে হবে,—তুমি তবে সেগুলো বের করে ঠিক করে রাখ, আমি গঙ্গাস্নানটা সেরে আসি।"

গঙ্গার ঘাটে আসিয়া অনেক দূর হইতে মাঝিকে উচ্চস্বরে বলিলেন—"ও মাঝি, যে বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিলাম সে তারা রাজি নয়। বলে অত গরীবের ঘরে আমরা মেয়ে দেব না। নৌকো ঠিক করে রাখ, খাওয়া দাওয়ার পর ছাড়া যাবে।" বলিয়া ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘাটসুদ্ধ লোক তাহার কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছে কি না।

যেরূপ উচ্চকণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল তাহাতে নিতান্ত বধির ভিন্ন আর কাহারো না শুনিতে পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। লোকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।

তাহার পর সীতানাথ গঙ্গাস্নান সমাপ্ত করিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত ঘাটে আহ্নিক করিতে বসিলেন। আজ দেবতাগণের বড়ই শুভাদৃষ্ট। এরূপ ভক্তিবাহুল্যের সহিত পূজা সীতানাথ অনেককাল করেন নাই।

বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আহারাদি শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিলেন। বুড়ার আর দেরী সহে না। হৃষীকেশকে বলিলেন—"ভাই, এইবার জিনিষ-গুলি নিয়ে এস, দুর্গা বলে সকাল সকাল যাত্রা করি।"

হৃষীকেশ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বড় বিলম্ব করিতে লাগিলেন। সীতানাথ ভাবিলেন, সেই দিতেই হইবে, তবু কেমন যে কৃপণের স্বভাব, যতক্ষণ পারে ততক্ষণ দেরী করিতেছে। যাহা হউক, মনটার অবস্থা বেশ উৎফুল্ল থাকার দরুণ সীতানাথ গুণ গুণ করিয়া একটা রাগিণী ধরিলেন—

ছাড়ো মন বিষয়েরি ভাবনা অসার,
শুধু রাধানাথো পদো করো চিন্তা অনিবার।

হৃষীকেশকে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সীতানাথের গান সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইল। বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি হল?"

"হল না।"

"সে কি?"

হৃষীকেশ ব্যাপারখানা বুঝাইলেন—"মুখুয্যে মশাই, জিনিষগুলি আপনাকে দিতে প্রস্তুতই হয়েছিলাম। গিন্নীকে গিয়ে বলাতে প্রথম তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। শেষে বললেন—'চাবি ত নেই। চাবি আমার মায়ের কাঁকালে ছিল, সে তাঁরই সঙ্গে চিতায় উঠেছে।' "

কথাটা সীতানাথের বিশ্বাস হইল না। রাগিয়া বলিলেন—"সে আমি শুনব না। চাবি না থাকে বাক্স ভাঙ্গ। জিনিষ আমি না নিয়ে যাচ্ছিনে।"

হৃষীকেশ বলিলেন—"যদি না যান তবে বসে থাকুন। চাবি নেই; আমি কি করব? এই ত অবস্থা। এর ওপর কি কামার ডেকে এনে

দমাদ্দম্ করে সিন্দুক ভাঙ্গান ভাল দেখায়, না সেটা করান আপনারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় ?"

সীতানাথ মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন—"না, আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয় না। ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দেওয়াটাই তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয়। দেবে কি না দেবে সেটা খোলসা করে বল দেখি। যদি না দাও তবে পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে যাব, উচ্ছন্ন যাবে, তেরাত্তির পোয়াবে না।"

বৈবাহিকপ্রবরের মুখচোখের ভঙ্গিমা দেখিয়া হৃষীকেশ বড় অপমান বোধ করিলেন; মনে মনে ভারি ঘৃণা হইল। স্বয়ং গিয়া কামার ডাকিয়া আনিলেন। দোতালার উপর তাহাকে লইয়া গিয়া সিন্দুক ভাঙ্গাইলেন। মেয়ের মা এই নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া মাটিতে লুটাপুটি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বৈবাহিক গহনা লইয়া বিদায় হইলে, হৃষীকেশও শয্যাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সে দিন আর এই দম্পতির মুখে অন্নগ্রাস উঠিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুড়া বর

ভাগীরথীর তীরে বৃক্ষরাজিবেষ্টিত নবগ্রাম। ভোর হইয়াছে। সকল এখনও প্রভাতী কলকূজন আরম্ভ করে নাই। একখানি ছেঁড়া বালাপোষ গায়ে দিয়া, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, বৃদ্ধ সীতানাথ ধীরে ধীরে স্বীয় ভবনাভিমুখে চলিতেছেন। পূর্ব্বরাত্রির বৃষ্টিজল বৃক্ষপল্লব হইতে টপ টপ করিয়া ঝরিয়া তাঁহার পাগড়ি ও বালাপোষ ভিজাইয়া দিতেছে।

ক্রমে তিনি নিজবাটীর সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দরজা বন্ধ। দুই পাশে দুইটি ইষ্টক নির্ম্মিত দেউড়ি বা বসিবার স্থান। তাহা বহুকাল সংস্কারের অভাবে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। দুইদিকে দুইটি কলিকা ফুলের গাছ এক গা করিয়া ফুলের গহনা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দ্বারে উপস্থিত হইয়া ক্ষীণরুগ্নকণ্ঠে সীতানাথ ডাকিলেন—"নিতাই।"

একবার, দুইবার, তিনবার ডাকাডাকির পর বাড়ীর ভিতর হইতে উত্তর পাওয়া গেল—"যাই গো।" নিতাই ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। প্রভুর পানে চাহিয়া সে অবাক। সপ্তাহের মধ্যে আকার প্রকার যেন একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে ছাতা নাই, লাঠি নাই, ব্যাগ নাই, এ বালাপোষ কোথা হইতে আসিল! ভাবিয়া নিতাই কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। নিতাই তাঁতির ছেলে, ভৃত্য বালক। এপ্রেন্টিসি করিতেছিল, মাহিনা পায় না, 'প্রসাদ' পায় মাত্র। সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে নিতাই, বাড়ীর সব ভাল?"

নিতাই বলিল—"ভাল। আপনার লাঠি আর ছাতা কই?"

বৃদ্ধ অতি করুণভাবে নিতাইয়ের প্রতি নেত্রপাত করিলেন।

নিতাই বলিল—"ফেলে এসেছেন বুঝি?"

বৃদ্ধ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—"হাঁ নিতাই, সে গেছে।"

পাকা বাঁশের লাঠিগাছটির উপর নিতাইয়ের অনেকদিন হইতে লোভ পড়িয়াছিল। একদিন সুযোগ পাইলে লাঠিখানি সে চুরি করিয়া বাড়ী রাখিয়া আসিবে, অনেক দিন হইতেই ইহা তাহার মনে মনে ছিল। সেইজন্য সে কিঞ্চিৎ দুঃখ অনুভব করিল। মনে করিল, নিশ্চয়ই সেই মতিগঞ্জের বাড়ীর কোনও ছোঁড়া চাকরের কায, সেই লইয়াছে, লোভ সামলাইতে পারে নাই। কিন্তু ছাতাটাও লইল! সে ছাতা এমনি ছেঁড়া ছিল যে তাহা মনিব তাহাকে বখ্‌সিস্ করিলেও নিতাই লইত কিনা সন্দেহ! যদিও বা লইত, তবে তাহার বেতের শিকগুলি খুলিয়া লইয়া ধনুকের তীর করা চলিত মাত্র, সে ছাতা আর কোনও কাযে লাগিত না।

সীতানাথ একবারে নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন। নিতাই চকমকি ঠুকিয়া সোলায় আগুন ধরাইল। তামাক সাজিয়া কর্ত্তার হাতে দিল।

কর্ত্তা হুঁকাটি কলঙ্কধরা পিতলের বৈঠকের উপর রাখিয়া দিলেন। তাম্রকূটের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ বিরাগ ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। চক্ষু নত করিয়া মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া, সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিলেন—"হা হা হা হা—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

ব্যাপারখানা দেখিয়া নিতাই সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। বড় বধূঠাকুরাণী তখন উঠিয়া বারান্দা মার্জ্জনা করিতেছিলেন, নিতাই তাঁহাকে কর্ত্তার অবস্থা জানাইল। তিনি বলিলেন, "বড়বাবুকে উঠোগে যা।"

বড়বাবু সীতানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাস উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি! আপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন? কোন বিপদ আপদ হয় নি ত?"

বৃদ্ধ লম্বিত মস্তক তুলাইয়া করুণস্বরে বলিলেন—"হা হা হা হা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কি হল, দিলে না?"

"দিয়েছিল রে দিয়েছিল—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

পিতা যদি আরও কিছু বলেন, এই আশায় শ্রীনিবাস তাহার মুখের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধের মুখ হইতে হা হুতাশের অস্ফুট ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নির্গত হইল না।

অবশেষে শ্রীনিবাস বলিলেন—"তবে কি হল? খোয়া গেল?"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন—"হা হা হা হা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

শ্রীনিবাস এইবার একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি হল, খুলেই বলুন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে গেছে রে, নোকসান হয়ে গেছে।"

"কেমন করে গেল? চুরি গেছে?"

"না।"

"ডাকাতে নিয়েছে?"

"না।"

"তবে?"

অনেক কষ্টে এবার বৃদ্ধ বলিলেন—"চাঁদবাড়ীর ভূধর চাটুয্যে নিয়েছে।"

পুত্র রাগিয়া বলিল—"সে আবার কে? সে কি করে গহনার বাক্স

নিলে? ছিনিয়ে নিলে? আপনি চুপ চাপ চলে এলেন, পুলিসের সাহায্য নিলেন না?"

"পুলিসে কি আমি যাই নি? পুলিসেও গিয়েছিলাম, থানার দারোগা ভূধর চাটুয্যের ভগ্নীপতি রে ভগ্নীপতি।"

"ভগ্নীপতিই হোক আর বাবাই হোক। এত্তেলা দিলে ডাইরিতে তাকে লিখে নিতেই হবে, অনুসন্ধান করতেই হবে।"

"লিখে নেবে কি, উল্টো সে আমায় মিথ্যে নালিসের দায়ে জেলে দেবার ভয় দেখালে।"

কলিকাতায় যে মেসের বাসায় থাকিয়া শ্রীনিবাস লেখাপড়া করিতেন, সেই বাসায় আইন অধ্যয়নকারী একটি ছাত্র ছিল। তাহার মুখে শ্রীনিবাস মাঝে মাঝে আইন সম্পর্কীয় অনেক তর্কবিতর্ক শুনিতে পাইতেন। সেই অবধি শ্রীনিবাস নিজেকে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। নগদ আট আনা খরচ করিয়া একখানি 'মোক্তার গাইড্' পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। গ্রামের লোকের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, প্রায়ই শ্রীনিবাস কোন না কোন পক্ষের সহায়তা করিয়া পরামর্শদান করেন। গম্ভীরভাবে পিতাকে বলিলেন —"ব্যাপারটা কি হয়েছে, সব আদ্যোপান্ত খুলে বলুন, দেখি আমি এর কিছু প্রতিকার করতে পারি কি না।"

তখন বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই এক ঘণ্টা কাল ব্যাপী সকরুণ বক্তৃতার ভিতর হইতে সমস্ত হাহুতাশ, অশ্রুপাত, অনাবশ্যক মন্তব্য বাদ দিয়া সারাংশটুকু মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকা গুণ টানিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ গুণ ছিঁড়িয়া গিয়া নৌকা বিপরীত দিকে মহাবেগে ছুটিয়া যায়। চন্দ্রবাটীর ঘাটে একখানা মাল বোঝাই প্রকাণ্ড ভড়ে ঠেকিয়া নৌকা ভাঙ্গিয়া গেল। গহনার বাক্স চাদর দিয়া সীতানাথের পিঠে বাঁধা ছিল। অচেতন অবস্থায় সীতানাথকে জল হইতে তুলিয়া ভূধর চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে গৃহে লইয়া যায়। শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, কিন্তু গহনার বাক্স দিল না।

শ্রীনিবাস ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গহনার কথা সে নিজমুখে স্বীকার করেছে?"

ব্যাপারখানা দেখিয়া নিতাই সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। বড় বধূঠাকুরাণী তখন উঠিয়া বারান্দা মার্জ্জনা করিতেছিলেন, নিতাই তাঁহাকে কর্ত্তার অবস্থা জানাইল। তিনি বলিলেন, "বড়বাবুকে উঠোগে যা।"

বড়বাবু সীতানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাস উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি! আপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন? কোন বিপদ আপদ হয় নি ত?"

বৃদ্ধ লম্বিত মস্তক তুলাইয়া করুণস্বরে বলিলেন—"হা হা হা হা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কি হল, দিলে না?"

"দিয়েছিল রে দিয়েছিল—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

পিতা যদি আরও কিছু বলেন, এই আশায় শ্রীনিবাস তাঁহার মুখের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধের মুখ হইতে হা হুতাশের অস্ফুট ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নির্গত হইল না।

অবশেষে শ্রীনিবাস বলিলেন—"তবে কি হল? খোয়া গেল?"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন—"হা হা হা হা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

শ্রীনিবাস এইবার একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি হল, খুলেই বলুন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে গেছে রে, নোকসান হয়ে গেছে।"

"কেমন করে গেল? চুরি গেছে?"

"না।"

"ডাকাতে নিয়েছে?"

"না।"

"তবে?"

অনেক কষ্টে এবার বৃদ্ধ বলিলেন—"চাঁদবাড়ীর ভূধর চাটুয্যে নিয়েছে।"

পুত্র রাগিয়া বলিল—"সে আবার কে? সে কি করে গহনার বাক্স

নিলে ? ছিনিয়ে নিলে ? আপনি চুপ চাপ চলে এলেন, পুলিসের সাহায্য নিলেন না ?"

"পুলিসে কি আমি যাই নি ? পুলিসেও গিয়েছিলাম, থানার দারোগা ভূধর চাটুয্যের ভগ্নীপতি রে ভগ্নীপতি।"

"ভগ্নীপতিই হোক আর বাবাই হোক। এত্তেলা দিলে ডাইরিতে তাকে লিখে নিতেই হবে, অনুসন্ধান করতেই হবে।"

"লিখে নেবে কি, উল্টো সে আমায় মিথ্যে নালিসের দায়ে জেলে দেবার ভয় দেখালে।"

কলিকাতায় যে মেসের বাসায় থাকিয়া শ্রীনিবাস লেখাপড়া করিতেন, সেই বাসায় আইন অধ্যয়নকারী একটি ছাত্র ছিল। তাহার মুখে শ্রীনিবাস মাঝে মাঝে আইন সম্পর্কীয় অনেক তর্কবিতর্ক শুনিতে পাইতেন। সেই অবধি শ্রীনিবাস নিজেকে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। নগদ আট আনা খরচ করিয়া একখানি 'মোক্তার গাইড্' পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। গ্রামের লোকের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, প্রায়ই শ্রীনিবাস কোন না কোন পক্ষের সহায়তা করিয়া পরামর্শদান করেন। গম্ভীরভাবে পিতাকে বলিলেন—"ব্যাপারটা কি হয়েছে, সব আদ্যোপান্ত খুলে বলুন, দেখি আমি এর কিছু প্রতিকার করতে পারি কি না।"

তখন বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই এক ঘণ্টা কাল ব্যাপী সকরুণ বক্তৃতার ভিতর হইতে সমস্ত হাহুতাশ, অশ্রুপাত, অনাবশ্যক মন্তব্য বাদ দিয়া সারাংশটুকু মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকা গুণ টানিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ গুণ ছিঁড়িয়া গিয়া নৌকা বিপরীত দিকে মহাবেগে ছুটিয়া যায়। চন্দ্রবাটীর ঘাটে একখানা মাল বোঝাই প্রকাণ্ড ভড়ে ঠেকিয়া নৌকা ভাঙ্গিয়া গেল। গহনার বাক্স চাদর দিয়া সীতানাথের পিঠে বাঁধা ছিল। অচেতন অবস্থায় সীতানাথকে জল হইতে তুলিয়া ভূধর চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে গৃহে লইয়া যায়। শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, কিন্তু গহনার বাক্স দিল না।

শ্রীনিবাস ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গহনার কথা সে নিজমুখে স্বীকার করেছে ?"

"প্রথম স্বীকার করে নি। আমার যখন জ্ঞান হল তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আমার পিঠে যে একটা বাক্স বাঁধা ছিল, সে কোথা? বললে তা ত কই আমরা পাই নি। তখন আমি চীৎকার করে বললাম, আমার সর্ব্বস্ব গেল রে, ব্রহ্মহত্যে করলে রে,—বলে আবার আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। ফের যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি কোথা থেকে একটা ডাক্তার নিয়ে এসেছে,—ডাক্তারটি বললে—তোমার কোনও ভাবনা নেই, তোমার বাক্স আছে। আমার সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, নাড়ি দেখে ওষুধ দিলে, বলে গেল তোমার কোনও ভয় নেই, তিন দিনের মধ্যে তুমি সেরে উঠবে।"

শ্রীনিবাস উৎসাহের সহিত বলিলেন—"তবে আদালতে নালিস করে ডাক্তারকে সাক্ষী মানব। কাণ ধরে ভূধর চাটুয্যের কাছ থেকে গহনা আদায় করে নেন না!"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে দফাও রফা রে, সে দফাও রফা। ডাক্তারের কাছে কি যাই নি, ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলাম। ডাক্তার বললে, গহনার কথা সে কিছুই জানে না। কেবল আমায় সান্ত্বনা করবার জন্যে মিছে করে বলেছিল। আদালতে নালিস করলে আর কি হবে, ডাক্তার ঐ কথা বলে বসবে।"

"তবে কি করে জানলেন, ভূধর চাটুয্যে নিয়েছে?"

"তার পরে ভূধর চাটুয্যে নিজেই বলেছে।"

"স্বীকার করলে নিয়েছি, অথচ দিলে না? বাঃ—বেশ লোক ত! তবে তার স্বীকার করবার উদ্দেশ্যটা কি? অস্বীকার করাই ত তার পক্ষে সুবিধে ছিল।"

"উদ্দেশ্য আছে রে, উদ্দেশ্য আছে। বলে তোমার ছোট ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও। তা হলে ঐ গহনাগুলি সব পাবে। আমি গরীব, আমার মেয়ের বিয়ে হয় না। তোমার গহনা তোমার ঘরেই যাবে; পুরস্কারের স্বরূপ আমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবে।"

কথাটা শুনিয়া শ্রীনিবাস বলিলেন—"তবেই ত দেখছি গোলযোগ।" বলিয়া অভ্যাসবশতঃ গুম্ফপ্রান্ত দন্তে দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সীতানাথের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীমান অন্নদাচরণ। তিনি এল-এ ফেল করা নব্যযুবক। মেজাজটা নিতান্তই সাহেবী ধরণের। প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিস্কুট সহযোগে নিয়মিতরূপে চা পান করিয়া থাকেন। গ্রামের বালকদিগের মধ্যে বিদ্বান বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। চেহারাটি দিব্য,—রবীন্দ্রীয় কেশদাম তাঁহার কমনীয় মুখসৌন্দর্য্য বহুগুণ বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল। স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি বিস্তর কবিত্ব প্রকাশ করিয়া, 'ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু' নামধেয় একখানি চটি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। যতবার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে, অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বন্ধুসমাজে পত্নীবৎসল বলিয়া তাঁহার সম্মানের আর সীমা নাই। তাঁহাকে এ বিবাহে রাজী করা যাইবে, এমন কোনও আশা ছিল না, তাই শ্রীনিবাস বলিয়াছিলেন—"তবেই ত দেখছি গোলযোগ।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখ চেষ্টা করে, বলে কয়ে দেখ, নইলে এ বুড়ো বয়সে অতগুলি টাকার গহনার শোক আমি সহ্য করতে পারব না, আমি মারা যাব। ওকে বোলো বিবাহ না করলে পিতৃহত্যার পাপ ওকে লাগবে।"

অন্নদার চারিটি দাদা, অন্নদাকে পাকড়াও করিয়া আনিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া কত রকমে তাহাকে বুঝাইলেন; কত মিনতি করিলেন, তর্ক করিলেন, রাগ করিলেন, কিছুতেই অন্নদার মন টলিল না।

অন্নদার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবগণকে খোসামোদ করিয়া তাহাদের দ্বারায় অনুরোধ চলিতে লাগিল। পুনর্ব্বার দারগ্রহণের বিরুদ্ধে অন্নদা যত প্রকার যুক্তির অবতারণা করিল, তাহার বন্ধুরা সেগুলি, যখন যেরূপ সুবিধা হইল, সুতর্ক বা বিতর্কের সাহায্যে একে একে খণ্ডন করিল। কাযের কথা ছাড়িয়া যখন ভাবের কথা আসিয়া পড়িল, তখন তাহারা বিজয়ীর মত অবজ্ঞাহাস্য করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে শোকবিহ্বল মৃতপত্নীকের দ্বিতীয় দারগ্রহণের অজস্র উদাহরণ আনিয়া স্তূপীকৃত করিল। দেখ অমুক, স্ত্রী বিয়োগের পর সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেল, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে লোটা কম্বল

কাঁধে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজে মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিল। দেখ অমুক, স্ত্রীবিয়োগের পর এক জন যশস্বী কবি হইয়া পড়িল, বঙ্কিম বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া দেশসুদ্ধ সকলেই সমস্বরে বলিল, বাঙ্গালা ভাষায় একখানা কাব্য জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু সেই আবার একটা আধটা নয়, দুই দুইটা বিবাহ করিল। ইত্যাদি প্রকারের যুক্তিতর্ক-সময়ে অন্নদা শেষে পরাজয় স্বীকার করিল বটে, কিন্তু বিবাহ করিতে রাজি হইল না।

এ দিকে আর সময় নাই। ভূধর চট্টোপাধ্যায় দশদিন মাত্র সময় দিয়াছিল। ২০শে শ্রাবণ বিবাহের শেষ দিন। তাহার তিন দিন কাটিয়াছে, সপ্তাহ মাত্র বাকী।

ছেলে যখন কিছুতেই রাজি হইল না, তখন বাপ বলিল, তবে আমিই বিবাহ করিব। দু-দু হাজার টাকার গহনা আমি কোন মতেই হাতছাড়া করিতে পারিব না, ইহাতে আমার কপালে যাহাই থাকুক।

এই সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হইবামাত্র একটা মহা হাসি টিটকারি পড়িয়া গেল। লোকে বলিল, গহনা হারাণ, নৌকা উল্টানো সব ছল মাত্র। সুন্দরী যুবতী মেয়েটিকে দেখিয়া হারাইয়াছে বুড়ার মন, আর উল্টাইয়াছে বুড়ার বুদ্ধিসুদ্ধি। কেহ বলিল, বুড়াকে চেনা ভার, দুধটুকু মরিয়া ক্ষীরটুকু হইয়া আছে। কেহ বলিল, একখানা দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটক কিনিয়া উহাকে প্রেজেণ্ট কর! কেহ বলিল, বুড়ার প্রাণের ভিতরটা যে এমন করিয়া হামাগুড়ি দিতেছে তাহা ত আমরা জানিতাম না। একজন গান বাঁধিতে জানিত, সে বহুলোকের অনুরোধে এই উপলক্ষে কয়েকটা মজাদার গান বাঁধিয়া দিল।

যাহারা সমাজের বিজ্ঞ লোক বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের দুই একজন আসিয়া সীতানাথকে বলিলেন—"মুখুযো মশাই, আপনি ত বিবাহ করতে যাচ্ছেন, তারা যদি আপনাকে মেয়ে না দেয়? আপনি কিঞ্চিৎ বয়স প্রাপ্ত হয়েছেন কি না, মেয়ে হঠাৎ দিতে সম্মত নাও হতে পারে?"

সীতানাথ বলিলেন—"ও হারামজাদা যে বিবাহ করবে না তা আমি আগে থেকেই জানতাম। ছেলে যদি বিবাহ না করে, তবে আমি বিবাহ করলেও অলঙ্কার দেবে বলেছে। পেল্লায় মেয়ে এত বড়,

অর্থাভাবে আজও বিবাহ হয় নি, তাদের আর জাত থাকে না, যুবা বুড়ার বিচার করলে তাদের কি করে চলবে ?"

পাড়ার লোকের, গ্রামের লোকের যতই আমোদ হউক, বাড়ীর লোকের মাথায় এ কথা শুনিয়া যেন বজ্রাঘাত হইল। চারি ছেলে, চারি বধূ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহারা স্বতঃ পরতঃ নানা উপায়ে নানা প্রকারে বুড়াকে বুঝাইতে লাগিল।

সীতানাথ বলিলেন—"দেখ আমার বিবাহ করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। তোমরা অন্নদাকে রাজি কর, আমি ছেলের বিবাহ দিয়ে সোনার চাঁদ বউ ঘরে আনি।"

র সঙ্গে বিদ্রূপ
অন্নদা বেচারি কিয়ং পরিমাণে রেহাই পাইয়াছিল, এই য়া বলিলাম।
দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আবার তাহার উপর উৎপীড়ন ত তাঠাকুর যেন
শেষে অন্নদা চোখ মুখ লাল করিয়া রাগিয়া বলিল—"৫ নাই। ওটি
আমাকে এমন করে দিক্ করবে, তবে আমি বিবাগী হয়ে রুণীযোগে
পানে চলে যাবো।" বড় বধূ রাগিয়া বলিলেন—"ঢের দেখো রিবারে
দেখেছি ঠাকুরপো, এই বয়সে কত দেখলাম, বাঁচি ত আরও স্যা
দেখবো। এখন এ রকম করছ, কিন্তু শেষরক্ষে হলে হয়।"

২৪শে শ্রাবণ। বিবাহের আর পাঁচদিন মাত্র বাকী। সীতানাথ টাকাকড়ি লইয়া কলিকাতায় গেলেন। বলিয়া গেলেন, আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনিয়া সেইখান হইতেই বিবাহ করিতে যাইবেন।

বৃদ্ধ যাত্রা করিলে পর বাড়ীতে নূতন করিয়া মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। ছোটবড় সকলেই অন্নদার প্রতি একেবারে খড়্গহস্ত। প্রায় দশ বৎসরকাল গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে ;—ছেলে মেয়ে নাতি পুতি ভরা সংসার—সীতানাথ আর দারপরিগ্রহ করেন নাই,—লোকেও সে পরামর্শ দেয় নাই। আজ দশবৎসরকাল বড়বধূ ঘরের গৃহিণী। হঠাৎ নোলকপরা মূর্ত্তিমতী উপদ্রবরূপিনী একটি কচি মেয়ে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে গৃহস্থালীর শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইবে, এ কল্পনা মাত্র নিতান্তই যন্ত্রনাদায়ক হইল। বড়বধূ আবার কাঁদিতে কাঁদিতে অন্নদাকে মিনতি করিতে আরম্ভ করিলেন—"অনু ভাই লক্ষ্মীটি,

এখনও সময় আছে, এখনও বিবাহ কর, নইলে সোনার সংসার ছারেখারে যায়।”

অন্নদা হঠাৎ বলিল—“দেখ বউদিদি, আমি একটা মৎলব স্থির করেছি। শুনলাম তারা বড় গরীব, তাই মেয়েটির বিয়ে হয় না। তোমরা কোন রকমে হাজার খানেক টাকা আমাকে সংগ্রহ করে দাও, আমি সেই টাকা ভূধর চাটুয্যেকে দিয়ে বলি আপনি ব্রাহ্মণ, কন্যাদায়গ্রস্ত, কিঞ্চিৎ সাহায্য করলাম, মনোমত সুপাত্র এনে মেয়ের বিবাহ দিন। আমার গহনাগুলি ফিরিয়ে দিন। তা তারা দিতে পারে। [illegible] ্মিক নয়, তাদের ব্যবহারে তা জানা যাচ্ছে। অনায়াসেই কাটিয়াছে, স[illegible] কথা অস্বীকার করতে পারত।”

ছেলে ব[illegible]কলে মিলিয়া তোলাপাড়া করিয়া বলিল, হাঁ এ পরামর্শ আমিই বিবা[illegible]চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

হাতছাড়া [illegible] দায়:—পরিবারস্থ সকলের মধ্যে চাঁদা করিয়া, কিছু ঋণ এই হাজার টাকা জমা হইল। সকালে সীতানাথ রেলপথে [illegible]কাতা যাত্রা করিয়াছিলেন, সন্ধ্যার সময় অন্নদার নৌকা চন্দ্রবাটী অভিমুখে রওনা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একখানি পত্র

চন্দ্রবাটী গ্রাম।

তাং ২৭শে শ্রাবণ।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

সংখ্যাতীত প্রণামান্তে নিবেদন,

আপনি কলিকাতায় রওনা হইবার পরদিবস আমি কার্য্যগতিকে চন্দ্রবাটী গ্রামে উপস্থিত হই। প্রথমেই মহাশয়ের জীবনদাতা বন্ধু শ্রীযুক্ত ভূধরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। উক্ত মহাশয় পরম

সজ্জনব্যক্তি ;—যারপরনাই আদর অভ্যর্থনায় আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আমি তাঁহারি গৃহে অতিথি।

আমার পরিচয় পাইয়া গ্রামের কয়েকটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন—"বাপ্ হে, শুনিতেছি নাকি তুমি এই ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?" আমি সবিনয় প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম যে আমি নহি, পরন্তু আমার পূজনীয় পিতৃদেব উক্তা বালিকাটির পাণিপীড়ন করিতে অভিলাষী। কথাটা শুনিয়া বিজ্ঞলোকটি থতমত খাইয়া গেলেন। মনে করিলেন, বুঝি আমি তাঁহার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছি। অবস্থা দেখিয়া, আমি তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলাম। শুনিয়া বিজ্ঞ ভদ্রলোকটি বলিলেন—"সর্ব্বনাশ, তোমার পিতাঠাকুর যেন এমন কার্য্য না করেন। ও মেয়েটির জাতিকুলের ঠিকানা নাই। ওটি কুড়ানো মেয়ে। তেরো চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে যেবার মহাবারুণীযোগে ত্রিবেণীতে লক্ষলোকের সমাগম হইয়াছিল, সেই বৎসর সপরিবারে সেখানে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া চট্টোপাধ্যায় ঐ মেয়েকে কুড়াইয়া পায়। ও মেয়ের বয়স তখন বছর দুই আন্দাজ। নিঃসন্তান বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মেয়েটিকে কন্যার মত প্রতিপালন করিয়াছে। অনেকবার ও মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধও হইয়াছিল, কিন্তু পাছে কোনও সৎ কুলীন ব্যক্তির জাতিনাশ হয়, এই আশঙ্কায় আমরা প্রতিবারেই বরপক্ষীয়গণকে সাবধান করিয়া দিয়াছি ;—তোমাদিগকেও সাবধান করিয়া দিলাম।"

মহাবারুণীযোগের সময় ত্রিবেণীর ঘাটে মেয়েটিকে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। মেয়েটিকে একবার দেখিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলাম, আমার পিতাঠাকুর যখন আপনার কন্যার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন, তখন মেয়েটিকে একবার দেখা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। চট্টোপাধ্যায় কন্যাকে যথাসাধ্য বসন ভূষণে সাজাইয়া আমার সম্মুখীন করেন। মেয়েটিকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই। মুখখানি অবিকল আমাদের ছোটবধূর মত।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটির কোনও স্থায়ী রকমের ব্যাধি আছে কি না। তিনি প্রথমতঃ কিছুতেই কিছু স্বীকার করেন না। অনেক জেরা করিয়া বাহির করিলাম যে, মাঝে মাঝে মেয়ের বুকে অম্লশূলের মত একটা বেদনা দেখা যায়, দুই দিন কখনও বা তিন দিন 'বুক যায় বুক যায়' শব্দ,—তাহার পর ভাল হইয়া যায়। বৎসরে এরূপ দুই তিন বার হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই বিশ্বাসে পরিণত হইল। মেয়েটি আমার শ্যালিকা। হিসাব করিয়া দেখিলাম, ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বেই আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী মেয়েটিকে ত্রিবেণীর ঘাটে হারাইয়া আসেন। তখন তাহার বয়স দুই বৎসর মাত্র। সপ্তাহ ধরিয়া ত্রিবেণীর চতুর্দ্দিকে অনেক নিষ্ফল অনুসন্ধান হয়। মেয়েটির গায়ে অনেক সোনার গহনা ছিল, এই নিমিত্ত সকলে সিদ্ধান্ত করেন যে, গহনার লোভে কেহ তাহাকে হত্যা করিয়া থাকিবে। এ সমস্ত ইতিহাস আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। অম্লশূলের ব্যারামটা--উহাও একটা প্রধান কথা। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর উহা আছে, আমার স্ত্রীর ছিল, আমার শ্যালকগণও অল্পাধিক পরিমাণে ঐ পীড়াক্রান্ত।

যাহা হউক, আমি এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াই শ্বশুর মহাশয়কে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করি। অদ্য প্রভাতে তিনি আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। মেয়েটি যে তাঁহারি, সে বিষয়ে শ্বশ্রূদেবীর সংশয়মাত্র নাই।

অতঃপর আপনি যদি কন্যাটিকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে কতকটা সম্পর্কবিরুদ্ধ হয়। এই কারণেও বটে, আর মহাশয়কে এই বয়সে একটা গলগ্রহ করিয়া দিয়া (বিশেষতঃ কন্যাটি বয়স্থা) কষ্টে ফেলা উপযুক্ত সন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় না ভাবিয়া, আমিই তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। অতএব, আপনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া সত্বর আগমন করিবেন। বাড়ীতে দাদামহাশয়গণকে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। নিবেদনমিতি।

শ্রীঅন্নদাচরণ দেবশর্ম্মা।

পুনশ্চ।

যদি সময় থাকে তবে আসিবার পূর্ব্বে একবার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকানে উপস্থিত হইয়া মদ্রচিত 'ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু' নামক কাব্যখানির সমস্ত অবিক্রীত খণ্ডগুলি সঙ্গে আনয়ন করিবেন। চট্টোপাধ্যায়ের নামে একখানি পত্র লিখিয়া এই সঙ্গে দিলাম, আপনার প্রতি তাঁহার অবিশ্বাসের কোনও কারণ থাকিবে না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবেন, আমি যদি 'আত্মজীবন চরিত' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করি, তবে তিনি সে পুস্তক নিজব্যয়ে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। এই অলিখিত পুস্তকখানি অতীব মনোরম ও কৌতুকাবহ হইবার সম্ভাবনা। ইতি। শ্রীঅন্নদা।

পুঃ—২।

ভূধর চট্টোপাধ্যায় যে আমার প্রথমা পত্নীর অলঙ্কারের কথা বলিয়াছিলেন, এখন বলিতেছেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। পাছে মহাশয় সেগুলির অপ্রাপ্তিতে নিরাশা-দুঃখ অনুভব করেন, তাই এখন অবধি বলিয়া রাখিলাম। আমাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া তিনি এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মিথ্যাচরণের জন্য আমি তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"মুখুয্যে মহাশয় সম্বিত পাইয়া যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বাক্স কোথায়—আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম ও সত্য বলিয়াছিলাম কোন বাক্স পাই নাই। তাহার পর ডাক্তার আসে, এবং পরামর্শ দেয় ও কথা বলিও না, পীড়া বাড়িবে; বলিও বাক্স আছে; উহাকে ভাল হইতে দাও। আমিও মনে করিলাম এ সুযোগে মেয়েটিকে পার করিবার চেষ্টা করি। বাপু হে, আমার মেয়ের কিনারা হইতেছিল না। তাই দুইটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম। তা সে মিথ্যা কতক্ষণ টিকিত? বিবাহ হইলেই সমস্ত প্রকাশ হইত। তখন ত আর তোমরা মেয়ে ফিরাইয়া দিতে পারিতে না!" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যতই বিনয়ী ও অতিথিবৎসল হউন, নীতিজ্ঞান তাঁহার অতি শোচনীয়। এরূপ শিথিলনীতিক মনুষ্য যে আমার শ্বশুর হইলেন না, ইহাতে আমি নিজেকে নিজে অভিনন্দন করিতেছি। ইতি।

শ্রীঅঃ।

দেবী

সে আজ কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের কথা।

পৌষমাসের দীর্ঘ রজনী আর কিছুতেই পোহাইতে চাহে না। উমাপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। লেপের ভিতর অনুসন্ধান করিল, স্ত্রী নাই। বিছানা হাতড়াইয়া দেখিল তাহার ষোড়শী পত্নী এক পাশে গুটিস্থটি হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সরিয়া গিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার গায়ে লেপখানি চাপাইয়া দিল। পাশে পায়ের দিকে হাত দিয়া দেখিল কোথাও ফাঁক রহিতেছে কি না।

উমাপ্রসাদ বিংশতিবর্ষীয় যুবক। সম্প্রতি সংস্কৃত ছাড়িয়া সখ করিয়া পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মা নাই;—পিতা পরম পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান শক্তি-উপাসক, গ্রামের জমিদার, সম্মানের সীমা নাই। অনেকের বিশ্বাস, উমাপ্রসাদের পিতা কালীকিঙ্কর রায় মহাশয় একজন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ, আদ্যাশক্তির বিশেষ অনুগৃহীত। গ্রামের আবালবৃদ্ধ তাঁহাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

উমাপ্রসাদ আপনার নবীন জীবনে সম্প্রতি নবপ্রণয়ের মাদকতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু পত্নীর সহিত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত এই নূতন। স্ত্রীর নাম দয়াময়ী।

স্ত্রীর গাত্র আবৃত করিয়া উমাপ্রসাদ তাহার গণ্ডস্থলে একখানি হাত রাখিল—দেখিল সে স্থান শীতে শীতল হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে পত্নীর মুখচুম্বন করিল।

যেরূপ নিয়মিত তালে দয়াময়ীর নিশ্বাস বহিতেছিল, সহসা তাহার ব্যতিক্রম হইল। উমা জানিল স্ত্রী জাগিয়াছে। মৃদুস্বরে ডাকিল—"দয়া।"

দয়া বলিল—"কি ?" "কি"টা খুব দীর্ঘ করিয়া বলিল।

"তুমি বুঝি জেগে রয়েছ ?"

দয়া ঢোক গিলিয়া বলিল—"না ঘুমুচ্ছিলাম।"

উমাপ্রসাদ আদর করিয়া স্ত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। বলিল—"ঘুমুচ্ছিলে ত উত্তর দিলে কে?"

দয়া তখন আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইল। বলিল—"আগে ঘুমুচ্ছিলাম, এখন জেগে উঠলাম।"

উমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কখন? ঠিক কোন্ সময়?" —উমা ভারি দুষ্ট।

"কোন্ সময় আবার?—সেই তখন!"

"কখন?"

"যাও আমি জানিনে।" বলিয়া দয়া স্বামীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিল।

ঠিক কখন জাগিয়াছে, দয়াও কিছুতে বলিবে না, তাহার স্বামীও কিছুতে ছাড়িবে না। কিয়ৎক্ষণ মান অভিমানের পর দয়ার পরাজয় হইল। উত্তর দিল "সেই যখন তুমি"—বলিয়া থামিল।

"আমি কি করলাম?"

দয়া খুব তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল—"সেই যখন তুমি আমায় চুমু খেলে;—হল! মাগো মা! এত জান!"

তখনও এক প্রহরের অধিক রাত্রি আছে। দুজনে কত কথা আরম্ভ হইল। অধিকাংশ কথারই না আছে মাথা না আছে মুণ্ড। হায়, শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রপিতামহগণের তরুণবয়স্ক পিতা মাতাগণ, অসার অপদার্থ আমাদেরই মত "এমনি চঞ্চল মতি গতি" ছিলেন। অত বড় শাক্ত পরিবারের সন্তান হইয়াও উমাপ্রসাদ সে পর্য্যন্ত একদিনও স্ত্রীর নিকট মুদ্রাপ্রকরণ বা মাতৃকান্যাসের কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই এবং যমনিয়মাদি সম্বন্ধে তাহাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখিয়াছিল।

নানা কথার পর উমাপ্রসাদ বলিল—"দেখ, আমি পশ্চিমে চাকরি করতে বেরুব।"

দয়া বলিল—"তোমার আবার চাকরি কেন? তোমার কিসের দুঃখু? জমিদারের ছেলে হয়ে কেউ চাকরি করে না কি?"

"আমার এখানে দুঃখু আছে বৈ কি।"

"কি?"

"তুমি যদি আমার দুঃখু বুঝবে তা হলে আর আমার দুঃখু কিসের!"

শুনিয়া দয়া ভারি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিল, কি দুঃখ? —ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একটু দুষ্টামি বুদ্ধি আসিল। বলিল—"তোমার কি দুঃখু? আমি বুঝি মনের মত হইনি?" দয়া জানিত এ কথা বলিলে উমাপ্রসাদকে আঘাত করা হইবে।

উমাপ্রসাদ প্রিয়ামুখে অজস্র চুম্বনবর্ষণ করিয়া এই আঘাতের প্রতিশোধ লইল। পরে বলিল—"আমার দুঃখু তোমাকে নিয়েই বটে। সমস্ত দিন আমি তোমায় পাইনে। শুধু রাত্তিরটি পেয়ে সাধ মেটে না। বিদেশে চাকরি করতে যাব, সেখানে তোমায় নিয়ে যাব, কেমন দুজনে একলা থাকব সারাদিন সারারাত।"

"চাকরি করবে ত সারাদিন আমাকে নিয়ে থাকবে কেমন করে? আমাকে ত একলা ফেলে তুমি কাছারি চলে যাবে।"

"কাছারি গিয়ে খুব শিগগির শিগগির ফিরে আসব!"

দয়া ভাবিয়া দেখিল, তা হইতে পারে বটে। কিন্তু বাধা বিপত্তি যে অনেক।

"তুমি ত নিয়ে যাবে, সবাই যেতে দেবে কেন?"

"এখান থেকে কি নিয়ে যাব? যখন শুনব তুমি বাপের বাড়ী রয়েছ, তখন চুপি চুপি এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

শুনিয়া দয়া হাসিল। এও কি সম্ভব না কি?

"কতদিন আমরা থাকব সেখানে?"

"অনেক বচ্ছর থাকব।"

দয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল, সহসা একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল। বলিল—"খোকাকে ফেলে কি অনেক বচ্ছর আমি বিদেশে থাকতে পারব?"

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গালে গাল রাখিয়া কাণের কাছে বলিল—"ততদিন তোমারও একটি খোকা হবে।" কথাটি শুনিয়া দয়ার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্ধকারে তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

উল্লিখিত খোকাটি উমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর তারাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান। স্বয়ং উমাপ্রসাদ এ বাটীর শেষ খোকা। এই পরিবারে খোকা-রাজার সিংহাসন বহুকাল শূন্য ছিল, তাই খোকার বড় আদর; খোকা বাড়ীসুদ্ধ সকলের চক্ষের মণি। খোকার মা হরসুন্দরী,—তাঁর ত আর গরবে মাটিতে পা পড়ে না।

দয়া সহসা বলিল—"আজ এখনো খোকা এল না কেন?"

ভোর রাত্রে রোজ খোকা কাকীমার কাছে আসে। এটি তার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। যদিও বাটীতে দাসদাসীর অভাব নাই, তথাপি গৃহকার্য্যের অধিকাংশ দয়া স্বহস্তে করিত। বিশেষতঃ তাহার শ্বশুরের পূজাহ্নিক সম্পর্কীয় যাহা কিছু কার্য্য তাহাতে দয়া ছাড়া অপর কাহারও হস্তস্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না। সারাদিন এই সমস্ত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও খোকাকে সে একমুহূর্ত্তও চক্ষের আড়াল করিত না। কাকীমা গা মুছাইয়া না দিলে খোকা গা মুছে না, কাকীমা কাজল না পরাইয়া দিলে খোকা কাজল পরে না, কাকীমার কোলে ভিন্ন অন্য কোথাও শুইয়া খোকা দুধ খায় না। খোকার বিছানায় তার কাকীমা অনেক রাত্রি অবধি থাকিয়া ঘুম পাড়াইয়া আসে,—ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলেই খোকা 'কাকীমা' বলিয়া কান্না জুড়িয়া দেয়। এই প্রগল্‌ভতা, এই অন্যায় আবদারের জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে হরসুন্দরীর নিকট হইতে চড়টা চাপড়টা পুরস্কার পাইতে হয়। কিন্তু বলাই বাহুল্য, তাহাতে কান্না না থামিয়া আরও দশগুণ বাড়িয়া উঠে। তখন হরসুন্দরী তাহাকে কোলে করিয়া, ক্রোধে ও নিদ্রাঘোরে টলিতে টলিতে দয়ার শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া ডাকেন—"ছোট বউ, ও ছোট বউ, এই নে তোর খোকাকে।"—বলিয়া, দয়ার দুয়ার খুলিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই, খোকাকে মাটিতে বসাইয়া প্রস্থান করেন। দয়া প্রায়ই জাগিয়া থাকে, না থাকিলেও খোকার ক্রন্দনে শীঘ্রই জাগিয়া উঠে, ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে বুকে করিয়া লইয়া যায়, "কে মেরেছে কে মেরেছে" বলিয়া কত সোহাগ করে। মাথার শিয়রে পাণের ডিবায় কোনও দিন কদমা, কোনও দিন বাতাসা, কোনও দিন

নারিকেলের নাড়ু সঞ্চিত থাকে, তাই খোকা ভক্ষণ করে, তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া কাকীমার কোলে শুইয়া ঘুমাইয়া যায়। আজ এখনও খোকা আসিল না বলিয়া দয়া কিছু উৎকণ্ঠিত হইল। বলিল—"বাছার অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বোধ হয় এখনও রাত্রি আছে। দেখি দাঁড়াও।"

উমাপ্রসাদ বিছানা হইতে উঠিয়া জানালা খুলিল। বাহিরে আম ও নারিকেল বৃক্ষ বহুল বাগান। তখনও চন্দ্রাস্ত হয় নাই,—কিন্তু অধিক বিলম্বও নাই। দয়া নিঃশব্দে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। বলিল—"রাত আর বেশী কই?"

শীতের হিমবায়ু হু হু করিয়া জানালা পথে প্রবেশ করিতে লাগিল। তবু দুই জনে সেই অল্পালোকে পরস্পরের পানে চাহিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহাদের চক্ষু যে উপবাসী ছিল!

দয়া বলিল—"দেখ, আজ আমার মনটা কেমন হয়ে গেছে। খোকা এখনও এল না। কি জানি, কেন মনটা এমন হয়ে গেল!"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখনও খোকার আসবার সময় হয় নি। যে দিন ঘুমিয়ে পড়ে সে দিন ত আসতে দেরীও হয়। তোমার মন সে জন্যে খারাপ হয় নি। কেন হয়েছে আমি জানি।"

"কেন বল দেখি?"

"বলেছি কি না আমি পশ্চিমে যাব চাকরি করতে, তাই তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে।"—বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে নিজের আরও কাছে টানিয়া লইল।

দয়া একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমি বুঝতে পারছিনে। মনে হচ্ছে যেন আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।"

বাহিরে জ্যোৎস্না নিরতিশয় ম্লান। পত্নীর কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদের মুখখানিও ম্লান হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁদ ডুবিয়া গেল। গাছ-পালা অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। জানালা বন্ধ করিয়া উভয়ে শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

ক্রমে একটা আধটা পাখীর ডাক শোনা গেল। পরস্পরের বক্ষো-নিবদ্ধ হইয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে জানালার রন্ধ্রপথে প্রভাতের আলোকরশ্মি প্রবেশ করিতে লাগিল। তখনও দুই জনে নিদ্রাভিভূত।

সহসা বাহির হইতে উমাপ্রসাদের পিতা ডাকিলেন—"উমা।"

প্রথমে ঘুম ভাঙ্গিল দয়ার। সে গা ঠেলিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল।

কালীকিঙ্কর আবার ডাকিলেন—"উমা।" স্বরটা কম্পিত, যেন অন্য রূপ, ইহা যে তাঁহারি কণ্ঠস্বর তাহা যেন কষ্টে বুঝা গেল।

এত ভোরে পিতা ত কখনও ডাকেন না। আর তাঁহার স্বরই বা এমন হইল কেন?—তবে সত্য সত্যই খোকার কিছু অসুখ বিসুখ করিয়াছে বুঝি! উমাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

দেখিল, পিতার পরিধানে রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র, স্কন্ধে নামাবলী উত্তরীয়, গলে রুদ্রাক্ষমাল্য লম্বমান। এ কি! এত ভোরে তাঁহার পূজার বেশ কেন? অন্য দিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া তবে তিনি পূজার বেশ পরিধান করেন। মুহূর্ত্তকালের মধ্যে এই চিন্তাপরম্পরা উমাপ্রসাদের মস্তকে উদিত হইল।

দ্বার খুলিবামাত্র কালীকিঙ্কর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, ছোটবউমা কোথায়?"

স্বর পূর্ব্ববৎ কম্পিত। উমাপ্রসাদ কক্ষের চারিদিকে চাহিল। দয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া, কিছু দূরে জড়সড় হইয়া দাড়াইয়া ছিল।

কালীকিঙ্করও সেই দিকে নেত্রপাত করিলেন। বধূকে দেখিতে পাইবামাত্র, নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

উমাপ্রসাদ বিস্ময়ে বাক্যহীন। দয়াময়ী শ্বশুরের এই অদ্ভুতাচরণ দেখিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রণামান্তে কালীকিঙ্কর বলিলেন—"মা, আমার জন্ম সার্থক হল। কিন্তু এত দিন কেন বলিসনি মা?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বাবা—বাবা!"

কালীকিঙ্কর বলিলেন—"বাবা, ইঁহাকে প্রণাম কর।"

উমাপ্রসাদ বলিল, "বাবা—আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন ?"

"উন্মাদ হইনি বাবা, এতদিন উন্মাদ ছিলাম বটে। আজ আরোগ্য-লাভ করেছি, সেও মার কৃপায়।"

উমাপ্রসাদ পিতার কথার কিছুই অর্থগ্রহণ করিতে পারিল না। বলিল—"বাবা, আপনি কি বলছেন ?"

কালীকিঙ্কর বলিলেন—"বাবা, আমার বড় সৌভাগ্য। যে কুলে জন্মেছি তা পবিত্র হল। বাল্যকালে কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি, এত দিন যে সাধনা, যে আরাধনা করলাম তা নিষ্ফল হয় নি। মা জগন্ময়ী কৃপা করে ছোটবউমার মূর্তিতে আমার গৃহে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েছেন। গত রজনীতে স্বপ্নযোগে আমি এই প্রত্যাদেশ পেয়েছি। আমার জীবন ধন্য হল।"

দয়াময়ী ছিল মানবী—সহসা দেবীত্বে অভিষিক্ত হইল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে। এই দিনত্রয়ে এ সংবাদ বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আশে-পাশের বহু গ্রাম হইতে বহু জন আসিয়া প্রসিদ্ধ শাক্ত-জমিদার কালীকিঙ্কর রায়ের বাটীতে দয়াময়ী-রূপিণী আগ্যাশক্তিকে দর্শন করিয়া গিয়াছে।

দয়াময়ীর রীতিমত পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ধূপ-দীপ জ্বালিয়া, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া, ষোড়শোপচারে তাহার পূজা হয়। এ কয় দিনে দয়াময়ীর সম্মুখে বহুসংখ্যক ছাগবলি হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এ তিন দিন দেবতার পূজা পাইয়াও দয়াময়ী কেবল কাঁদিতেছে। আহার নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছে বলিলেই হয়। এই আকস্মিক অদ্ভুত ঘটনায় তাহাকে এমন অভিভূত, বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে সে দুই দিন আগে এ বাটীর বধূ ছিল, শ্বশুর ও ভাসুরের সাক্ষাতে বাহির হইত না, এ সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছে। এখন আর তাহার মুখে অবগুণ্ঠন নাই,—যাহার তাহার পানে শূন্য দৃষ্টিতে পাগলিনীর মত চাহিয়া থাকে। তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদুভাবাপন্ন হইয়াছে, রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি ফুলিয়াছে, বেশবাস সুসম্বৃত নহে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। পূজার ঘরে একটি কোণে ঘৃতদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। পুরু কম্বলের বিছানায় রেশমী বস্ত্রের আবরণ, তাহার উপর দয়াময়ী শয়ন করিয়া আছে। গায়ে একখানি মোটা শাল। দুয়ার বন্ধ ছিল মাত্র, অর্গলিত ছিল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে সে দুয়ার খুলিতে লাগিল। চোরের মত সন্তর্পণে উমাপ্রসাদ প্রবেশ করিল। দুয়ার বন্ধ করিয়া খিল দিল।

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর বিছানায় আসিয়া বসিল। সে দিন উষা কালের ঘটনার পর এই স্ত্রীর সহিত তাহার প্রথম নিভৃত সাক্ষাৎ।

দয়াময়ী জাগিয়া ছিল, স্বামীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া, একি হল ?"

আঃ—আজ তিন দিনের পর দয়া স্বামীর মুখে একটি স্নেহমাখা কথা শুনিল। এ তিন দিন কাল ভক্তগণের মা মা শব্দে তাহার হৃদয়-দেশ মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর মুখনিঃসৃত এই আদরের বাণী তাহার প্রাণে যেন অকস্মাৎ সুধাবৃষ্টি করিয়া দিল। দয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গায়ের শাল মোচন করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। উচ্ছ্বসিত স্বরে বারংবার বলিতে লাগিল—"দয়া—দয়া একি হল—একি হল ?"

দয়া নির্ব্বাক।

উমাপ্রসাদও কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। তার পরে বলিল—"দয়া, তোমার কি মনে হয় যে এ কথা সত্যি ? তুমি আমার দয়া নও, তুমি দেবী ?"

এই বার দয়া কথা কহিল—বলিল—"না, আমি তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু নই, আমি তোমার দয়া ছাড়া আর কিছু নই,—আমি দেবী নই—আমি কালী নই।"

এই কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ সাগ্রহে স্ত্রীর মুখচুম্বন করিল। বলিল—"দয়া, তবে চল, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। এমন কোনও দূরদেশে গিয়ে থাকব, যেখানে কেউ আর আমাদের সন্ধান পাবে না।"

দয়া বলিল—"তাই চল। কিন্তু কি উপায়ে যাবে?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"সে সমস্ত আমি ঠিক কর্‌ব, কিছু সময় যাবে।"

দয়া বলিল—"কবে? কবে? শীগ্‌গির কর—নইলে বেশী দিন আমি বাঁচব না। আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। যদি মৃত্যুও না হয়, তবে আমি পাগল হয়ে যাব।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"না দয়া—তুমি কিছু ভেবো না। দিন সাত তুমি ধৈর্য্য ধরে থাক। আজ শনিবার। আগামী শনিবার রাত্রে তোমার কাছে আসব আবার—তোমাকে নিয়ে গৃহত্যাগ করব। এই সাত দিন তুমি আশায় বুক বেঁধে কাটিয়ে দাও, লক্ষ্মী আমার, সোণা আমার।"

দয়া বলিল—"আচ্ছা।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখন তবে যাই, কেউ আবার এসে টেসে না পড়ে।"—বলিয়া সে পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইল।

পরদিন প্রভাতে, দয়াময়ীর পূজা যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন গ্রামের এক জন অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোটরান্তর্গত চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। আসিয়াই, দয়াময়ীকে দেখিয়া গলবস্ত্র হইয়া তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্ত করে বলিতে লাগিলেন—"মা, আমি চিরকাল তোমার পূজো করে এসেছি। আজ আমার বড় বিপদ মা। আজ ভক্তকে রক্ষা কর।"

দয়াময়ী বৃদ্ধের মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। পুরোহিত বলিলেন—"কেন দাদা, তোমার কি বিপদ হয়েছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"আমার নাতিটি কয় দিন জ্বর বিকারে ভুগছিল। আজ সকালে কবরেজ জবাব দিয়ে গেছে। সে না বাঁচলে আমার বংশলোপ হবে, আমার ভিটেয় সন্ধ্যে দেবার আর কেউ থাকবে না। তাই মার কাছে তার প্রাণ ভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

কালীকিঙ্কর চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। তিনি বৃদ্ধের দুঃখে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া দয়াময়ীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা গো,

বুড়োর নাতিটিকে বাঁচিয়ে দিতে হবে মা।"—বলিয়া তিনি বৃদ্ধকে বলিলেন—"দাদা, তোমার নাতিকে এনে মার পায়ের কাছে ফেলে রাখ, যমের বাবার সাধ্য হবে না এখান থেকে নিয়ে যেতে।"

এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মহা আশ্বস্ত হইলেন। যষ্টিতে ভর দিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

এক দণ্ড কাল পরে বিধবা পুত্রবধূর কোলে নাতিটির সহিত বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিলেন। দয়াময়ীর পদতলে বিছানা করিয়া মৃতকল্প শিশুটিকে রাখা হইল। কেবল মাঝে মাঝে চরণামৃতের পাত্র হইতে কুষি করিয়া একটু একটু চরণামৃত লইয়া পুরোহিত তাহার মুখে দিতে লাগিলেন।

শিশুর মাতা বিধবা যুবতী দয়াময়ীর সখী। তাহার ব্যথাকাতর মুখ দেখিয়া দয়াময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইল। শিশুটির পানে চাহিয়া দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু ভরিল। একান্ত মনে দেবতাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, আমি দেবতা হই, কালী হই, মানুষ হই, যেই হই—এই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর।"

দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সকলে বলিয়া উঠিল—"জয় মা কালী, জয় মা দয়াময়ী, মায়ের দয়া হয়েছে—মায়ের চোখে জল।"

কালীকিঙ্কর দ্বিগুণ ভক্তির সহিত চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন।

বেলা যত বাড়িতে লাগিল, শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর ততই ভাল হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে মত প্রকাশ করিলেন আর শিশুর জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই, স্বচ্ছন্দে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দয়াময়ীর দেবীত্ব আবিষ্কারের সংবাদ যত না শীঘ্র চৌদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার কৃপায় মুমূর্ষু শিশুর প্রাণরক্ষার সংবাদ অধিক সত্বর প্রচারিত হইয়া পড়িল। পর দিন প্রাতেই অপর এক জন আসিয়া দয়াময়ীর চরণে নিবেদন জানাইল যে, তাহার কন্যাটি আজ তিন দিন হইতে প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির,—মেয়ে বুঝি বাঁচে না। কালীকিঙ্কর বলিলেন—"তার জন্যে আর চিন্তা কি? মার চরণামৃত নিয়ে গিয়ে মেয়েকে পান করিয়ে দাওগে। এখনি আরাম হবে।"

দয়া বলিল—"তাই চল। কিন্তু কি উপায়ে যাবে?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"সে সমস্ত আমি ঠিক করব, কিছু সময় যাবে।"

দয়া বলিল—"কবে? কবে? শীগ্‌গির কর—নইলে বেশী দিন আমি বাঁচব না। আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। যদি মৃত্যুও না হয়, তবে আমি পাগল হয়ে যাব।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"না দয়া—তুমি কিছু ভেবো না। দিন সাত তুমি ধৈর্য্য ধরে থাক। আজ শনিবার। আগামী শনিবার রাত্রে তোমার কাছে আসব আবার—তোমাকে নিয়ে গৃহত্যাগ করব। এই সাত দিন তুমি আশায় বুক বেঁধে কাটিয়ে দাও, লক্ষ্মী আমার, সোণা আমার।"

দয়া বলিল—"আচ্ছা।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখন তবে যাই. কেউ আবার এসে টেসে না পড়ে।"—বলিয়া সে পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইল।

পরদিন প্রভাতে, দয়াময়ীর পূজা যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন গ্রামের এক জন অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোটরান্তর্গত চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। আসিয়াই, দয়াময়ীকে দেখিয়া গলবস্ত্র হইয়া তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্ত করে বলিতে লাগিলেন—"মা, আমি চিরকাল তোমার পূজো করে এসেছি। আজ আমার বড় বিপদ মা। আজ ভক্তকে রক্ষা কর।"

দয়াময়ী বৃদ্ধের মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। পুরোহিত বলিলেন—"কেন দাদা, তোমার কি বিপদ হয়েছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"আমার নাতিটি কয় দিন জ্বর বিকারে ভুগছিল। আজ সকালে কবরেজ জবাব দিয়ে গেছে। সে না বাঁচলে আমার বংশলোপ হবে, আমার ভিটেয় সন্ধ্যে দেবার আর কেউ থাকবে না। তাই মার কাছে তার প্রাণ ভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

কালীকিঙ্কর চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। তিনি বৃদ্ধের দুঃখে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া দয়াময়ীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা গো,

বুড়োর নাতিটিকে বাঁচিয়ে দিতে হবে মা।"—বলিয়া তিনি বৃদ্ধকে বলিলেন—"দাদা, তোমার নাতিকে এনে মার পায়ের কাছে ফেলে রাখ, যমের বাবার সাধ্য হবে না এখান থেকে নিয়ে যেতে।"

এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মহা আশ্বস্ত হইলেন। যষ্টিতে ভর দিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

এক দণ্ড কাল পরে বিধবা পুত্রবধূর কোলে নাতিটির সহিত বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিলেন। দয়াময়ীর পদতলে বিছানা করিয়া মৃতকল্প শিশুটিকে রাখা হইল। কেবল মাঝে মাঝে চরণামৃতের পাত্র হইতে কুষি করিয়া একটু একটু চরণামৃত লইয়া পুরোহিত তাহার মুখে দিতে লাগিলেন।

শিশুর মাতা বিধবা যুবতী দয়াময়ীর সখী। তাহার ব্যথাকাতর মুখ দেখিয়া দয়াময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইল। শিশুটির পানে চাহিয়া দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু ভরিল। একান্ত মনে দেবতাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, আমি দেবতা হই, কালী হই, মানুষ হই, যেই হই—এই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর।"

দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সকলে বলিয়া উঠিল—"জয় মা কালী, জয় মা দয়াময়ী, মায়ের দয়া হয়েছে—মায়ের চোখে জল।"

কালীকিঙ্কর দ্বিগুণ ভক্তির সহিত চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন।

বেলা যত বাড়িতে লাগিল, শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর ততই ভাল হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে মত প্রকাশ করিলেন আর শিশুর জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই, স্বচ্ছন্দে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দয়াময়ীর দেবীত্ব আবিষ্কারের সংবাদ যত না শীঘ্র চৌদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার কৃপায় মুমূর্ষু শিশুর প্রাণরক্ষার সংবাদ অধিক সত্বর প্রচারিত হইয়া পড়িল। পর দিন প্রাতেই অপর এক জন আসিয়া দয়াময়ীর চরণে নিবেদন জানাইল যে, তাহার কন্যাটি আজ তিন দিন হইতে প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির,—মেয়ে বুঝি বাঁচে না। কালীকিঙ্কর বলিলেন—"তার জন্যে আর চিন্তা কি? মার চরণামৃত নিয়ে গিয়ে মেয়েকে পান করিয়ে দাওগে। এখনি আরাম হবে।"

সে ব্যক্তি গলদশ্রুলোচনে দয়াময়ীর চরণামৃতের পাত্রটি মাথায় বহন করিয়া লইয়া গেল। বেলা এক প্রহর অতীত হইবার পূর্ব্বেই সংবাদ আসিল মেয়েটি চরণামৃত পান করিবার অব্যবহিত পরেই নিরাপদে রাজপুত্রের মত সুন্দর সুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

আজ শনিবার। আজ উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে লইয়া গোপনে পলায়ন করিবে। সে সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। মুরশিদাবাদ কিম্বা রাজমহল কিম্বা বর্দ্ধমান এরূপ কোনও নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থানে সে যাইবে না;—যাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। নৌকাপথে পশ্চিম যাইবে। অনেক দূর যাইবে;—কোথায়, এখনও তাহার কিছু স্থিরতা নাই। হয় ভাগলপুর, নয় মুঙ্গের। সেখানে চাকরির চেষ্টা করিবে। পথ-খরচের মত অর্থ তাহার নিকট আছে। তাহার স্ত্রীর গায়ে যাহা অলঙ্কার আছে, তাহা বিক্রয় করিলে কোন্ না দুই বৎসর উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারিবে! দুই বৎসরেও কি তাহার একটা চাকরি জুটিবে না? নিশ্চয় জুটিবে। চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে না কি?

এইরূপ নানা চিন্তায় উমাপ্রসাদ দিবাভাগ অতিবাহিত করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আজ সে দয়াময়ীর আরতি দেখিবে। এক দিনও ত দেখে নাই। যখন শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনিতে চণ্ডীমণ্ডপ ফাটিয়া যায়, পূজা আরম্ভ হয়, তখন উমাপ্রসাদ বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামের বাহিরে পলায়ন করে। আজ দয়াময়ীর শেষ আরতি, আজ সে দেখিবে। দেখিবে আর মনে মনে হাসিবে। কল্য প্রভাতে পুরোহিত ঠাকুর যখন সর্ব্বাগ্রে আসিয়া দেখিবেন যে দেবী অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহাই উমাপ্রসাদ কল্পনা করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত। গৃহস্থ সকলে নিদ্রাগত। চোরের মত উমাপ্রসাদ শয্যাত্যাগ করিল। অন্ধকারে ধীরপদে পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ধীরে ধীরে দ্বার মোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কোণে সেইরূপ ঘৃতদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। দয়াময়ীর শয্যায় উমাপ্রসাদ গিয়া বসিল। দয়াময়ী নিদ্রামগ্ন।

প্রথমে উমাপ্রসাদ সস্নেহে দয়াময়ীর মুখচুম্বন করিল। পরে গা ঠেলিয়া তাহাকে জাগাইল। নিদ্রাভঙ্গে দয়াময়ী ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া—এত ঘুম? ওঠ, চল।"

দয়া বিস্মিতের মত বলিল—"কোথায়?"

"কোথায়?—যাবার সময় তুমি জিজ্ঞাসা করছ, কোথায়—চল, আজ রাত্রে নৌকো করে আমরা পশ্চিমে চলে যাই।"

দয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"ওঠ—ওঠ; পথে গিয়ে ভেবো এখন। সব ঠিকঠাক করে রেখেছি। চল চল।"

এই কথা বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীর হস্তধারণ করিল।

দয়া সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—"তুমি আর স্ত্রীভাবে আমাকে স্পর্শ কোরো না। আমি যে দেবী নই, আমি যে তোমার স্ত্রী, তা আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারিনে।"

কথাটা শুনিয়া উমাপ্রসাদ হাসিয়া উঠিল। স্ত্রীর গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে যাইতেছিল। কিন্তু দয়াময়ী সহসা তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া দূরে বসিল। বলিল—"না না, হয়ত তোমার অকল্যাণ হবে।"

এ কথায় উমাপ্রসাদ যেন বজ্রাহত হইল। বলিল—"দয়া, তুমিও পাগল হলে?"

দয়া বলিল—"তবে এত লোকের রোগ আরাম হল কেন? তা হলে কি দেশসুদ্ধ লোক পাগল?"

উমাপ্রসাদ অনেক করিয়া বুঝাইল। অনেক অনুনয় করিল। অনেক কাঁদিল।

দয়াময়ীর মুখে কেবল সেই কথা—"না না, তোমার অকল্যাণ হবে। হয়ত আমি তোমার স্ত্রী নই, হয়ত আমি দেবী।"

শেষকালে উমাপ্রসাদ বলিল—"তুমি দেবী হলে এমন পাষাণী হতে না। এততেও তোমার মন অচল অটল রইল?"

দয়াময়ী এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো, তুমি আমাকে বুঝতে পারলে না।"

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর শয্যা ত্যাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ক্ষিপ্তের মত সেই কক্ষে অস্থিরভাবে পদচারণা করিয়া বেড়াইল। পরে হঠাৎ দয়াময়ীর কাছে আসিয়া বলিল—"দয়া, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছিল?"

দয়া বলিল—"তা হয়েছিল বৈ কি!"

"তুমি যদি দেবী, তুমি যদি কালী, আমি ত তা হলে মহাদেব, নইলে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হল কি করে?"

এ কথার দয়া কি উত্তর দিবে? সে চুপ করিয়া রহিল।

উমাপ্রসাদ আবার আরম্ভ করিল—"তুমি যদি আদ্যাশক্তি ভগবতী হও—তবে নরলোকে কার সাধ্য যে তোমাকে বিবাহ করে? আমি যে তোমাকে বিবাহ করেছি, এত দিন যে আমি তোমার স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছি, এতেই ত বোঝা যাচ্ছে যে আমিও মানুষ নই—আমিও দেবতা, আমি স্বয়ং মহেশ্বর!"

দয়াময়ী বলিল—"যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার স্ত্রী। দেবী হই, মানুষ হই, আমি তোমার স্ত্রী।"

এ কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। স্ত্রীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বলিল—"চল, তবে আমরা যাই। এখানে যত দিন থাকব, তত দিন তোমায় আমায় বিচ্ছেদ থাকবে।"

দয়াময়ী বলিল—"তবে চল।"

খানিকটা হাঁটিয়া গঙ্গার ধারে পৌঁছিয়া নৌকা চড়িতে হইবে। কিন্তু কিছু দূর চলিয়া দয়া সহসা থামিয়া আবার বলিল, "আমি যাব না।" এবার স্বর অত্যন্ত দৃঢ়।

উমাপ্রসাদ আবার অনুনয়ের সাধ্যসাধনার পালা আরম্ভ করিল। কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না।

দয়া বলিল—"আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পূজা গ্রহণ করি, পালাব কেন? এত জনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন? আমি পালাব না, চল ফিরে যাই।"

উমাপ্রসাদ মর্ম্মাহত হইয়া বলিল—"তুমি একা ফিরে যাও, আমি যাব না।"

তাহাই হইল। দয়া একা দেবীত্বে ফিরিয়া গেল। উমাপ্রসাদ সেই নিশীথ-অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। পরদিন তাহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

দয়াময়ীর দেবীত্বে সকলেই বিশ্বাসবান, কেবল বিশ্বাস করে নাই তাহাদের বড়বধূ হরসুন্দরী—খোকার মা। প্রথম দুই চারি দিন তাই বড়বধূই দয়াময়ীর জুড়াবার ঠাঁই হইয়াছিলেন। প্রথমে যখন স্বয়ং দয়াময়ীই বিশ্বাস করিতে চাহে নাই যে, সে দেবী, তখন সে একদিন বড়বধূর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল—"দিদি, আমার এ কি হল?" তিনি বলিয়াছিলেন—"কি করবো বোন, ঠাকুর পাগল হয়ে গিয়েছেন। বুড়ো বয়সে ওনার ভীমরতি ধরেছে।"

উমাপ্রসাদের নিরুদ্দেশের পর দুই সপ্তাহ গেল। তৃতীয় সপ্তাহে খোকার জ্বর হইল। দিন দিন ছেলে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বৈদ্য আসিল, কিন্তু কালীকিঙ্কর তাহাকে চিকিৎসা করিতে দিলেন না। বলিলেন—"আমার বাড়ীতে স্বয়ং মার অধিষ্ঠান, কত কত দুঃসাধ্য রোগ মার চরণামৃত পান করে ভাল হয়ে গেল, আর আমার বাড়ীতে রোগ হলে বৈদ্য এসে চিকিৎসা করবে?"

বড়বধূ নিজ স্বামী তারাপ্রসাদের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—"ওগো, ছেলেকে বদ্দি দেখাও গো, নইলে আমার ছেলে বাঁচবে না। ও রাক্কুসি ডাইনি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না। ওর কি সাধ্যি!"

তারাপ্রসাদ অত্যন্ত পিতৃভক্ত। পিতার বিশ্বাস, পিতার বিধান, এ সমস্ত তিনি বেদের মত মান্য করেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—"খবরদার, ও কথা বোলো না, ছেলের অকল্যাণ হবে। মা যা করবেন তাই হবে।"

কিন্তু বড়বধূর প্রতিদিনকার কাকুতি মিনতি ও ক্রন্দনে কর্ত্তা এক দিন গলবস্ত্র হইয়া দয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, খোকার যে ব্যারাম হয়েছে, তাতে বৈদ্য দেখাবার কোনও প্রয়োজন আছে কি?"

দয়াময়ী বলিল—"না, আমিই ওকে ভাল করে দেব।"

সে ব্যক্তি গলদশ্রুলোচনে দয়াময়ীর চরণামৃতের পাত্রটি মাথায় বহন করিয়া লইয়া গেল। বেলা এক প্রহর অতীত হইবার পূর্ব্বেই সংবাদ আসিল মেয়েটি চরণামৃত পান করিবার অব্যবহিত পরেই নিরাপদে রাজপুত্রের মত সুন্দর সুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

আজ শনিবার। আজ উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে লইয়া গোপনে পলায়ন করিবে। সে সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। মুরশিদাবাদ কিম্বা রাজমহল কিম্বা বর্দ্ধমান এরূপ কোনও নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থানে সে যাইবে না;—যাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। নৌকাপথে পশ্চিম যাইবে। অনেক দূর যাইবে;—কোথায়, এখনও তাহার কিছু স্থিরতা নাই। হয় ভাগলপুর, নয় মুঙ্গের। সেখানে চাকরির চেষ্টা করিবে। পথ-খরচের মত অর্থ তাহার নিকট আছে। তাহার স্ত্রীর গায়ে যাহা অলঙ্কার আছে, তাহা বিক্রয় করিলে কোন্ না দুই বৎসর উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারিবে! দুই বৎসরেও কি তাহার একটা চাকরি জুটিবে না? নিশ্চয় জুটিবে। চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে না কি?

এইরূপ নানা চিন্তায় উমাপ্রসাদ দিবাভাগ অতিবাহিত করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আজ সে দয়াময়ীর আরতি দেখিবে। এক দিনও ত দেখে নাই। যখন শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনিতে চণ্ডীমণ্ডপ ফাটিয়া যায়, পূজা আরম্ভ হয়, তখন উমাপ্রসাদ বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামের বাহিরে পলায়ন করে। আজ দয়াময়ীর শেষ আরতি, আজ সে দেখিবে। দেখিবে আর মনে মনে হাসিবে। কল্য প্রভাতে পুরোহিত ঠাকুর যখন সর্ব্বাগ্রে আসিয়া দেখিবেন যে দেবী অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহাই উমাপ্রসাদ কল্পনা করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত। গৃহস্থ সকলে নিদ্রাগত। চোরের মত উমাপ্রসাদ শয্যাত্যাগ করিল। অন্ধকারে ধীরপদে পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ধীরে ধীরে দ্বার মোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কোণে সেইরূপ ঘৃতদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। দয়াময়ীর শয্যায় উমাপ্রসাদ গিয়া বসিল। দয়াময়ী নিদ্রামগ্ন।

প্রথমে উমাপ্রসাদ সস্নেহে দয়াময়ীর মুখচুম্বন করিল। পরে গা ঠেলিয়া তাহাকে জাগাইল। নিদ্রাভঙ্গে দয়াময়ী ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া—এত ঘুম? ওঠ, চল।"

দয়া বিস্মিতের মত বলিল—"কোথায়?"

"কোথায়?—যাবার সময় তুমি জিজ্ঞাসা করছ, কোথায়—চল, আজ রাত্রে নৌকো করে আমরা পশ্চিমে চলে যাই।"

দয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"ওঠ—ওঠ; পথে গিয়ে ভেবো এখন। সব ঠিকঠাক করে রেখেছি। চল চল।"

এই কথা বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীর হস্তধারণ করিল।

দয়া সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—"তুমি আর স্ত্রীভাবে আমাকে স্পর্শ কোরো না। আমি যে দেবী নই, আমি যে তোমার স্ত্রী, তা আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারিনে।"

কথাটা শুনিয়া উমাপ্রসাদ হাসিয়া উঠিল। স্ত্রীর গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে যাইতেছিল। কিন্তু দয়াময়ী সহসা তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া দূরে বসিল। বলিল—"না না, হয়ত তোমার অকল্যাণ হবে।"

এ কথায় উমাপ্রসাদ যেন বজ্রাহত হইল। বলিল—"দয়া, তুমিও পাগল হলে?"

দয়া বলিল—"তবে এত লোকের রোগ আরাম হল কেন? তা হলে কি দেশসুদ্ধ লোক পাগল?"

উমাপ্রসাদ অনেক করিয়া বুঝাইল। অনেক অনুনয় করিল। অনেক কাঁদিল।

দয়াময়ীর মুখে কেবল সেই কথা—"না না, তোমার অকল্যাণ হবে। হয়ত আমি তোমার স্ত্রী নই, হয়ত আমি দেবী।"

শেষকালে উমাপ্রসাদ বলিল—"তুমি দেবী হলে এমন পাষাণী হতে না। এততেও তোমার মন অচল অটল রইল?"

দয়াময়ী এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো, তুমি আমাকে বুঝতে পারলে না।"

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর শয্যা ত্যাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ক্ষিপ্তের মত সেই কক্ষে অস্থিরভাবে পদচারণা করিয়া বেড়াইল। পরে হঠাৎ দয়াময়ীর কাছে আসিয়া বলিল—"দয়া, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছিল ?"

দয়া বলিল—"তা হয়েছিল বৈ কি !"

"তুমি যদি দেবী, তুমি যদি কালী, আমি ত তা হলে মহাদেব, নইলে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হল কি করে ?"

এ কথার দয়া কি উত্তর দিবে ? সে চুপ করিয়া রহিল।

উমাপ্রসাদ আবার আরম্ভ করিল—"তুমি যদি আদ্যাশক্তি ভগবতী হও—তবে নরলোকে কার সাধ্য যে তোমাকে বিবাহ করে ? আমি যে তোমাকে বিবাহ করেছি, এত দিন যে আমি তোমার স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছি, এতেই ত বোঝা যাচ্ছে যে আমিও মানুষ নই—আমিও দেবতা, আমি স্বয়ং মহেশ্বর !"

দয়াময়ী বলিল—"যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার স্ত্রী। দেবী হই, মানুষ হই, আমি তোমার স্ত্রী।"

এ কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। স্ত্রীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বলিল—"চল, তবে আমরা যাই। এখানে যত দিন থাকব, তত দিন তোমায় আমায় বিচ্ছেদ থাকবে।"

দয়াময়ী বলিল—"তবে চল।"

খানিকটা হাঁটিয়া গঙ্গার ধারে পৌঁছিয়া নৌকা চড়িতে হইবে। কিন্তু কিছু দূর চলিয়া দয়া সহসা থামিয়া আবার বলিল, "আমি যাব না।" এবার স্বর অত্যন্ত দৃঢ়।

উমাপ্রসাদ আবার অনুনয়ের সাধ্যসাধনার পালা আরম্ভ করিল। কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না।

দয়া বলিল—"আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পূজা গ্রহণ করি, পালাব কেন ? এত জনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন ? আমি পালাব না, চল ফিরে যাই।"

উমাপ্রসাদ মর্ম্মাহত হইয়া বলিল—"তুমি একা ফিরে যাও, আমি যাব না।"

তাহাই হইল। দয়া একা দেবীত্বে ফিরিয়া গেল। উমাপ্রসাদ সেই নিশীথ-অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। পরদিন তাহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

দয়াময়ীর দেবীত্বে সকলেই বিশ্বাসবান, কেবল বিশ্বাস করে নাই তাহাদের বড়বধূ হরসুন্দরী—খোকার মা। প্রথম দুই চারি দিন তাই বড়বধূই দয়াময়ীর জুড়াবার ঠাঁই হইয়াছিলেন। প্রথমে যখন স্বয়ং দয়াময়ীই বিশ্বাস করিতে চাহে নাই যে, সে দেবী, তখন সে একদিন বড়বধূর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল—"দিদি, আমার এ কি হল?" তিনি বলিয়াছিলেন—"কি করবো বোন, ঠাকুর পাগল হয়ে গিয়েছেন। বুড়ো বয়সে ওনার ভীমরতি ধরেছে।"

উমাপ্রসাদের নিরুদ্দেশের পর দুই সপ্তাহ গেল। তৃতীয় সপ্তাহে খোকার জ্বর হইল। দিন দিন ছেলে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বৈদ্য আসিল, কিন্তু কালীকিঙ্কর তাহাকে চিকিৎসা করিতে দিলেন না। বলিলেন—"আমার বাড়ীতে স্বয়ং মার অধিষ্ঠান, কত কত দুঃসাধ্য রোগ মার চরণামৃত পান করে ভাল হয়ে গেল, আর আমার বাড়ীতে রোগ হলে বৈদ্য এসে চিকিৎসা করবে?"

বড়বধূ নিজ স্বামী তারাপ্রসাদের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—"ওগো, ছেলেকে বদ্দি দেখাও গো, নইলে আমার ছেলে বাঁচবে না। ও রাক্কুসি ডাইনি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না। ওর কি সাধ্যি!"

তারাপ্রসাদ অত্যন্ত পিতৃভক্ত। পিতার বিশ্বাস, পিতার বিধান, এ সমস্ত তিনি বেদের মত মান্য করেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—"খবরদার, ও কথা বোলো না, ছেলের অকল্যাণ হবে। মা যা করবেন তাই হবে।"

কিন্তু বড়বধূর প্রতিদিনকার কাকুতি মিনতি ও ক্রন্দনে কর্ত্তা এক দিন গলবস্ত্র হইয়া দয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, খোকার যে ব্যারাম হয়েছে, তাতে বৈদ্য দেখাবার কোনও প্রয়োজন আছে কি?"

দয়াময়ী বলিল—"না, আমিই ওকে ভাল করে দেব।"

কালীকিঙ্কর নিশ্চিন্ত হইলেন। তারাপ্রসাদও নিশ্চিন্ত হইলেন।

খোকার মা এক দিন একটি বিশ্বস্ত ঝিকে কবিরাজের কাছে পাঠাইয়া দিলেন—যাহা কিছু রোগের বিবরণ সব বলিয়া দিলেন। ঔষধ চাই।

কবিরাজ মহাশয় এ প্রস্তাব শুনিয়া দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন—"মাঠাকৃরুণকে বলিস, যখন স্বয়ং শক্তি বলেছেন তিনিই খোকাকে আরোগ্য করে দেবেন, তখন আমি ওষুধের ব্যবস্থা করে অপরাধী হতে পারব না।"

যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই খোকার মা কাঁদিয়া বলেন—"ওগো, কিছু ওষুদ বলে দাও, আমার ছেলে বাঁচে না।"

সকলেই বলে—"ওমা, ও কথা বোলো না, তোমার ভাবনা কি? তোমার ঘরে স্বয়ং আদ্যাশক্তি বিরাজ করছেন।"

খোকার ব্যারাম ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। দয়া বলিল—"খোকাকে এনে আমার কোলে দাও।"

খোকাকে কোলে করিয়া দয়া সমস্ত দিন বসিয়া রহিল। খোকা অনেকটা ভাল রহিল। কিন্তু রাত্রে আবার খোকার ব্যারাম বৃদ্ধি হইল।

দয়াময়ী একান্ত মনে, একান্ত প্রাণে কত করিয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিল, খোকার গায়ে হাত বুলাইল।

কিন্তু কিছুতেই খোকা বাঁচিল না!

যখন খোকার মৃত্যুসংবাদ বাড়ীতে প্রচারিত হইল তখন তারাপ্রসাদ অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিল—দয়াময়ীকে বলিল—"রাক্ষসি, খোকাকে নিলি? কিছুতেই মায়াত্যাগ করতে পারলিনে?"

খোকার মা প্রথমে শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইল। যখন কতকটা সুস্থ হইল তখন দয়াময়ীকে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া গালি দিল। বলিল—"ও দেবী কোথায়? ও ডাইনি। দেবী কখনও ছেলে খায়?"

কালীকিঙ্কর ছল ছল নেত্রে দয়ার পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা, খোকাকে ফিরিয়ে দে। এখনও দেহ নষ্ট হয় নি। ফিরিয়ে দে মা, ফিরিয়ে দে।"

দয়াময়ী ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে যমরাজাকে

উদ্দেশ করিয়া আজ্ঞা করিল, 'এখনি খোকার আত্মা খোকার শরীরে ফিরাইয়া দেওয়া হউক।'

তাহাতে যখন হইল না, তখন মিনতি করিল।

আদ্যাশক্তির মিনতিতেও যমরাজা খোকার প্রাণ ফিরাইয়া দিলেন না।

তখন নিজের দেবীত্বে দয়ার অবিশ্বাস জন্মিল।

আজ তাহার পূজা ইত্যাদি প্রায় বন্ধ বলিলেই হয়। সমস্ত দিন কেহ তাহার কাছে আসিল না। দয়া একাকিনী বসিয়া সারাদিন চিন্তা করিল।

সন্ধ্যা হইল। আরতির সময় উপস্থিত। যেমন তেমন করিয়া আরতি হইল।

পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ!— পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছে।

কাশীবাসিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দানাপুর ষ্টেশন হইতে দানাপুর শহর পাঁচ মাইল দূরে, ষ্টেশনটি যে স্থানে অবস্থিত, তাহার নাম খগোল।

খগোলের বাজার হইতে কিয়দ্দূরে, ষ্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু গিরীন্দ্রনাথের বাসাবাড়ী। মৃন্ময় গৃহখানি, খোলার চাল। রাস্তা হইতে তিনটি সিঁড়ি উঠিয়া একটু বারান্দা মত। তার পরই অন্তঃপুর। দু'খানি শয়ন ঘর, একটি রসুই ঘর, একটি কাঠ রাখিবার ঘর (কপাট নাই);—উঠানটি টালি বিছান; মধ্যস্থানে উচ্চ আলিসাযুক্ত কূপ; মাসিক ভাড়া ৩॥০ টাকা।

গিরীন্দ্র চাকরিতে প্রবেশ করিয়া সঙ্গদোষে চরিত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রায় দশ বৎসর কাল মদ্যপানাদি যথেচ্ছাচারে কাটাইয়া, সম্প্রতি বৎসর-দুই কিঞ্চিৎ ভদ্র হইয়াছে—অর্থাৎ বিবাহ করিয়াছে। স্ত্রীটি একটু বড় সড়;—বড় সড় দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছিল। নাম মালতী। মুখখানি বেশ লালিত্যমাখা। রঙটি তত ফর্সা নহে। এই বয়সেই বেচারি বিদেশে একাকী স্বামীঘর করিতে আসিয়াছে। শাশুড়ী নাই—ননদ নাই,—দেখিবার, যত্ন করিবার কেহ নাই। স্বামী আপিস চলিয়া গেলে এমন কেহ নাই যাহার সঙ্গে বসিয়া মালতী দুই দণ্ড গল্প করে। সম্বলের মধ্যে এক বুড়ী দাই ভজুয়ার মা। দিনরাত্রি বাড়ীতে থাকিয়া বধূকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে,—এইজন্য বেতন ১৲ টাকা বেশী। খগোলে অনেকদিন স্থায়ী একটি বাঙ্গালী পরিবার এই দাইটিকে পুরাতন ও বিশ্বাসী বলিয়া সুপারিশ করিয়া দিয়াছেন। সে যে পুরাতন তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার মস্তকের শুভ্র কেশ, দেহের স্থৌল্য, চর্ম্মের লোলতা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। এবং বোধ হয় বিশ্বাসীও বটে, কারণ বাজার করিতে যাইতে তাহার অত্যন্ত

অনিচ্ছা দেখা যায়। গিরীন্দ্র বেচারী অত্যন্ত ভাল মানুষ; নিজেই হাটবাজার করিয়া কুলির মাথায় দিয়া লইয়া আসে। ভজুয়ার মা ততক্ষণ বারান্দার কোণে শুইয়া নিদ্রা উপভোগ করে।

শীতকাল, তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, আর বেলা নাই। মালতী শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। যথাস্থানে চট বিছাইয়া, কালো কম্বল মুড়ি দিয়া ভজুয়ার মা নাসিকাধ্বনিপূর্ব্বক মালতীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। মালতী তাহার পানে চাহিয়া অনুচ্চ-স্বরে বলিল—আঃ, হতভাগী কি ঘুমের বোঝা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিল।

এমন সময় বাহিরে একটা পরুষকণ্ঠ 'বাবু' 'বাবু' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মালতী ছুটিয়া সদর দরজার কাছে গেল। অজস্র ছিদ্রসঙ্কুল দরজাটি বন্ধ,—একটি ছিদ্রে চক্ষু লগ্ন করিয়া দেখিল, একজন রেলওয়ে কুলি, মাথায় একটা তোরঙ্গ, হাতে একটা পুঁটুলি,—দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে, তাহার পশ্চাতে একজন বিধবাবেশিনী প্রৌ বাঙ্গালী স্ত্রীলোক।

চকিতের মধ্যে মালতী ফিরিয়া, দাইকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। কিছুতেই দাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয় না দেখিয়া সে অবশেষে তাহার গায়ে হাত দিয়া—'আগে ভজুয়াকে মা—ঈ' বলিয়া খুব জোরে নাড়া দিতে লাগিল। দাই তখন উঠিল—শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

এক মিনিট পরে স্ত্রীলোকটি আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। মালতীর মুখপানে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মালতী ভাবিল, স্বামীর কোনও আত্মীয়া হইবেন—কিন্তু কাহারও আসিবার কথা ত ছিল না; প্রণাম করিবে কি না ভাবিতে লাগিল।

নবাগতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি গিরীন্দ্রবাবুর বাড়ী?"

মালতী বলিল, "হ্যাঁ।"

"তুমি তাঁর বউ?"

মালতী অন্যদিকে চাহিয়া, মাথা হেলাইয়া জানাইল তাহাই। তাহার পর সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে যে চিনতে পারলাম না,—কোথা থেকে আসছেন?"

"আমি আসছি কাশী থেকে। গাড়িতে যাচ্ছিলাম, টকিটি হারিয়ে গিয়েছিল তাই নামিয়ে দিলে। শুনলাম আবার সেই রাত একটায় গাড়ী। একলা মেয়েমানুষ কোথায় যাই,—তাই একজন ভদ্রলোকের বাড়ী খুঁজে এলাম।"

মালতী বলিল, "তা বেশ করেছেন। হাত পা ধুয়ে ফেলুন।"

দাই জল দিল। তিনি হস্তপদাদি ধৌত করিলেন। মালতী ততক্ষণ একটি শতরঞ্চ আনিয়া বারান্দায় বিছাইল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কখন গাড়ীতে উঠেছিলেন? খাওয়া দাওয়া হয় নি বোধ হয়?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কৈ আর হয়েছে?"

মালতী দাইকে বলিল, "শীঘ্র করে উনানটা জেলে দে। দিয়ে বাজার যা, আলোচাল কিনে নিয়ে আয়।"

ইহা শুনিয়া নবাগতা সুমিষ্টস্বরে বলিলেন, "না মা, আলোচাল কিনতে দিতে হবে না। আলোচাল আমার পুঁটুলিতে বাঁধা আছে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

তিনি আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। মালতীকেও কাছে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বাছা?"

"আমার নাম মালতী।"

"বাপের বাড়ী?"

"উত্তরপাড়া।"

"তোমার মা, বাপ সবাই আছেন?"

মালতী মুখখানি অন্ধকার করিয়া বলিল, "বাবা ত মারা গেছেন আমি যখন আঁতুড়ে,—মা মারা গেছেন যখন আমি এক বছরের।"—বলিয়া মালতী উঠিয়া গেল।—উনান জ্বালিতে দেরী হইতেছে বলিয়া দাইকে বকিল, নিজে উনান ধরাইতে বসিয়া গেল।

কাশীবাসিনী উঠিয়া রান্নাঘরে আসিলেন। মালতী ধৌত বস্ত্র পরিয়া রান্না চড়াইল। সেইখানেই বসিয়াই আবার গল্প আরম্ভ হইল।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কদ্দিন তোমার বিয়ে হয়েছে?"

"এই বোশেখ মাসে।"

"তবে ত অল্প দিনই হল। এখানে এসেছ কি মাসে?"

"এই তুঁশাস।"

"তোমার স্বামী কখন আপিসে যান ?"

স্বামীর প্রসঙ্গে মালতীর লজ্জা হইল। মুখখানি নত করিয়া শতরঞ্জিটিতে খুঁটিতে বলিল, "ন'টার সময়।"

"কখন আসেন ?"

"কোনও দিন ছ'টার সময় আসেন, কোনও দিন সাতটা বেজে যায়।"

"কত মাইনে পান ?"

"ত্রিশ টাকা।"

"তা ছাড়া উপরি আছে ?"

মালতী লজ্জিত হইয়া বলিল, "কি জানি।"

কাশীবাসিনী একটু খুসী হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আজ প্রদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে গিরীন্দ্র বাড়ী আসিল। মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ ভারি সকাল সকাল যে ?"

গিরীন্দ্র একটু হাসিল। বলিল, "তুমি একলাটি থাক, তাই এলাম আজ সকাল সকাল।"

মালতী বলিল, "আজ আমি ত একলা নই। আজ বাড়ীতে কে এসেছেন বল দেখি ?"

গিরীন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে ?"

"একটি বিধবা; তিনটের প্যাসেঞ্জারে কাশী থেকে দেশে যাচ্ছিলেন; টিকিট হারিয়ে যাওয়াতে নামিয়ে দিয়েছে।"

"কাশী থেকে ? সঙ্গে কেউ ছিল না ? কত বয়স ?"

"সঙ্গে কেউ ছিল না, বয়স ত্রিশ চল্লিশ।"

গিরীন্দ্র মালতীর অনুমান শুনিয়া হাসিল। বলিল, "ত্রিশ আর চল্লিশে কত তফাৎ, নিজের ত্রিশ বছর বয়স না হলে তা তুমি বুঝতে পারবে না।"

এ কৌতুক ভাব কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "এত লোক থাকতে আমাদের বাড়ীই বা কেন এল?"

মালতী একটু থমকিয়া গেল। স্বামী বিরক্ত হইবেন তাহা ত সে একবারও ভাবে নাই, সে ত খুব আমোদ করিয়াই সংবাদটা দিতে আসিয়াছিল।

গিরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "দেখতে কেমন?"

মালতী বলিল, "ও সব জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

গিরীন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কাশী থেকে—একলা মেয়ে মানুষ,—কি রকম বিধবা তাই ভাবছি।"

মালতী বুঝিল। বলিল, "না না—যা ভাবছ তা নয়। ভাল লোক।"

গিরীন্দ্র বলিল, "ভারি জান! যেমন তোমার বুদ্ধি! কখন যাবে বলেছে?"

"তা ত কিছু বলেন নি।"

"রাত একটার সময় আবার গাড়ী।"

"অত রাতে কি ক'রে একলা ষ্টেশনে যাবেন? কে পৌঁছে দেবে?"

গিরীন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি পৌঁছে দেবো। এ পাপ যত শীঘ্র বিদায় হয় ততই ভাল। আমি যাব—সঙ্গে করে পৌঁছে দেবো।"

মালতী মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া রহিল। গিরীন্দ্র বাহিরে গিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া আসিল।

তখনও মালতী সেই রকম করিয়া বসিয়া আছে। গিরীন্দ্র বলিল, "ব্যাপারখানা কি?"

মালতী বলিল, "বাড়ীতে মানুষ এসেছে, তাড়িয়ে দেবে কি করে? উনি নিজে থেকে বলেন নি, কি ক'রে বলবে যে তুমি 'যাও রাত একটার গাড়ীতে'?"

গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "ওগো সে জন্যে তোমার ভাবনার দরকার কি? সে ভার আমার।"

ইহার পর গিরীন্দ্র তোরঙ্গ খুলিয়া একটি বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া, একটা সোডা ভাঙ্গিয়া কয়েকবার পান করিল।

মন্ত্রের প্রভাবে তাহার মুখের বিরক্তির ভাব শীঘ্র অপনোদিত হইতে লাগিল। মালতীর সঙ্গে প্রফুল্লভাবে গল্প আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিলে, কাশীবাসিনী আসিয়া বাহিরের বারান্দায় দণ্ডায়মান হইলেন। গিরীন্দ্র হঠাৎ বাহিরে আসিয়া বলিল, "আপনার আসাতে বড়ই আনন্দিত হলাম।"—বলিয়া প্রণাম করিল। 'দিল্' তখন তার 'দরিয়া'।

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

গিরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নিবাস?"

"আপাততঃ কাশীবাস করছি বাবা।"

"কোথায় যাওয়া হচ্ছিল?"

"একবার দেশে যাব ভেবেছিলাম—তা টিকিট হারিয়ে গেল—নামিয়ে দিলে। তাই মনে করলাম—"

গিরীন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "তা বেশ করেছেন, উত্তম করেছেন! আজ এখানে থাকুন, কাল বেলা তিনটের গাড়ীতে যাবেন এখন।"

"আজ রাত একটার গাড়ীতে—"

"পাগল! অত শীতে, বুড়ো মানুষ মারা পড়বেন যে! কিছু বিশেষ প্রয়োজন ত নেই?"

"তা নেই বটে।"

অতঃপর গিরীন্দ্র শাল গায়ে দিয়া, ছড়ি লইয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে বেড়াইতে বাহির হইল।

রাত্রি দশটার সময় ফিরিল। কাশীবাসিনী তখন শয়ন করিয়াছেন। দাই নিদ্রিত. মালতীও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল. ডাকাডাকিতে সেই উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

দরজা খুলিবামাত্র গিরীন্দ্র মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। মুখে মদের গন্ধ. কিন্তু মালতীর সেটা সহিয়া গিয়াছিল।

মালতী বলিল. "এত রাত!"

"একটা ভাল খবর আছে।"

"কি?"

"বদলি হল তাড়িঘাটে।"

"মাইনে বেড়েছে ?"

"পাঁচ টাকা।"

"মোটে ?"

কথা কহিতে কহিতে দুই জনে শয়নগৃহে আসিয়া পৌঁছিল। গিরীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তা দিক না দিক, সেখানে দু' পয়সা আছে।"

"কবে যেতে হবে ?"

"তিন চার দিন পরে।"

গিরীন্দ্র বলিল বাহিরে সে অনেক খাইয়া আসিয়াছে—আহার করিবে না। মালতী আহার করিয়া আসিয়া দেখিল, স্বামী নিদ্রিত।

পর দিন প্রভাতে সাতটার সময় গিরীন্দ্র গাত্রোত্থান করিল। স্নানাদি করিতে আটটা বাজিল। কাশীবাসিনীকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাগী কাল যায় নি ?"

মালতী বলিল, "বেশ! নিজে কাল মানা করলে ওঁকে যেতে। উনি ত একটার গাড়ীতে যেতে চেয়েছিলেন।"

গিরীন্দ্র বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল। বলিল, "আজ তিনটের প্যাসেঞ্জারের আগে কুলি পাঠিয়ে দেবো। পাপ বিদেয় ক'রে দিও। যাবার সময় সাবধানে থেক, কিছু নিয়েটিয়ে না যায়।"

মালতী ডাগর বিষণ্ণ চোখ দুটিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

গিরীন্দ্র আপিসে বাহির হইয়া গেলে মালতী কাশীবাসিনীকে বলিল, "আসুন আমরা স্নান করে ফেলি।"

স্নান করিতে করিতে দুইজনে অনেক গল্প হইল। বিদেশে আসিয়া অবধি মালতী একদিনও এমন করিয়া গল্প করিতে পায় নাই। ভজুয়ার মাতার সঙ্গে হিন্দী কহিয়া কহিয়া তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল।

স্নানান্তে কাশীবাসিনী আহ্নিক করিতে বসিলেন। গঙ্গাজল নাই—কূপজলেই 'ইদং গঙ্গোদকং' বলিয়া সারিতে হইল।

আহারান্তে উঠানে কূপের আলিসায় বসিয়া কিয়ৎক্ষণ চুল শুকান এবং বিশ্রাম করা হইলে, মালতী চুল বাঁধিবার সমস্ত সরঞ্জাম বাহির করিয়া আনিল। এতদিন সে নিজে নিজে চুল বাঁধিয়াছে। নিজে কি ভাল

করিয়া চুল বাঁধা যায় ? তাহার চুলের অবস্থা দেখিয়া কাশীবাসিনী অনেক দুঃখ করিলেন। একটি ঘণ্টা ধরিয়া, অতি পরিপাটী করিয়া চুল বাঁধিয়া দিলেন।

ক্রমে দুইটা বাজিল। এইবার কুলি আসিবে। কাশীবাসিনী প্রস্তুত হইলেন। বলিলেন, "মা, এক দিনেই তোমার উপর মায়া জন্মে গেছে। যেতে কষ্ট হচ্ছে।"

মালতীরও সেইরূপ বোধ হইতেছিল। বিদেশে কতদিন পরে একজন রমণীর স্নেহ-ব্যবহার পাইয়া তার যেন পরমাত্মীয় লাভ হইয়াছে মনে হইতেছিল। ইনি চলিয়া গেলে আবার সেই সারাদিন ধরিয়া একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হইবে। তাহারও বড় কষ্ট হইতে লাগিল।

মালতী বলিল, "আজ নাই বা গেলেন! দু'দিন থাকুন না। এ দু'দিন আপনার সঙ্গে কথা কয়ে বেঁচেছি। একলাটি প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এক এক সময় কান্না পায়।"

কাশীবাসিনী বলিলেন, "আমি থেকে যেতে পারি, কিন্তু বাছা, তোমার স্বামী কিছু ভাবেন যদি ?"

মালতী মুখে বলিল, "ভাববেন আবার কি ?"—কিন্তু মনটি তাহার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সত্যই ত, স্বামী যে ইহার উপর প্রসন্ন নহেন। কুলিটা আসিলে অবশ্য তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বামী পাছে বেশী রাগ করেন ?

তাহার পর ভাবিল—তা করেন, করিবেন। এমন আর কিছু গর্হিত কার্য্য করা হইতেছে না। আমি এই একলাটি এত সংসার ঘাড়ে করিয়া মরিতেছি, কেহ আহা বলিবার নাই, কথা কহিবার একটা মানুষ নাই—আমি একজন লোককে দুইদিন রাখিতে পারি না ?—স্বামী আসিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলে মালতী কি কি বলিবে, কি রকম করিয়া রাগ করিবে, সব মনে মনে গড়িয়া রাখিতে লাগিল।

দুইটা বাজিল, কুলি আসিল না। তিনটা বাজিয়া গেল, তথাপি কুলির দেখা নাই। মালতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—তখন আবার মনের সুখে কাশীবাসিনীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল।

বৈকালে মালতী জলখাবার কিনিতে দাইকে বাজারে পাঠাইতেছিল,

কাশীবাসিনী বলিলেন, "ছাইপাঁশ বাজারের জলখাবারগুলো কেন খাও তোমরা? ঘরে খাবার তৈরি করতে জান না?"

মালতী বলিল, "কে অত হাঙ্গামা করে বাপু!"

"হাঙ্গামা আবার কি? আমি তোমায় আজ দেখিয়ে দিচ্ছি।" —বলিয়া তিনি দাইকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নিজের বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া সুজি, চিনি, ময়দা প্রভৃতি কিছু কিছু আনিবার আদেশ করিলেন।

মালতী বলিল, "ও কি কথা! আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন? আমি টাকা দিই।" দাইকে বলিল, "টাকা ফিরিয়ে দে দাই।"

দাই টাকাটি কাশীবাসিনীর হাতে দিতে গেল,—তিনি কিছুতেই লইবেন না। বলিলেন, "আমি তোমাদের জন্যে একটা টাকা খরচ করলামই বা; তোমরা আমায় ক, যত্ন আদর করছ!"

মালতী বলিল, "ভারি আদর, ভারি যত্ন করেছি আপনাকে কি না। আদর যত্ন করতে আমি জানি কি না! নিন্ টাকাটা রাখুন।"

তিনি বলিলেন, "দেখ বাছা, তা হলে কিন্তু আজই রাত্তির একটার গাড়ীতে চ'লে যাব।"

তখন মালতী ক্ষান্ত হইল। বলিল, "কর বাছা তোমার যা ইচ্ছে তাই। কিন্তু অন্যায় হল ব'লে রাখছি।"

দাই টাকা লইয়া বাজারে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজ গিরীন্দ্র বাড়ী আসিল অনেক বিলম্বে; রাত্রি প্রায় তখন আটটা। আসিয়া কাশীবাসিনীকে দেখিয়াই বলিল, "আমার বড় অপরাধ হয়ে গেছে। আপিসে কাযের ভিড়ে আপনাকে নিতে কুলি পাঠাতে একেবারেই মনে ছিল না। দু'দিন যখন কষ্ট পেলেন, আর একটা দিন তখন কষ্ট করুন। কাল আর আমার আপিস নেই, কাল নিজে গিয়ে আমি আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবো।"

মালতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সে তাহার মুখে মদ্যগন্ধ পাইল। বলিল, "তোমার গতিক ভাল নয়। তাড়িঘাটে গেলে হাতে বেশী পয়সা পেলে তুমি আরও বিগড়ে যাবে।"

গিরীন্দ্র বলিল, "আরে রামঃ, সে ছোট ষ্টেশন, অজ্ পাড়াগাঁ, সেখানে কি কেল্‌নার কোম্পানি আছে? সেখানে গিয়ে, গঙ্গাস্নান ক'রে সব ছেড়ে দেব—ব্যস্ একদম।"

"তুমি কাল আপিসে যাবে না?"

"না, আমার এখানকার সব কায শেষ হয়ে গেছে। বাবুরা ধরেছে পরশু ভোজ দিতে হবে। কাল সব যোগাড় যন্ত্র ক'রে রাখতে হবে।"

গিরীন্দ্র হস্তপদাদি ধৌত করিয়া আসিয়া বলিল, "আজ আর জল খাবার খাব না, কোথাও বেরুব না; —রুটি দাও একেবারে খাই।"

মালতী লুচি, মোহনভোগ, মাছের তরকারী প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ যাহা কাশীবাসিনী প্রস্তুত করিয়াছিলেন—সমস্ত আনিয়া দিল। গিরীন্দ্র আহার করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। বলিল, "দেখ, উনি মাংস রাঁধতে জানেন কিনা জিজ্ঞাসা কর দিকিন।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিল, "জানেন কিছু কিছু।"

"দেখ, আমি একটা কথা ভাবছি। ওঁকে যদি দু' এক দিন থাকতে বলা যায়, উনি থাকেন না? তা হলে পশু´ ভোজ পর্য্যন্ত ওঁকে রাখা যাক। একবার জিজ্ঞাসা কর দেখি।"

মালতী মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল, "তুমি জিজ্ঞাসা কর না।"

গিরীন্দ্র জিভ কাটিয়া বলিল, "এ অবস্থায় কি ওঁর সঙ্গে কথা কইতে পারি?"

মালতী বলিল, "আহা মরে যাই! আজ বাড়ী এসেই ওঁর সঙ্গে কথা কইলে না?"—বলিয়া কাশীবাসিনীর কাছে গিয়া প্রস্তাবটা করিল।

তিনি সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গিরীন্দ্র ভোজের জিনিসের ফর্দ্দ করিল। কাশীবাসিনী তাহা শুনিয়া যে সকল মন্তব্য ও পরিবর্ত্তনাদি প্রস্তাব

করিলেন, তাহা গিরীন্দ্রের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। আড়ালে মালতীকে বলিল, "দেখ ইনি একজন খলিফা লোক! কাশীতে শুধু ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন মনে কোরো না।"

মালতী রাগ করিয়া বলিল, "কি বল যাও! তোমার মন ভারি অশুদ্ধ।"

দুই ক্রোশ দূরে গুরগাঁও নামক পল্লীতে দেবী আছেন। পরদিন প্রভাতে সেইখানে ছাগবলি পাঠান হইল।

রাত্রিকালে ভোজের ব্যাপার—নির্ব্বিঘ্নে বলিতে পারি না—সম্পন্ন হইয়া গেল। রন্ধনাদি চমৎকার হইয়াছিল। যদি ভোক্তারা সকলে সচেতন থাকিত, তবে সমস্বরে ধন্য ধন্য করিতে পারিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আজ রবিবার। আজ রাত্রের গাড়ীতে গিরীন্দ্র তাড়িঘাট যাত্রা করিবে।

কাশীবাসিনী বলিলেন, "আমি আর দেশে যাব না—আমিও কাশীতেই ফিরে যাই।"

মালতী বলিল, "বেশ ত, আপনিও আমাদের সঙ্গেই চলুন। তাড়িঘাট থেকে চার পাঁচটা ষ্টেশন বৈত নয়।"

আহারান্তে গিরীন্দ্র মালতীকে বলিল, "গোটা ত্রিশ টাকা বের ক'রে দাও—বাজার-দেনাগুলো মিটিয়ে আসি।"

মালতী বলিল, "অবাক কথা! আমার কাছে আর টাকা আছে না কি?"

"কেন, সে দিন যে আশি টাকা এনে দিলাম।"

"পর্শু বাজারে যাবার সময় ত্রিশ নিয়ে গেলে, বাকী যা ছিল কাল সন্ধেবেলা থেকে সে সবই ত প্রায় দিলাম তিন চার বারে। আর টাকা কোথায়?"—বলিয়া মালতী বাক্স খুলিয়া দেখিল, দুই টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র রহিয়াছে।

গিরীন্দ্র বলিল, "এখন উপায় ? আমার কাছে ত কিছু নেই !"

মালতী চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, "আমি কি করব ? মদেই তোমার সর্ব্বনাশ করলে। সে সময় ত জ্ঞান থাকে না, তখন কেবল দাও টাকা দাও টাকা বল।"

গিরীন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "দেখি কারু কাছ থেকে ধার নিই গে।"

কাশীবাসিনী বাহিরে বসিয়া সব কথা শুনিয়াছিলেন। মালতীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওঁকে বারণ কর মা, আমার কাছে টাকা রয়েছে, আমার ত এখন দেশে যাওয়া হল না।"

মালতী গিয়া স্বামীকে বলিল। গিরীন্দ্র বলিল, "সে কি কাযের কথা ? ওঁর কাছে টাকা নেব, আলাপ নেই পরিচয় নেই !"

কাশীবাসিনী এ কথা শুনিয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "তাতে আর ক্ষতি কি বাবা ? তোমরা তাড়িঘাটে গিয়ে থিতু হয়ে বস ; আমি কিছু দিন পরে আবার আসবো এখন তোমাদের কাছে ; দেখাশুনোও হবে, টাকাও নিয়ে যাব।"

গিরীন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "তা হলে আপনি অনুগ্রহ ক'রে কাশী না গিয়ে আপাততঃ তাড়িঘাটেই চলুন আমাদের সঙ্গে। পাঁচ ছ' দিনেই আপনার টাকা ক'টি ফিরিয়ে দিতে পারব।"

"আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। কত চাই ? ত্রিশ ? যদি বেশী দরকার থাকে তাও আমার কাছে আছে, যা লাগে বল বাবা।"

গিরীন্দ্র বলিল, "না মা বেশী চাইনে, ত্রিশ দিলেই হবে।"

কাশীবাসিনী বাক্স খুলিয়া দশ টাকার তিনখানি নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সেই দিন রাত্রি এগারটার গাড়ীতে গিরীন্দ্রনাথ স্ত্রী ও কাশী-বাসিনীকে লইয়া যাত্রা করিল। ভজুয়ার মা কাঁদিতে লাগিল। গিরীন্দ্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু সে স্বীকার করিল না।

ষ্টেশনের পথে কাশীবাসিনী মালতীকে বলিলেন, "বাছা, বাবাকে বল যেন আমার কাশীর টিকিটই করেন। আমার বিশেষ দরকার আছে।"

গিরীন্দ্র ইঁহাকে তাড়িঘাটে লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিল, কিন্তু ফল হইল না।

তাড়িঘাটে যাইতে দিলদারনগরে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। গিরীন্দ্র ভোর রাত্রে স্ত্রীকে লইয়া দিলদারনগরে নামিয়া গেল ;—কাশীবাসিনী চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেলা সাতটার সময় গিরীন্দ্রনাথ নূতন কর্ম্মস্থান তাড়িঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল। সরকারী বাসা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইখানে গিয়া উঠিল। জিনিসপত্রগুলা কতক গুছাইয়া ষ্টেশনে বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

মালতী স্নান করিবে বলিয়া কাপড় বাহির করিবার জন্য একটা তোরঙ্গ খুলিল। সচরাচর তাহার গহনার বাক্সটি এই তোরঙ্গের মধ্যেই থাকিত। কাপড় বাহির করিতে গিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, গহনার বাক্স নাই।

তখন মালতী ভাবিল, নিশ্চয়ই অন্য কোন বাক্সে আছে। যতগুলি বাক্স আছে একে একে সমস্ত খুলিয়া খুঁজিল, কোথাও নাই।

মন বোঝে না, দুইবার—তিনবার করিয়া প্রত্যেক বাক্সটির প্রত্যেক জিনিস আলাদা আলাদা করিয়া খুঁজিল, তথাপি পাইল না। তখন সে হতাশ হইয়া ধূলায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া অনেক কাঁদিল। ষ্টেশন মাষ্টারের মেয়ে চম্পকলতা তাহার ছোট ভাইটিকে কোলে করিয়া 'বউ দেখিতে' আসিয়াছিল, সে মালতীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চম্পট দিল।

শেষে গিরীন্দ্র আসিল। সে দেখিয়া বলিল, "এ কি!"

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে সব বলিল।

শুনিয়া গিরীন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলিল, "বেশ ক'রে সব খুঁজেছ?"

"কিছু বাকী রাখিনি।"

"শেষ তাকে কখন দেখেছ?"

"কাল খগোলে গুছিয়ে একখানি শালুর টুক্‌রোতে বেঁধে ঐ কালো তোরঙ্গের মধ্যে রেখেছি, বেশ মনে পড়ছে।"

"গাড়ীতে কালো তোরঙ্গ খুলেছিলে? কোন জিনিসপত্তর বের করতে?"

"খুলেছিলাম একবার। শীত করতে লাগল, শালটা বের করেছিলাম।"

"সে সময় গহনার বাক্স বের ক'রে ফেলে রাখনি ত?"

মালতী বলিল, "কখ্‌খনো না। ওপরে শালখানা ছিল—শুধু তুয়ে তুয়ে শাল তুলে নিয়েছি।"

"চাবি কোথা রেখেছিলে?"

"কোমরে ছিল।"

"তারপর ঘুমিয়েছিলে?"

"তা, ঘুমোলাম বৈকি।"

গিরীন্দ্র নিশ্চিত স্বরে বলিল, "তবে কাশীর সেই মাগী নিয়েছে।"

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

গিরীন্দ্র বলিতে লাগিল, "যখন ঘুমিয়েছিলে, তখন আস্তে আস্তে কোমর থেকে চাবিটি খুলে নিয়ে, গহনার বাক্সটি বের করে নিয়েছে। তার নাম কি জান?"

"না। বুড়ো মাগীর নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কখনও?"

"কাশীতে কোথায় থাকে জান?"

"কি একটা মঠে।"

গিরীন্দ্র রাগিয়া বলিল, "কাশীতে ত দুশো ছাপ্পান্নটা মঠ আছে,—কোন্ মঠে—কোন্‌খানে সে মঠ কিছু শুনেছ?"

"না।"

"সেই কালেই বলেছিলাম, ও সব লোককে বিশ্বাস কোরো না। ওরা

সর্ব্বনেশে লোক—কাশীর মাগী বেশ্যা। ত্রিশ টাকার চার ফেলে সর্ব্বস্বটা নিয়ে গেল!"

মালতী বলিল, "তিনি কথ্খনো নেন নি। তিনি নেবেন কেন? আমি বোধ হয় থগোলের বাসায় ফেলে এসেছি।"

গিরীন্দ্র কিন্তু তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। বলিল, "ও সব কথা রেখে দাও,—জান না ত পৃথিবীর গতিক! আচ্ছা সে মাগী কোনও দিন তোমার গহনা দেখতে চেয়েছিল?"

মালতী ভয়ে ভয়ে বলিল, "তা চেয়েছিলেন; সেই ভোজের দিন। বল্লেন, 'মা, তোমার কি কি গহনা আছে দেখি?'—আমি বের ক'রে সব দেখালাম।"

গিরীন্দ্র বলিল, "তবে আর কোন সন্দেহ নেই। আমি চল্লাম পুলিশে টেলিগ্রাফ করতে।"—বলিয়া গিরীন্দ্র ষ্টেশনে গেল।

মালতী আবার একা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই সপ্তাহে এই দম্পতী গহনার শোক প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বমত হাসে, গল্প করে, আমোদ করে। নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি গিরীন্দ্র বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাতেই বোধ হয় গহনা লোকসানের কষ্ট অনেকটা চাপা পড়িয়া গেল।

যে দিন পুলিশে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল, সেই দিনই দিলদারনগর হইতে হেড কনেষ্টবল আসিয়া গহনাগুলির ফর্দ্দ ও বিবরণ গিরীন্দ্রনাথের জবানবন্দীসহ লিখিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর হইতে পুলিশের তরফ হইতে আর কোনও সংবাদ নাই।

বেলা সাড়ে এগারোটা; গিরীন্দ্রনাথ আপিসে গিয়াছে। মালতী খাইতে বসিয়াছিল, এমন সময় দিলদারনগর হইতে গাড়ী আসিল। গিরীন্দ্রনাথের বাসা প্ল্যাটফর্ম্মের নীচেই, দুয়ারে দাঁড়াইলে প্ল্যাটফর্ম্ম,

গাড়ী, লোকজন সব দেখা যায়। যতবার গাড়ী আসিত, ততবার মালতী দেখিতে ছুটিত ; প্রতি গাড়ীটি না দেখিলে যেন তাহার কর্ত্তব্যের হানি হইবে ! গাড়ীর শব্দ শুনিবামাত্র মালতী থালা ফেলিয়া এঁটো হাতে, এঁটো মুখে গাড়ী দেখিতে গেল। বদ্ধ দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ফুটা দিয়া দেখিল, প্লাটফর্ম্মের উপর কাশীবাসিনী নামিয়াছেন, একটা কুলি তাঁহার জিনিস নামাইতেছে ; তিনি কুলিকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, কুলিটা গিরীন্দ্রনাথের বাসার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল।

মালতী ছুটিয়া উঠানে গিয়া আচমন করিল। কম্পিত বক্ষে কাশী-বাসিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কত কি যে তাহার মনে হইল ! কত আহ্লাদ হইল, আর কতবার মনে মনে বলিল, হে ঠাকুর, স্বামী যে তাঁহাকে গহনাচুরির অপবাদ দিয়াছেন, সে কথা যেন উঁহার কর্ণগোচর না হয়।—তিনি যে গহনা লন নাই এই বিশ্বাস মালতীর ছিল। আসিতে দেখিয়া সে বিশ্বাস দৃঢ় হইল। নহিলে কখনও তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত হন ?

কয়েক মিনিট পরে কাশীবাসিনী মালতীর নিকটে পৌছিলেন।

"মা এসেছেন ?"—বলিয়া মালতী প্রণাম করিল। তিনি মালতীকে মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মালতী বলিল, "আপনি স্নান করে ফেলুন, আমি ভাত চড়িয়ে দিই।"

কাশীবাসিনী বলিলেন, "স্নান করেছি, ভাত চড়াতে হবে না,—আজ একাদশী।"

মালতী লক্ষ্য করিল, কাশীবাসিনীর মুখখানি যেন বড় গম্ভীর,—বিষণ্ণ। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি যেন ছল ছল করিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মনটা এত ভার ভার কেন ?"

তিনি বলিলেন, "জান না ?"

মালতী ভয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

"তোমাদের সন্দেহ, আমি তোমার গহনার বাক্স নিয়ে গেছি, পুলিশ পাঠিয়েছ, জান না ?"

মালতী লজ্জায় মৌন হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি

যদি বলি, আমার মনে এক দিনও এ সন্দেহ হয় নি, তবে আপনার বিশ্বাস হবে কি ?”

কাশীবাসিনী ম্লান মুখে বলিলেন, “তোমার স্বামীর ত বিশ্বাস হয়েছিল বাছা !”

মালতী বলিল, “পুলিশ আপনার সন্ধান পাবে তা উনি ভাবেন নি। উনি ত আজও বলছিলেন, কাশীতে কত লক্ষ লক্ষ মঠ, কোটি কোটি সেবাধারী, কে কার সন্ধান পায় ?”

“বের ত করেছিল আমায় ! আমার উপর জুলুমটা কি করেছে কম ? দুটিশো টাকা নগদ ঘুস গুণে দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছি।”

মালতী বলিল, “আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে আপনার খুব শিক্ষা হল !”

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “গিরীন কখন আসবেন ?”

“সন্ধ্যেবেলা।”

উঠানে রৌদ্র নিবিয়া গেল। মেঘ করিয়া উঠিল। কাশীবাসিনী বাহিরের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “জল না হলে বাঁচি !”

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ?”

“আজই যাব।”

“আজই যাবেন ?”

কাশীবাসিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “তুমি ভারি ছেলেমানুষ। তোমার স্বামী আমাকে চোর ব'লে সন্দেহ করেন, আর তোমার ইচ্ছে যে আমি থাকি ! আমি আড়াইটের গাড়ীতে ফিরব। আমাদের আরও অনেক লোক শ্রীক্ষেত্র যাচ্ছে। কাল আমরা সবাই রওনা হব।”

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, “কতদিনে ফিরবেন ?”

“কেন ? ফিরলে কি দেখা হবে ?”—বলিতে বলিতে কাশীবাসিনীর চক্ষু দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, “একটি কায করবে ?”

মালতী সাগ্রহে বলিল, “কি ?”

“আমার কতকগুলি গয়না আছে, সেগুলি তুমি পর দিকিন।”—বলিতে বলিতে কাশীবাসিনী তাঁহার সঙ্গের তোরঙ্গটি খুলিয়া একটি হাত-

বাক্স বাহির করিলেন। মালতী বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার ভিতর বিস্তর গহনা, ভাল ভাল জড়োয়া গহনা।

কাশীবাসিনী বলিলেন, "এইগুলি সব তুমি নাও।"

সোণা, রূপা, হীরা, মোতি, চুনী পান্নার চাকচিক্যে মালতীর চক্ষু ঝলসিত। তবু সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "সে আমি পারব না।"

"কেন ?"

"আপনার এই রাশিকৃত গহনা আমি কেন নেব ?"

"আমি দিচ্ছি।"

"আপনি দিচ্ছেন, কিন্তু আমি কোন্ অধিকারে নেব ? সে আমি পারব না।"

আকাশে মেঘ বাড়িয়া উঠিল। ঝড় উঠিল। দিবালোক অত্যন্ত কমিয়া গেল।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধিকার যদি থাকে ?"

মালতী বলিল, "অধিকার ? কি অধিকার ?"

কাশীবাসিনী মুখখানি নীচু করিয়া বলিলেন—"তা বলব, তা বলতেই আজ এসেছি।"

মালতীর বুক গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিল। অবাক হইয়া সে কাশীবাসিনীর মুখপানে চাহিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা কি সত্যি মরেছে ?"

মালতী থতমত খাইয়া বলিল, "কেন ?"

"তাই জিজ্ঞাসা করি।"

"সবাই ত বলে।"

"তা হ'লে তুমি জান—আমিই তোমার পোড়ারমুখী মা।"—বলিতেই কাশীবাসিনীর চক্ষু দিয়া আবার দরদর ধারায় অশ্রু বহিল।

মালতী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

অল্পদিনের একটি ঘটনা সে ভাবিতে লাগিল। মোক্ষদা ঠানদি তীর্থ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীতে রাত্রে শুইয়া শুইয়া তার জেঠাইমার সঙ্গে অনেক কথা বলাবলি করিতেছেন। তাঁহারা মনে

করিয়াছিলেন মালতী ঘুমাইয়া আছে। কিন্তু মালতী ঘুমায় নাই, সব শুনিতে পাইয়াছে। যাহা শুনিল, তাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রচ্যুত হইয়া যেন তার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। যে মাকে এতদিন স্বর্গগতা জানিত, শুনিল তিনি বাস্তবিক জীবিতা; তাঁহার সহিত ঠানদির কোন্ তীর্থে হঠাৎ দেখা হইয়াছে। জানিল, যে মার স্মৃতি সে পবিত্রতম বলিয়া পরম ভক্তিভরে আশৈশব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে—সে মার স্মৃতি সংসারে ঘৃণিত, মা তার কলঙ্কিনী। তাহার সে রাত্রের কষ্ট অবর্ণনীয়। এই সেই মা? আবার সেই রাত্রের তীব্র অনুভূতি হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল।

মালতী শিহরিয়া উঠিল, অজ্ঞাতসারে একটু দূরে সরিয়া বসিল।

কাশীবাসিনী তখনও কাঁদিতেছিলেন। একটু আত্মস্থা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই জানেন?"

"না।"

"তুমি কতদিন হল শুনেছ?"

"বিয়ের পর।"

"মোক্ষদা পিসীর কাছে?"

"হ্যাঁ।"

"মোক্ষদা পিসীর মুখে শুনলাম, তোমার বিয়ে হয়েছে, দানাপুরে মালঘরে জামাই কর্ম্ম করেন, পূজোর সময় তুমি দানাপুরে আসবে তাও ঠিক হয়েছে।"

মালতী বলিল, "তা হলে দানাপুরে তুমি হঠাৎ এসে পড় নি, জেনে শুনে এসেছিলে? কেন?"

মালতীর স্বর এখন কঠোর।

কাশীবাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনার সন্তানকে কেউ ভুলতে পারে?"

মালতীর এইবার একটু একটু কান্না আসিতে লাগিল। আপনার মা না জানিয়াও ইঁহার প্রতি যে মাতৃবৎ আকর্ষণ হইয়াছিল, তাহাই মনে পড়িল। কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "কেন তুমি জানালে তুমি কে?"

"কি জানি। থাকতে পারলাম না।"

মালতী আবেগভরে একবার বলিতে যাইতেছিল—জানিয়েছ ভালই করেছ। নইলে মা ত কখনো চক্ষে দেখতে পেতাম না!

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল—এ মা! নাই দেখতাম!

এই দ্বিধায় সে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

গাড়ীর সময় হইল। কাশীবাসিনী কুলিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, সে জিনিস লইতে আসিল।

মালতী বলিল, "গহনা নিয়ে যাও। আমি পরব না।"

কাশীবাসিনী কন্যার মুখপানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন, "যা ভেবেছ তা নয়। এ তুমি স্বচ্ছন্দে পোরো, নইলে আমিই তোমায় দিতাম না। জীবনে একবার যে পাপ করেছি, আজ চোদ্দ বছর ধ'রে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম। আর, এর একখানিও পাপের অর্জ্জন নয়। আমি মস্ত বড় মানুষের মেয়ে ছিলাম—শোন নি?"

মালতী বলিল, "তবুও আমার স্বামীকে সব না জানিয়ে, তাঁর মত না নিয়ে, আমি নিতে পারিনে।"

"তাই কোরো। যদি তিনি তোমায় পরতে না দেন, তবে এগুলি দেবসেবায় দিও।"

তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন।

মালতী আর থাকিতে পারিল না। "মা আবার দেখা দিও"—বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, প্রণাম করিল।

"সাবিত্রী হও, রাজরাণী হও"—বলিয়া মা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্রুত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রণয়-পরিণাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দু বয়েজ্ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মাণিকলাল, প্রতিবেশী বালিকা কুসুমলতার সঙ্গে প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে।

কবি গাহিয়াছেন—"কে এমন প্রেমিক আছে, যে প্রথম দর্শনেই ভালবাসে নাই?"—কেন, আমাদের মাণিকলাল! কুসুমের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে সে কত খেলা করিয়াছে, গাছের মগডালে উঠিয়া তাহাকে ছানাশুদ্ধ পাখীর বাসা পাড়িয়া দিয়াছে, ঘোড়া সাজিয়া পৃষ্ঠে তাহাকে বহন করিয়াছে, কিন্তু তখন ত সে কোনওরূপ চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করে নাই। কে জানে, হয়ত সে মনের মনে, হৃদয়ের হৃদয়ে ভালবাসিত, অন্তরের সুগোপন অন্তরালে সে প্রচ্ছন্ন প্রবাহের অস্তিত্ব নিজেও অবগত ছিল না।

মাণিকলাল নিজের কাছে নিজে ধরা পড়িয়াছে সংপ্রতি মাত্র। সে দিন মাণিক কুসুমদের বাগানে পেয়ারা পাড়িতে গাছে উঠিয়াছিল। কুসুম মাতার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। কুসুমের পরিহিত বসনখানি জলসিক্ত, পৃষ্ঠলম্বিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাজির প্রান্ত দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে, আর্দ্র মুখখানি প্রভাতের সোণালি রৌদ্র লাগিয়া প্রতিমার মত চিক্ চিক্ করিতেছে। দেখিয়া মাণিক হৃদয় হারাইল।

উঁহারা চলিয়া গেলে পর, মাণিক তাহার অন্তরে যেন এক অপূর্ব্ব আলোকের রশ্মি প্রতিভাত দেখিল। সে আলোক তাহার মনোদেহের প্রতি পরমাণুটিকে যেন বেড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আলোক মন অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাহার চক্ষুযুগলে আসিয়া উপনীত হইল এবং নিমেষের মধ্যে নিখিল বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া পড়িল। সেই নবীন আলোকে মাণিক আকাশের পানে চাহিল—আকাশ আশ্চর্য্য নীল,—এমন কখনও দেখে নাই।—বসুন্ধরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, বসুন্ধরা

দিয়া তাহার সঙ্গে একটু বেশ ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল। মাণিকের প্রতি কুসুমেরও একটা টান যেন দেখা যাইতে লাগিল।

বৈশাখের শেষে, কলেজ বন্ধ হওয়াতে, মাণিকের এক পিসতুতো ভাই প্রভাস আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাস মাণিক অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। মাণিক তাহাকে কতকটা গুরুজন বলিয়া গণ্য করিত এবং ভয় করিয়া চলিত। প্রভাস আসিলেই মাণিককে পড়া জিজ্ঞাসা করিত, আঁক কষিতে দিত, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, অসৎসঙ্গের দোষ, অধ্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশাদি দিত।

কিন্তু কলিকাতায় বন্ধুগণের মধ্যে প্রভাস একজন নীরব কবি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার মনে রন্ধ্রে, রন্ধ্রে রোমান্স, কেবল প্রেমপাত্রীর অভাবে কোনও মতে প্রেমে পড়া হইতে বিরত আছে।

সে আসিয়া মাণিকের ভাবগতিক দেখিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ব্যাপারটা কি?

মাণিক ত কিছুই স্বীকার করে না। সন্ধান করিয়া করিয়া শেষে একদিন প্রভাস মাণিকের কবিতার খাতা হাতে পাইল। কবিতা পড়িয়া ব্যাপার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। মাণিকের উপর তাহার ভারি ভক্তি ও সৌহার্দ্দ্য বোধ হইল।

সে দিন জলখাবার খাইয়া প্রভাস মাণিককে বলিল, "গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসা যাক চল।"

মাণিক প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল—কিন্তু প্রভাস অনেক জিদ্ করিল, কিছুতেই ছাড়িল না।

গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইয়া, তীরে উঠানো এক ভাঙ্গা নৌকার গায়ে দুইজনে উপবেশন করিল।

প্রভাস বলিল, "আমি সব জানতে পেরেছি!"

মাণিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি?"

"তোমার গোপন কথা!"

মাণিক ভাবিল—নিশ্চয়ই সিগারেটের বিষয়। ডেস্কের মধ্যে লুকানো বার্ডসাই, কাগজ প্রভৃতি প্রভাসদাদা বোধ হয় দেখিতে পাইয়াছে, সুতরাং সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "বেশী চালাকি কোরো না যাও।"

প্রভাস বলিল, "এ চালাকির কথা নয়—খুব গুরুতর কথা। জীবন মরণের সমস্যা।"

এবার মাণিক যথার্থ বিষয়টি সন্দেহ করিল। বলিল, "কি হয়েছে কি? কি বিষয় বলই না।"

প্রভাস দূরস্থিত মৃদুগামী নৌকার পানে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিল, "তোমার ভালবাসার বিষয়।"

মাণিক ভাবিল—নিশ্চয়ই বাবাকে বলিয়া দিবে এবং মার খাওয়াইবে, সুতরাং শত্রুভাব ধারণ করিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিল. "আহা যা বল্লে আর কি! ইয়াকি ভাল লাগে না।"

প্রভাস বলিল, "ভাই—আমার কাছে আর লুকোও কেন? আমি সব জেনেছি। তোমাদের দুঃখে আমি খুব দুঃখী। তোমাদের সঙ্গে আমার আন্তরিক সহানুভূতি।"

মাণিক কতকটা আশ্বস্ত হইল। একটু অপ্রতিভও হইল। বলিল, "কে বল্লে তোমায়?"

নৌকার গায়ে জুতার গোড়ালি ঠুকিতে ঠুকিতে প্রভাস বলিল, "তোমার কবিতার খাতা দেখেছি। আমাদের অতুল বাঁড়ুযোর মেয়ে কুসুম ত?"

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—তাই বটে।

"তোমার কবিতা থেকে যেন বোঝা যাচ্চে, আকর্ষণটা উভয়তঃ প্রবল,—তাই কি?"

মাণিক বলিল, "মনে ত হয়।"

"স্পষ্ট কখনও বলেছে?"

"না।"

"তুমি কখনও তাকে স্পষ্ট করে বলেছ?"

"না।"

ইহার পর দুইজনে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে প্রভাস বলিল, "দেখ ওরা আমাদের স্বঘর। মিলন হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু মা বাপকে জানানোর আগে, কুসুমের মন জানা দরকার। অনুমান ফনুমান নয়, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

মাণিক বলিল, "সে কথনও পারা যায় ?"

প্রভাস ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সে না পারলে চলবে কেন ? তুমি যদি সত্যই ওকে লাভ করতে চাও, তা হলে এ বিষয়ে যা কিছু কর্ত্তব্য, সব তোমায় সম্পন্ন করতে হবে। তা না হলে কি করে হবে ? আর দেরী করলেও চলবে না। কুসুমের কত জায়গায় বিয়ের কথা হচ্ছে, কোন্ দিন বিয়ে হয়ে যাবে। তখন চিরদিনটে তোমার আপশোষ করতে হবে।"

এ কথা শুনিয়া মাণিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। এতদিন সে শুধু ভালই বাসিতেছিল। বিবাহ প্রভৃতির কল্পনা কথনও করে নাই। এখন মনে হইতে লাগিল, বিবাহ হইলে ত ভারি মজাই হয় !

"দাদা ! কি ক'রে তার কাছে কথা পাড়ি বল দিকিন ?"

"তা আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। একটু অবসর খুঁজে, আড়ালে পেলে, তার হাতখানি এমনি করে ধরে, তাকে বলবে—'দেখ কুসুম—আমি তোমায় ভালবাসি। একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি, তুমি আমাকে ভালবাস কি ?' যদি বলে 'বাসি'—তা হলে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি আমার হবে কি—আমায় বিয়ে করবে কি ?' যদি সে অনুকূল উত্তর দেয়—তা হলে তার হাতটী এই রকম করে ঠোঁটে তুলে চুমু খাবে।"

মাণিক বলিল, "কিন্তু দাদা ! সে যদি রাজি না হয় ?"

প্রভাস বলিল, "তা প্রথম বারেই রাজি নাও হতে পারে। ও রকম অনেক কেতাবে পড়া গেছে। প্রথমবারে কেউ কেউ একেবারেই 'না' বলে। কেউ কেউ বা বলে—'ভারি সহসা বলেছ, সময়ে উত্তর পাবে।' যে রকম হয়,—তখন আবার তোমাকে শিখিয়ে দেবো।"

চাঁদ উঠিয়াছিল। দুইজনে নানা জল্পনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন হইতে মাণিকলাল অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। কয়েক দিন চেষ্টার পর তাহা লাভও করিল। একদিন সকালে কুসুমদের বাড়ী গিয়া দেখে, বাড়ীতে কেহ নাই, কুসুম রান্নাঘরের বারন্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেছে।

মাণিক বলিল, "কুসুম! বাগানে যাবে? তোমায় আম পেড়ে দিইগে চল।"

কাঁচা আমের নামে কুসুমের জিহ্বা জলসিক্ত হইয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া বলিল, "চল না মাণিক দাদা!"

বাগানে প্রবেশ করিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া মাণিক বলিল, "আমি ভারি ফুল ভালবাসি।"

কুসুম বলিল, "খবদ্দার—খবদ্দার- ফুল তুলো না,- তুল্লে দিদিমা যে বকে!"

মাণিক বলিল, "না তুলছিনে। শুধু ফুল ভালবাসি তাই বলছি। ফুলকে ভাল কথায় কি বলে জান?"

কুসুম মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা, কে না জানে?—পুষ্প। আমাদের পদ্যপাঠে রয়েছে—

শাখীশাখে পুষ্পগুলি কিবা মনোহর।
পাখী ডাকে সুধা ঢালে শ্রবণ ভিতর॥

আচ্ছা মাণিক দাদা, তুমি ত ইংরাজী পড়, শাখী মানে কি বল দিকিনি?"—কুসুমের চক্ষু দুইটি মাণিকের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

মাণিক বলিল, "পুষ্প ছাড়া ফুলের আর কি নাম হয়?"

"আহা! তুমি আগে আমার কথার উত্তর দাও না মশাই। শাখী মানে কি?"

"শাখী মানে বৃক্ষ।"

"জানে রে !"—বলিয়া কুসুম হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িল।

মাণিক বলিল, "এখন বল, পুষ্প ছাড়া ফুলের আর কি নাম হয় ?"

"আর কি নাম ? দাঁড়াও ভাবি।"—বলিয়া কুসুম ঠোঁট নাড়িয়া বিজ্‌বিজ্‌ করিয়া কি বকিতে লাগিল। বোধ হয় কোন কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল।

মাণিক বলিল—"কু—"

কুসুম বলিল—"কু ? কু কি ?

কুহু কুহু রব করি ডাকিছে কোকিল।

কুসুম—

ওহো মনে পড়েছে। ফুলের আর একটা নাম কুসুম গো কুসুম।

কুসুম দুলায়ে ধীরে বহিছে অনিল॥

আচ্ছা, মাণিক দাদা, অনিল মানে যদি বলতে পার তবে ত বুঝি !"

মাণিক বলিল, "অনিল মানে বাতাস।"

বালিকার চক্ষে একটা আনন্দ ও প্রশংসার আলোক দেখা দিল।

মাণিক যথাশিক্ষা কুসুমের হাতখানি ধরিল। ধরিয়া বলিল, "বুঝতে পারলে না ? আমি ফুল ভালবাসি বলেছি, তার মানে, আমি কুসুম ভালবাসি। আমি তোমায় ভালবাসি, কুসুম। তুমি আমায় ভালবাস ?"

কুসুম দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

মাণিক বলিল, "দেখ কুসুম, অনেক দিন থেকে একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি। তুমি আমায় বিয়ে করবে ?"

প্রথম কথাটার মানে কুসুম কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দ্বিতীয় কথাটার মানে বুঝিল। কিন্তু ঐ কথাটাতেই সব মাটী হইয়া গেল।—"ধেৎ"—বলিয়া মাণিকের হাত ছাড়াইয়া কুসুম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তাহার পায়ের মল ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতে লাগিল। যতক্ষণ দেখা গেল, মাণিক তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

কুসুম চক্ষুর অন্তরাল হইলে, মাণিক ব্যাপারটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। বিবাহের নামে কুসুম অমন করিয়া ছুটিয়া পলাইল, তাহার অর্থ কি ? তবে কি কুসুম সম্মত নয় ?

অধীত উপন্যাসগুলি মাণিক একে একে স্মরণ করিতে লাগিল। ক্রমে মনে একটা মীমাংসাও পাইল। লজ্জা প্রণয়ের চির-সহচর। কুসুমের পলায়নের কারণ যে লজ্জা, সে সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনও সংশয় রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রভাস শুনিয়া বলিল—তবে আর কোন চিন্তা নাই। ভালবাসে যখন স্বীকার করিয়াছে, তখন বিবাহের সম্মতি ধরিয়াই লওয়া যাইতে পারে। এখন উভয় পক্ষের পিতামাতার সম্মতি করাইতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি।

মাণিক বলিল, "বাবাকে তুমি বললে বাবা রাজী হবেন ত ?"

প্রভাস বলিল, "দেখ, তার চেয়ে বরং তুমিই বল, আমার বলাটা তত ভাল দেখায় না। হাজার হোক তোমার বাবা,- আমার মামা বই ত নয়! বাবায় মামায় ঢের তফাৎ।"

মাণিক বলিল, "সে আমি পারব না। তুমি গোড়া থেকেই বললে তুমিই প্রস্তাবটা করবে, এখন পিছুচ্ছ কেন ?"

প্রভাস প্রথমটা মাণিককে যে পরিমাণ উৎসাহ দিয়াছিল, কার্য্যকালে তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। মাণিকের পিতা নন্দলাল বাবু অত্যন্ত রাশভারি লোক। তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া কথা পাড়ায় বিলক্ষণ সাহসের প্রয়োজন।

এইরূপে ইতস্ততঃ করিতে করিতে সপ্তাহ খানেক কাটিল। মাণিক ও প্রভাস যখনই নির্জ্জনে থাকিত,—তখন আর দুজনের অন্য কথা নাই। পূর্ব্বে দুজনের মধ্যে গুরুশিষ্য গোছের যে একটা অনির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক ছিল, এখন তাহা ঘুচিয়া সখ্যে দাঁড়াইয়াছে।

একদিন মাণিক কুসুমের নামে একটা মস্ত কবিতা লিখিল। প্রভাস তাহা পড়িয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বলিল—স্বয়ং অনুভব করিয়া কবিতা না লিখিলে কি আর কবিতা! বলিল, ইহা কুসুমকে নিশ্চয়ই দেখান উচিত।

উত্তম চিঠির কাগজে লালকালীর বর্ডার টানিয়া, নীল কালী দিয়া মাণিক কবিতাটি নকল করিল। তাহার পর আবার অবসর খুঁজিয়া কুসুমের সঙ্গে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিল।

কুসুম কবিতা লইয়া পড়িল। কি বুঝিল সেই জানে! মাণিক বলিল, "কুসুম, তুমি এটি রাখবে?"

কুসুম বলিল, "রাখব বৈকি।"

মাণিক কুসুমের আগ্রহ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিল, "কারুকে দেখাবে না ত কুসুম?"

কুসুম প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কারুথ্‌কে নয়।"

"খুব লুকিয়ে নিয়ে যেও। কোথায় রাখবে?"

"কেন আমার বাক্সে?"

মাণিক নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী আসিল।

ওদিকে পরম সত্যবাদিনী কুসুম বাড়ী গিয়াই বলিল, "দিদি একটা কথা বলি শোন্‌।"

তাহার দিদির নাম নলিনী। সে ষোল বৎসরের, বিবাহিতা; স্বামীর প্রেমে ভরপূর—মনের সুখে হাস্য কৌতুকময়ী।

দিদি আসিলে কুসুম বলিল, "মেজদি একটা মজা দেখবি?"

"কি?"

কুসুম খামখানি বাহির করিয়া বলিল, "কারুকে বলবিনে?"

"কার চিঠি লা?" বলিয়া নলিনী ছোঁ মারিয়া খাম কাড়িয়া লইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল:—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।"

পড়িয়া নলিনী অবাক। পাতা উল্টাইয়া নাম খুঁজিল, কোনও নাম নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কোথা পেলি?"

"মাণিক দাদা দিয়েছে।"

"কে? ম্যানকা?"

"হ্যাঁ।"

নলিনী গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা কি হবে! তোকে এ সব লিখেছে কেন?"

কুসুম ভীত হইয়া বলিল, "তা কি জানি!"

"এ যে ভালবাসার কবিতা! তোদের ভালবাসা হয়েছে নাকি লো?"

কুসুম বলিল, "ম্যান্‌কা আমায় একদিন বলছিল যে আমি তোকে ভালবাসি।"

নলিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "আহা তা বেশ! ছেলেটির পছন্দ ভাল"—পড়িতে আরম্ভ করিল—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
দিবা রজনী
তব মুখখানি
মনে লই।"

পড়িয়া নলিনী হাসিয়া কুটিকুটি। বলিল—"দুনিয়ার আর মিল খুঁজে পেলে না, শেষে লিখলে কি না 'মনে লই'। তার চেয়ে 'চিঁড়ে দই' লিখলে ঢের বেশী সরস হত। কি বলিস্ কুস্‌মি? শোন দিকিন—

কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
তব মুখখানি,
দিবা রজনী
চিঁড়ে দই।

অর্থাৎ কিনা চিঁড়ে দই দেখলে, কারু কারু যেমন খাবার লোভ হয়, তোমার মুখখানি দেখলে,—আমারও সেই রকম—লোভ হয়।"—বলিয়া নলিনী খুব হাসিতে লাগিল।

হাসির শব্দে মা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "অত হাসছিস কেন? হয়েছে কি?"

নলিনী মার হাতে চিঠি দিয়া বলিল, "এই নাও মা, তোমার ছোট জামাই তোমার মেয়েকে কি লিখেছে দেখ।"

মা লেখার পানে চাহিয়া বলিলেন, "কথার ছিরি দেখ না! কি বলিস তার ঠিক নেই। কি এ?"

নলিনী মার কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, "ভালবাসার চিঠি। এত বড় মেয়ে হল, বিয়ে দিচ্ছ না,—তা মেয়ে নিজের বর নিজেই ঠিক ক'রে নিয়েছে।"

মা ত অবাক! বলিলেন, "কে লিখেছে এ সব?"

"সে পরে বলব। আগে শোনই না।" - বলিয়া মার হাত হইতে কবিতা লইয়া নলিনী পড়িতে আরম্ভ করিল—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
তব মুখখানি
দিবা রজনী
মনে লই।
শয়নে স্বপনে
কিম্বা জাগরণে
সদা সর্ব্বদা
চিন্তা করি তোমা
রূপ নিরুপমা
ওগো প্রেমদা।
ভাবিয়া ভাবিয়া
নিদ্রা তেয়াগিয়া
ফেলি অশ্রুজল।
যথা শুষ্ক তরু
হনু এবে সরু
দেহ টলমল।..

মা বাধা দিলেন। বলিলেন, "কি পাগলামি করছিস, রঙ্গ ভাল লাগে না। কে লিখেছে বল্ না?"

"চৌধুরীদের ম্যান্‌কা লিখেছে।"

"ম্যান্‌কা? আরে গেল যা! কি দস্যি ছেলে গো! এ কি বিপ্তে?"—বলিয়া মা কুসুমকে খুঁজিতে লাগিলেন, "কুস্‌মি, কুস্‌মি, কুস্‌মি কোথা গেলি?"

কুসুম গোলযোগ দেখিয়া পূর্ব্বেই চম্পট দিয়াছিল।

ক্রুদ্ধা জননী বাহির হইয়া কুসুমকে গেরেপ্তার করিলেন। বলিলেন, "এ কি রে শতেকখোয়ারী?"

কুসুম গোঁ হইয়া বলিল, "আমি কি জানি!"

"তুই জানিসনে ত কে জানে আবাগী?—খেয়ে খেয়ে দিনকের দিন হাতী হচ্ছেন আর এই সব বিপ্তে হচ্ছে! কি হয়েছে বল্?"

কুসুম বলিল, "হতভাগা লক্ষিছাড়া ম্যানকা আমায় দিলে ত আমি কি করব?—আমার বুঝি দোষ, বা রে!"

"কি বলেছে দেবার সময় তোকে?"

"বলেছে মাকে কি কাউকে দেখাসনে বাক্সতে লুকিয়ে রাখিস।"

মা তখন কুসুমকে অনেক জেরা করিলেন। জেরার শেষে কুসুম বলিল, "একদিন বাগানে ডেকে নিয়ে গিয়ে ম্যান্‌কা আমায় বললে কি, 'তোকে আমি আম পেড়ে দেবো তুই আমায় বিয়ে করবি?' 'দূর পোড়ার-মুখো' বলে আমি পালিয়ে এলাম।"

এই কথা শুনিয়া, রাগের মধ্যেও মার ওষ্ঠের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। শেষে তিনি বলিলেন, "শোন্ বলছি। ফের যদি ম্যান্‌কার ত্রিসীমানায় যাবি, কি ওর সঙ্গে কথা ক'বি কি খেলা করবি,—তা হলে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলব, বুঝেছিস?"

কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "বা রে! আমি কি করব? আমায় দিলে কেন?"

মা তখন সে কবিতা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া উনানে ফেলিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অহো, কবি সত্যই বলিয়াছেন—যথার্থ প্রণয়ের পথ কখনও মসৃণ হয় নাই। যে ভাল বাসিয়াছে, সেই কাঁদিয়াছে। প্রেম যে 'কেবলি যাতনাময়', তাহাতে যে 'কেবলি চোখের জল' এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

কুসুম ত বকুনি খাইয়াই নিস্তার পাইল, কিন্তু মাণিকলালের অদৃষ্টে আরও দুর্গতি লেখা ছিল।

মাণিকের পিতা নন্দ চৌধুরী গ্রামের ডাক্তার—খুব পশার। প্রাতে রোগী দেখিতে বাহির হন, যখন বাড়ী আসেন তখন প্রায় বারোটা। স্নান আহার করিয়া নিদ্রা যান।

সুতরাং প্রভাস ও মাণিক পরামর্শ করিল, বৈকালে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রভাস গিয়া কথাটা পাড়িবে।

দুই জনে বাহিরের ঘরে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। একটা প্রবল আশঙ্কায় ও অনিশ্চয়তায় দুই জনের মুখই কালিমাময়।

শেষে চারিটা বাজিল। শব্দ শোনা গেল, বিছানা হইতে নন্দ চৌধুরী হাঁকিলেন, "ওরে বুনো,—তামাক নিয়ে আয়।"

আরও কয়েক মিনিট গেল। তারপর কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভাস গিয়া মামাবাবুর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল।

নন্দ চৌধুরী বিছানার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। নিদ্রাভঙ্গে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ। নিম্নে একটি ক্ষুদ্র চৌকিতে গুড়গুড়ি রক্ষিত—ধূমপান করিতেছেন।

প্রভাস প্রবেশ করিয়া, বিছানার কাছে একটা চেয়ার ছিল তাহাতে বসিল। নন্দ চৌধুরী বলিলেন, "কি প্রভাস!" তাঁহার স্বর বৈকালিক নিদ্রার শ্লেষ্মাজড়িত।

প্রভাস কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল, "আজ্ঞে একটা কথা আজ আপনাকে বলব মনে করেছি।"

নন্দ চৌধুরী উৎসুক হইয়া, গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে খুলিয়া, প্রভাসের পানে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি ?"

প্রভাসের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল—কেন আসিলাম,—কেন এ জালে নিজেকে জড়াইলাম ?—কিন্তু আরম্ভ যখন করিয়াছে, আসরে নামিয়াছে, শেষ পর্যান্ত যাইতেই হইবে। সুতরাং বাক্যস্ফুরণ করিতে বাধ্য হইল। বলিল, "আমাদের মাণিকের জন্যে ভারি চিন্তিত হতে হয়েছে।"

"কেন ? কি হয়েছে ? কোন ব্যারাম-স্যারাম না কি ?" ডাক্তার মানুষ, ব্যাধির কথাটাই প্রথমে মনে হয়।

প্রভাস বলিল, "আজ্ঞে না, শারীরিক ব্যারাম নয়, মানসিক বটে।"

চৌধুরী পুনরায় গুড়গুড়ির নল মুখে লইয়া বলিলেন, "কি রকম ?"

"ও একটি মেয়ের সঙ্গে Loveএ পড়েছে।"

গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে একেবারে বিছানায় ফেলিয়া নন্দ চৌধুরী উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কি বললে ?"

প্রভাস তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া বিপদ গণিল। বলিল, "আজ্ঞে, একটি মেয়ের সঙ্গে প্রণয় হয়েছে।"

"প্রণয় হয়েছে ? সে আবার কি রকম ? ব্যাপারখানা কি ? কার সঙ্গে প্রণয় হয়েছে ?"

"আজ্ঞে, অতুল বাঁড়ুযোর যে কুসুমলতা ব'লে একটি মেয়ে আছে, তার সঙ্গে ও 'লভে' পড়েছে। তাই আপনাকে বলতে এসেছি, যদি ওর জীবনের সুখ চান, তবে কুসুমের সঙ্গে ওর বিবাহ দিন।"

নন্দ চৌধুরী শুনিয়া গম্ভীর হইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, স্বর একটু নামাইয়া বলিলেন, "কি রকম ক'রে 'লবে' পড়ল ?"

প্রভাস মনে মনে অত্যন্ত উৎসাহিত হইল। ভাবিল, তবে সন্তানের দুঃখে পিতার মন গলিয়াছে। বলিল, "আজ্ঞে, কি রকম করে পড়ল তা বলা বড় কঠিন,—তবে এ পর্য্যন্ত বলতে পারি যে আকর্ষণটা উভয়তঃ প্রবল।"

চৌধুরী বলিলেন, "উভয়তঃ প্রবল ?—বটে !"—বলিয়া তামাক

খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে করতে চায় ?"

মাথা নীচু করিয়া, ধীরে ধীরে প্রভাস বলিল, "আজ্ঞে, এই ত এক মাত্র স্বাভাবিক পরিণাম। মাণিক বলেছে, যদি বিয়ে না হয়, তা হলে ওর জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে।"

চৌধুরী বলিলেন, "মরুভূমি ? ওঃ!"—বলিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

প্রভাস একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "প্রথম প্রণয় প্রায়ই ভারি গভীর হয়। তাকে বাধা দিতে যাওয়া অনেক সময় সর্ব্বনাশ।"

চৌধুরী বলিলেন, "ম্যান্‌কাকে ডাক।"

প্রভাস উঠিয়া পড়িবার ঘরে গেল। দেখিল, হাতে মুখ ঢাকা দিয়া মাণিক শুইয়া আছে। একটু হাসিমুখে বলিল, "মাণিক, যাও ভাই মামাবাবু ডাকছেন।"

মাণিক বলিল, "কি রকম বুঝলে ?"

"এ পর্য্যন্ত ত খুবই আশাপ্রদ। খুব সহৃদয় ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।"

মাণিকের কিন্তু বিশ্বাস হইল না। সত্যই কি এত সৌভাগ্য তাহার হইবে ? বলিল, "চল তবে।"

প্রভাস বলিল, "তুমি একা যাও। কারণ এ সময় কোনও তৃতীয় ব্যক্তির থাকাটা ঠিক নয়। বিষয়টা ভারি—কি বলে গিয়ে—ইয়ে কি না।"

মাণিক বলিল, "না ভাই তুমি এস,—নইলে আমার ভারি ভয় করবে।"

প্রভাস বলিল, "আচ্ছা, মিনিট দশ পরে আমি যাচ্ছি"—বলিয়া মাণিককে ঠেলিয়া দিল।

মাণিক প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার পিতা আসির কাছে দাঁড়াইয়া একটা পাকা গোঁফ উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মাণিকের ছায়া আসিতে পড়িল।

নন্দ চৌধুরী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মাণিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর এগজামিন কবে ?"

মাণিক বলিল, "আর বারো দিন আছে।"

"কি রকম তৈরি হল ?"

"আজ্ঞে, হয়েছে এক রকম।"

"পড়াশুনো করছিস বেশ মন দিয়ে, না খালি খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছিস ?"

"আজ্ঞে না খেলা বেশী করিনে।"

"তবে কি করিস ? 'লবে' পড়েছিস নাকি শুনলাম ?"

মাণিক তাঁহার স্বর ও ভঙ্গিমা দেখিয়া উত্তর করিতে সাহস করিল না। দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

তাহার পিতা ধীরে ধীরে তাহার কাছে সরিয়া আসিলেন। আসিয়া, বাম হস্ত দ্বারা মাণিকের দক্ষিণ কর্ণটি ধারণ করিলেন। করিয়া বলিলেন, "উত্তর দিচ্ছিসনে যে ?"

মাণিক কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কথা বাহির হইল না।

তাহার পিতার রক্ত চক্ষু দুইটা ঘুরিতে লাগিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে লাগিল।

ঘূর্ণায়মান চক্ষু স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "ইষ্টুপিড শূয়োর! আজ বাদে কাল এগজামিন—লেখা গেল পড়া গেল, লব্ হচ্চে ?"—বলিয়া ঠাস্ ঠাস্ করিয়া তাহার গণ্ডদেশে কয়েকটা চড় কষাইয়া দিলেন।

প্রভাস এই সময়ে দুয়ারের কাছ বরাবর আসিয়াছিল। চড়ের শব্দ শুনিয়া সে অবিলম্বে চম্পট দিল।

মাণিক দুই হাতে মুখ ও চক্ষু ঢাকিয়া অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

নন্দ চৌধুরী তখন বালককে ছাড়িয়া বিছানায় আসিয়া বসিলেন। বলিতে লাগিলেন, "এ ক'দিন দিবারাত্তির কেবল প্রভাসের সঙ্গে গুজ্ গুজ্ ফুস্‌ফুস্ হচ্চেই হচ্চেই,— আমি ভাবি ব্যাপারটা কি,—এরা কুইনের রাজ্য নেবারই মতলব করছে—না কি করছে ? হতভাগা পাজি নচ্ছার হনুমান! লবে পড়া হয়েছে! মরুভূমি হয়ে যাবে ? এত কথা শিখলে

কোথা তাই ভাবি। আমরা বুড়ো হয়ে মরতে চল্লাম, এত কথা ত জানিনে! পড়াশুনোর নাম নেই! খাবি কি এর পরে? আমি এই সারা দুপুর রোদ্দুরটা মাথায় ক'রে, রুগীর নাড়ী টিপে বেড়াচ্ছি, দুটো পয়সার জন্যে মুখে রক্ত উঠে মরছি—যতদিন বেঁচে আছি ততদিন মন দিয়ে পড়ে শুনে নিজের কায কিনে নে—তা নয় 'লবে' পড়েছেন ছেলে আমার! আর প্রভাসটা যে কলেজে লেখাপড়া শিখে এত বড় বাঁদর হয়েছে তা ত জানতাম না! ওকালৎনামা নিয়ে এসেছ! আরে গেল না!—ফের যদি ওসব পাগলামি শুনতে পাই ত জুতিয়ে পিঠ ছিঁড়ে দেবো।"

অতঃপর মাণিক কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

•

ডাক্তার বাবুর চিকিৎসা আশু ফলপ্রদ হইল। মাণিক ছেলেটিকেও অতি সুবোধ বলিতে হইবে। উপন্যাসের অনুকরণে প্রেমে পড়িয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসের অনুসারে গৃহত্যাগ করিল না—বিষও খাইল না। বিষ খাইল না বটে—তবে কুসুমের বিবাহের সময় লুচি খাইল বিস্তর। এত খাইল যে তাহার পরদিন অসুখ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে সপ্তাহ খানেক স্কুলে গেল না। প্রভাস চলিয়া গিয়াছিল। প্রেমিকের আদর্শ খর্ব্বতার জন্য মাণিকের কাহারও নিকট জবাবদিহি করিবারও রহিল না। তাই অসুখ দুই দিনেই ভাল হইলে—বাকী দিনগুলির অধিকাংশ সময় মাণিক বৃক্ষের শাখায় শাখায় লম্ফ দিয়া অতিবাহিত করিল।

বলবান জামাতা

১

প্রথম পরিচ্ছেদ

নলিনীবাবু আলিপুরের পোষ্টমাষ্টার। বেলা অবসানপ্রায়; আপিসে নলিনীবাবু ছটফট করিতেছিলেন। আশ্বিন মাস,—সম্মুখে পূজা,—নলিনীবাবু ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও হেড আপিস হইতে কোনও হুকুম আসিল না। যদি আজ পাঁচটার মধ্যেও হুকুম আসে, তবে আজই মেলে এলাহাবাদ রওনা হইবেন। এলাহাবাদে তাঁহার শ্বশুরালয়। নলিনীবাবু এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইবেন। জিনিষপত্র কিনিয়া, বাক্স তোরঙ্গ সাজাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু এখনও ছুটির হুকুম আসিল না। বেলা চারিটা বাজিল। হঠাৎ টং টং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বড় আশা করিয়া নলিনীবাবু টেলিফোনের নল মুখে দিয়া বলিলেন—"Yes?"

কিন্তু হায়, ছুটির হুকুম আসিল না। একটা মনিঅর্ডার সম্বন্ধে কি গোলমাল ঘটিয়াছিল, তাহারই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন।

নলিনী হতাশ হইয়া আবার চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দুই একটা টুকীটাকী কার্য্যের পর পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি তাঁহার স্ত্রীর লেখা। ইতিপূর্ব্বেই সেখানি বহুবার পাঠ করা হইয়াছিল; আবার পড়িলেন—

(একটি পাখীর ছবি)

নিম্নে সোনার জলে মুদ্রিত—

"যাও পাখী যেথা মম আছে প্রাণপতি"

প্রিয়তম,

তোমার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া মনপ্রাণ শীতল হইল। নাথ, এতদিনের পর কি দীর্ঘ-বিরহের অবসান হইবে? তোমার চাঁদমুখখানি দেখিবার জন্য আমার চিত্তচকোর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। আজ দুই

বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এখনও একদিনের তরে পতিসেবা করিতে পাইলাম না। ছুটি হইলে শীঘ্র চলিয়া আসিও। দুঃখিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল। দিনাজপুর হইতে মেজদি আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কতদিনে তোমার ছুটি হইবে? পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে পারিবে কি? আজ তবে আসি। মনে রেখো, ভুল না।

তোমারই সরোজিনী

নলিনীবাবু পত্রখানি উলটিয়া পালটিয়া পাঠ করিলেন। শেষে পুনর্ব্বার তাহা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

পাঁচটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আজও ছুটির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। নলিনীবাবু একটি মৃদু রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কার্য্যে মন দিতে চেষ্টা করিলেন। যাহা হউক, আজ চতুর্থী মাত্র। যদি আগামী কল্যও ছুটি আসে, তবুও পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে সমর্থ হইবেন।

পাঁচটা বাজিতে আর যখন দুই এক মিনিট বাকী আছে, তখন আবার টেলিফোনের কল-ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। আবার নলিনীবাবু নলে মুখ দিয়া বলিলেন—"Yes?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছুটি!—ছুটি!—ছুটি!—নলিনীবাবু দুই সপ্তাহের বিদায় পাইয়াছেন। ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া আজই রাত্রে নলিনীবাবু রওনা হইতে পারিবেন।

সরোজিনীর পত্রে প্রকাশ, 'দিনাজপুরের মেজদি' আসিয়াছেন। ইঁহার আসিবার কথা পূর্ব্বেই নলিনীবাবু অবগত ছিলেন, এবং সেই জন্য বিশেষতঃ, এবার এলাহাবাদ যাইবার জন্য তাঁহার এত অধিক আগ্রহ 'দিনাজপুরের মেজদি'র উপর তাঁহার বিলক্ষণ রাগ আছে,—তাই তাঁহার সহিত এখন একবার সাক্ষাতের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত। কিন্তু সে ব্যাপারটি কি, বুঝাইতে হইলে, মেজদির একটু পরিচয় এবং নলিনীর বিবাহ বাসরের একটু ইতিহাস বিবৃত করা আবশ্যক।

মেজদির স্বামী মস্ত সাহেব লোক,—তিনি দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। মেজদির নামটির উল্লেখ করিলেই সকলেই তাঁহাকে অনায়াসে চিনিতে পারিবেন। শ্রীমতী কুঞ্জবালা দেবী স্বাক্ষরিত ওজস্বিনী স্বদেশী কবিতাগুলি বর্ত্তমান সময়ের মাসিক পত্রাদিতে কে না পাঠ করিয়াছেন? সৌভাগ্যবশতঃ ফুলার সাহেব বাঙ্গালা জানেন না, জানিলে এতদিন কুঞ্জবালার স্বামীর চাকুরিটি লইয়া টানাটানি হইত।

কুঞ্জবালা বিদুষী, সুতরাং বলাই বাহুল্য তাঁহার রসনাটি ক্ষুরধার। তিনি ইংরাজিতে শিক্ষিতা, সুতরাং তাঁহার 'আইডিয়াল' সর্ব্ববিষয়ে সাধারণ বঙ্গললনা হইতে বিভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, একবার তাঁহার এক দেবর এক শিশি সুগন্ধি কিনিয়া আনিয়াছিল। দেখিয়া কুঞ্জবালা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কার জন্যে এনেছিস?"

"নিজে মাখব।"

"দূর—ও জিনিষ ত কেবল স্ত্রীলোকে আর বাবুতে মাখে; পুরুষ মানুষ কখনও সুগন্ধি ব্যবহার করে?"

বালক দেবরটি, বউদিদির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয়া ভাল মানুষের মত বলিয়াছিল, "কেন? বাবুরা কি পুরুষ নয়?"

নলিনীবাবুর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার মূর্ত্তিটি দিব্য গোলগাল নন্দদুলালি ধরণের ছিল। গাল দুইটি টেবো টেবো, হাত দু'খানি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠদেশের কোমল অস্থিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন। শীলতার অনুমোদিত না হইলেও, বিবাহ-বাসরে কুঞ্জবালা নলিনীর দেহখানির প্রতি বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর কাব্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন:-

নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম,
কোমল কোমল কোমল অতি
যেমন কোমল নাম।
যেমন কোমল, তেমনি বিকল,
তেমনি আলস্য ধাম,—

নলিনীর মত চেহারা তাহার

নলিনী যাহার নাম।

একটি শ্লেষবাক্য মনুষ্যকে যেমন সচেতন করে, দশটি উপদেশবচনেও সেরূপ হয় না। সেই শ্লেষবাক্য যদি সুন্দরী-মুখনিঃসৃত হয় এবং সেই সুন্দরী যদি সম্পর্কে শ্যালিকা হন, তাহা হইলে একটি শ্লেষবাক্যের ফল শতগুণ সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

বিবাহের পর নলিনীবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও সপরিবারে কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিদুষী শ্যালিকার ব্যঙ্গ নলিনী কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

একদা সন্ধ্যায় পোষ্ট আপিস হইতে বাসায় ফিরিয়া, ঈজি চেয়ারে পড়িয়া, নলিনীবাবু ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে একটা মতলবের উদয় হইল। কেন, তিনি ত চেষ্টা করিলেই এ কলঙ্ক মোচন করিতে পারেন,—শরীর পুরুষোচিত দৃঢ় করিতে পারেন। পরদিন বাজার হইতে তিনি স্যাণ্ডোর ডাম্বেলাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া, বাড়ীতে রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে যত্নবান হইলেন। নিজ দৈনিক খাদ্যতালিকা হইতে মিষ্ট, দুগ্ধ, ঘৃত ও তণ্ডুল যথাসম্ভব কাটিয়া দিয়া, তত্তৎস্থানে রুটি, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি যোজনা করিলেন। প্রথম প্রথম পাঁচ সাত মিনিটের অধিক ব্যায়াম করিতে পারিতেন না,—ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অভ্যাসের গুণে ক্রমে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর এইরূপ করিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিলক্ষণ দৃঢ় হইল। তখন স্বীয় মূর্ত্তি আরও অধিক মাত্রায় পরুষ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি দাড়ি কামানো বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই একটি শিকারী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামে গিয়া হংস, বন্যশকরাদি শিকার করিতেও অভ্যাস করিলেন।

এইরূপ করিয়া দুই বৎসর কাটিয়াছে। এখন আর সে নলিনী নাই। এখন তাঁহার কপোলদেশ রসাশূন্য, চিবুকাগ্রভাগ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত, হস্তপদাদি অস্থিবহুল হইয়াছে; ফলতঃ তিনি নামের এখন সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় একবার কুঞ্জবালার সহিত সাক্ষাৎ

আঁকাঙ্ক্ষিত। হায়! নামটাও যদি পরিবর্ত্তন করিবার উপায় থাকিত। নলিনীবাবু মনে করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র জন্মিলে তাহার নাম রাখিবেন —খুব একটা ভীষণ রকমের—কি নাম রাখিবেন এখনও স্থির করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা দুইটার সময়, নলিনীবাবু এলাহাবাদ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পায়জামা ও লম্বা পাঞ্জাবী কোট, মস্তকে পাগড়ী। হস্তে একটি বৃহদাকার যষ্টি দেখা যাইতেছিল। জিনিষপত্রের সঙ্গে একটি বন্দুকের বাক্স। ইচ্ছা ছিল ছুটিতে কিঞ্চিৎ শিকারও করিয়া যাইবেন।

ষ্টেশনে নামিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—কৈ, কেহ ত তাহাকে লইতে আসে নাই! গত কল্য যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি যে শ্বশুর মহাশয়ের নামে চারি আনার টেলিগ্রাম* একটি পাঠাইয়া ছিলেন, তাহা পৌঁছে নাই কি? কুলি ডাকিয়া, জিনিষপত্র লইয়া, নলিনীবাবু ষ্টেশনের বাহিরে গেলেন। একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্রবাবু উকিলকা বাসা জানতা?"

গাড়োয়ান উত্তর করিল, "হাঁ বাবু—আইয়ে।"

"চলো"—বলিয়া নলিনী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

এলাহাবাদে নলিনীবাবু পূর্ব্বে কখনও আসেন নাই: এমন কি এই তিনি প্রথম বঙ্গদেশের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছেন। পশ্চিমের সহরের নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি চলিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ী একটি বৃহৎ কম্পাউণ্ডযুক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই বহির্ব্বাটী, বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের বালিকা খেলা করিতেছিল। বারান্দার নিম্নে, বামে, একটা কূপ, সেখানে বসিয়া একজন পশ্চিমা ভৃত্য সজোরে একটা কটাহ মাজিতেছিল।

*দিনকতক এইরূপ টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু এগুলি ছিল চিঠির অধম।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, সেই ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া নলিনী বাবু বলিলেন—"এই মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাড়ী ?"

"হাঁ বাবু।"

"বাবু আছেন ?"

"না। তিনি কিদার বাবু উকিলের বাড়ী পাশা খেলতে গিয়েছেন।"

"আচ্ছা—ভিতরে খবর দাও,—বল জামাইবাবু এসেছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র, যে মেয়েটি বারান্দায় খেলা করিতেছিল, সে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া বলিল, "ওগো, তোমাদের জামাইবাবু এসেছেন !"

ভৃত্যটির নাম রামশরণ। সে এই কথা শুনিয়া, দন্ত বিকশিত করিয়া বলিল, "আরে ! জামাইবাবু ?"—বলিয়া সে চটপট হাত ধুইয়া ফেলিয়া, নলিনীকে এক দীর্ঘ সেলাম করিল।

তাহার পর রামশরণ জিনিষপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া ফেলিল। এদিকে বাড়ীর ভিতর হইতে নানা আকারের বালক বালিকাগণ আসিয়া উঁকি মারিয়া জামাই দেখিতে লাগিল।

রামশরণ নলিনীবাবুকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল, "বাবু চান করা হোবে কি ?"

নলিনী বলিল, "হাঁ—স্নান করব। তুমি গোসলখানায় জল দাও।"

এই সময় একজন বাঙ্গালি ঝি আসিয়া নলিনীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "ভাল ছিলেন ত ?"

"হাঁ ভাল ছিলাম। তোমরা কেমন ছিলে ?"

হাসিয়া ঝি বলিল, "যেমন রেখেছেন ! আজ ছ'মাস আমি এ বাড়ীতে চাকরী করছি, দিদিমণিকে রোজ জিজ্ঞাসা করি, 'জামাইবাবু কবে আসবেন গো ?—জামাইবাবু কবে আসবেন গো ?'—দিদিমণি বলেন, 'এই ছুটি হলেই আসবেন।' তা এতদিনে মনে পড়ল সেও ভাল। আপনি চান করে ফেলুন। মা ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি জলটল খাবেন, না ভাত চড়িয়ে দেওয়া হবে ?"

নলিনী মোগলসরাই ষ্টেশনে, কেলনারের কল্যাণে, প্রাতরাশ সমাধা

করিয়া আসিয়াছিলেন; বলিলেন, "এখন ভাত চড়াতে হবে না,— জলটল কিছু খাব এখন।".

ঝি বলিল, "আচ্ছা তবে চান করে ফেলুন। পরে আপনাকে একটি নতুন জিনিস দেখাব। আমার বখশিসের কি গহনা টহনা এনেছেন বের করে রাখুন।"—বলিয়া ঝি নলিনীর প্রতি রমণীজন-সুলভ কটাক্ষ-পাত করিয়া, মৃদু হাস্য করিল।

রামশরণ বলিল, "তুই বখশিস লিবি, হামি বুঝি বখশিস লেব না?"

নলিনী ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল গম্ভীরভাবে ঘাড়টি নাড়িতে লাগিল।

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া নলিনী দেখিল, কতকগুলি বালক বালিকা তাহার বন্দুকের বাক্স খুলিয়া বন্দুকটি বাহির করিয়াছে। সকলে মিলিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি যোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহাদের হাত হইতে বন্দুকটি লইয়া নলিনী সাবধানে স্থানান্তরে রাখিয়া দিল। এমন সময় পূর্ব্বকথিত ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কোলে একটি অল্প কয়েক-মাস বয়স্ক শিশু। তাহার মুখখানি সদ্য পরিষ্কৃত, চক্ষুযুগল এই মাত্র কজ্জলিত, মাথার চুলগুলি সাবধানে আঁচড়াইয়া দেওয়া।

ঝি শিশুটিকে হাতে করিয়া তুলিয়া নাচাইয়া বলিল, "দেখ জামাই-বাবু দেখ, কেমন সোনার চাঁদ হয়েছে। যেন রাজপুত্তুরটি। নাও— একবার কোলে কর।"

নলিনী কখনই ছোট শিশু পছন্দ করিত না। তথাপি ভদ্রতার খাতিরে বলিল, "বাঃ—বেশ ছেলেটি ত!"—বলিয়া কোলে লইল।

ঝি বলিল, "বেশ ছেলেটি বললেই হয় না, এখন কি দিয়ে মুখ দেখবে দেখ।"

নলিনী পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া শিশুর বদ্ধমুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

কলিকাতার ঝি তদ্দর্শনে গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা! ওমা! ওকি? লোকে বলবে কি গো? রূপো দিয়ে সোনার চাঁদের মুখ দেখা!"

সমবেত বালক বালিকাগণ খিলখিল করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল।

অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া, আর কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া, নলিনী বলিল, "সোনা ত আনি নি।" মনে মনে স্বীয় পত্নীর উপরও রাগ হইল। তাহার কি উচিত ছিল না পত্রে নলিনীকে লেখা যে, অমুকের সন্তান হইয়াছে, তাহার মুখ দেখিবার জন্য একটা গিনি আনিও?

ঝি বলিল, "সে কথা শোনে কে? তা হলে আজই সেকরা ডেকে সোনার গহনার ফরমাস দাও। ছেলের বাপ হলেই হয় না!"

নলিনীর বুদ্ধিসুদ্ধি ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছিল; শেষের এই কথা শুনিয়া সে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। 'ছেলের বাপ হলেই হয় না'—ইহার অর্থ কি? তবে নলিনীই কি ছেলের বাপ না কি?

শিশুকে ঝির কোলে ফিরাইয়া দিয়া, সভয়ে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি কবে হল?"

ঝি পুনর্ব্বার গালে হাত দিয়া বলিল, "অবাক কল্লে যে! তোমার ছেলে কবে হল তুমি জান না, পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করছ?"

যে দুইটি বালক বালিকা উহারই মধ্যে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত ছিল, তাহারা ঝির এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্ষুদ্রতর বালক বালিকাগণ তাহাদের দেখাদেখি, উচ্চতর হাস্য করিয়া মেঝেতে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

সদ্যস্নাত নলিনীর ললাট তখন ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা প্রাণপণে করিতেছে। এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

এই সময়ে একটি বালিকা আসিয়া, নলিনীর হাতে একটা গেলাস দিয়া বলিল, "জামাইবাবু! একটু সরবৎ খাও।"

নলিনী গেলাসে মুখ দিয়া দেখিল, জলটা লবণাক্ত। গেলাস নামাইয়া রাখিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার প্রতি এই পিতৃত্ব আরোপটাও, জামাই ঠাট্টারই একটা অংশ হইবে। এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া, নলিনীর মন একটু শান্ত হইল। তাহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল আবার সমতা প্রাপ্ত হইল।

সেই বৈঠকখানার একটা কোণে, একটা কবাট খুলিবার শব্দ হইল। কবাটের সম্মুখস্থিত পর্দা অপসৃত করিয়া রামশরণ ভৃত্য বলিল, "বাবু আসুন—জল খাওয়া দেওয়া হয়েছে।"

নলিনী চাহিয়া দেখিল, অন্দর মহলের একটি কক্ষ দৃশ্যমান। উঠিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষের মধ্যস্থলে সুন্দর কার্পেটের আসন পাতা রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে রূপার রেকাবী, বাটী, গেলাস ভরা নানাবিধ খাদ্য ও পানীয়। নলিনী ধীরে ধীরে আসনখানির উপর উপবেশন করিয়া জলযোগে মন দিল।

এমন সময় কক্ষান্তর হইতে মলের ঝুমঝুম শব্দ উত্থিত হইল। একটি ক্ষুদ্র বালিকা দ্বারপথে মুখ দিয়া বলিল, "মেজদি আসছেন।"

নলিনী বুঝিল, কুঞ্জবালা আসিতেছেন। নিজ দক্ষিণ হস্তের আস্তিন সে ভাল করিয়া গুটাইয়া লইল। কুঞ্জবালা আসিয়া দেখুন, তাহার হাতের কব্জী এখন আর সুগোল নহে, মাংসল নহে, পরন্তু তাহা সুস্পষ্ট অস্থি ও শিরায় সমাকীর্ণ।

মলের শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল।

"কি ভাই, এতদিনে মনে পড়ল?"—বলিতে বলিতে যুবতী আসিয়া কক্ষমধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।

কিন্তু তাহা একমুহূর্তের জন্য মাত্র। চারি চক্ষে মিলিত হইতেই, সেই মহিলা একহাত ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

নলিনী দেখিল, তিনি কুঞ্জবালা নহেন।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে দুই তিনটি রমণীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর নলিনীর কর্ণে আসিল—

"কি লো, পালিয়ে এলি যে?"

"ওমা, ও যে অন্য লোক!"

"অন্য লোক কি লো? আমাদের শরৎ নয়?"

"না, শরৎ হবে কেন?"

"কে তবে?"

"আমি জানি?"

"এ কি কাণ্ড? জোচ্চোর নাকি?"

"যে রকম চোয়াড়ে চেহারা, আশ্চর্য্য নয়।"

"ওমা এ কি কাণ্ড! জামাই সেজে কে এল?"

একজন বালকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "একটা বন্দুক নিয়ে এসেছে।"

"আঁা—ওমা, কি সর্ব্বনাশ হল গো? ওরে রামশরণা—রামশরণা—কোথা গেলি? যা, শীগগির বাবুকে খবর দে।"

রমণীগণের দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল। তাহার পর নলিনী আর কিছু শুনিতে পাইল না।

এই সময়ের মধ্যে, অদূরস্থিত একটি পুস্তকের আলমারির প্রতি নলিনীর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সারি সারি বাঁধান ল-রিপোর্ট; প্রত্যেক খানির নিম্নে সোনার জলে নাম লেখা—এম, এন, ঘোষ।

তখন সমস্ত ব্যাপার নলিনী দিনের আলোকের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহার শ্বশুরের নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি মহেন্দ্র নাথ ঘোষ। তবে সে ভ্রমক্রমে অন্য লোকের শ্বশুরবাড়ীতে চড়াও করিয়াছে।

নলিনী তখন মনে মনে হাস্য করিতে করিতে, নিশ্চিন্তমনে, একে একে জলখাবারের পাত্রগুলি খালি করিয়া ফেলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এদিকে রামশরণ ভৃত্য উর্দ্ধশ্বাসে বাবুকে খবর দিতে ছুটিল। কেদার বাবু উকীলের বাসায়, ছুটির সময়, প্রায়ই পাশা খেলার আড্ডা জমিয়া থাকে। অদ্য এখানে বড় মহেন্দ্রবাবু, ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর আসল শ্বশুর) এবং অন্যান্য অনেকগুলি উকীল সমবেত হইয়াছেন।

পাশা খেলা চলিতেছিল, এমন সময় ঝড়ের মত আসিয়া রামশরণ সেখানে প্রবেশ করিল। নিজ প্রভুকে দেখিয়া বলিল, "বাবু—বাবু—জল্‌দি বাড়ী আসুন—"

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহর গাজীপুর, মহল্লা গোরাবাজারে, রাম অওতার নামক একটি লালাজাতীয় যুবক বাস করে। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। লোকটার কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখাপড়া জানা আছে। কয়েকবার উপর্য্যুপরি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া, এখন সে ঘরে বসিয়া আছে।

বৈশাখ মাস। সমস্ত দিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর এখন সন্ধ্যাবেলা একটু শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হস্তিদন্তের বোলাযুক্ত এক জোড়া খড়ম পায়ে দিয়া, নগ্নগাত্রে, রাম অওতার তাহাদের সদর বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য একটি চেয়ার আনিয়া দিল। রাম অওতার উপবেশন করিয়া বলিল, "চতুরি—ভাঙ তৈয়ারী হইয়াছে? লইয়া আয়।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চতুরি ওরফে চতুর্ভুজ, একটি রূপার গেলাসে করিয়া গোলাপ দেওয়া সিদ্ধি আনিয়া দিল। রাম অওতার অবস্থাপন্ন লোক। বাড়ীটি ঠিক সদর রাস্তার উপর। স্থানটা বাজার হইতে কিছু দূরে, সুতরাং কিছু নিরিবিলি। পথচারী লোক বেশী নাই, কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানা এক্কা ঝম্ ঝম্ শব্দ করিয়া যাইতেছে। রাস্তার মোড়ে একটি শিরীষ গাছ—তাহাতে অজস্র কোমল ফুল ধরিয়াছে। অপর পার্শ্বে মিউনিসিপালিটির একটি লণ্ঠন ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

রাম অওতার বসিয়া আরাম করিয়া সিদ্ধি পান করিতে লাগিল। সহসা অদূরে চাঁচা গলায় শব্দ উত্থিত হইল—"গুলাব-ছড়ী—"

গুলাব-ছড়ি-ওয়ালা তীব্র কেরোসিনের আলোক সহ পসরা স্কন্ধে লইয়া, বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া হাঁকিল—

ক্যা মজাদার গুলাব-ছড়ী !

যো খাওয়ে— মজা পাওয়ে ;
যো চাখ্‌খে— ইয়াদ্ রাখ্‌খে ;
গুলাব-ছড়ী !

বাটীর মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক বাহির হইয়া আসিল। রাম অওতারের কাছে আসিয়া বাহানা ধরিল, "ভাইয়া, আমি গুলাব-ছড়ী খাইব।"

একথা শুনিবামাত্র ফিরিওয়ালা রাস্তায় দাড়াইয়া, বারান্দার উপর তাহার পসরা নামাইল। বালক মোহনলালের প্রতি চাহিয়া বলিল, "গুলাব-ছড়ি, নানখাটাই, সোহন হালুয়া,—কি লইবে বল ?"

বালক গুলাব-ছড়িরই বেশী পক্ষপাতী—তাহাই কয়েকটা ক্রয় করিল। ফিরিওয়ালা স্বীয় কক্ষতল হইতে একখানা হিন্দী সংবাদপত্র বাহির করিয়া, তাহার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া, গুলাব-ছড়িগুলি জড়াইয়া মোহনলালের হাতে দিল। তাহার পর পসরা উঠাইয়া লইয়া, পূর্ব্ববৎ কড়িমধ্যম স্বরে 'গুলাব-ছড়ি' হাঁকিতে হাঁকিতে প্রস্থান করিল।

মোহনলাল পরম আনন্দে বারান্দাময় নৃত্য করিতে করিতে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভ্রাতার কাছে আসিয়া ছিন্ন কাগজটা দেখাইয়া বলিল, "দেখ ভাইয়া, একটা হাঁথীর তসবীর।"

রাম অওতার কাগজখানি হাতে লইয়া দেখিল, একটা হস্তীমার্কা ঔষধের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তাহার পার্শ্বেই যাহা দেখিল, তাহাতে রাম অওতারের কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে রহিয়াছে— "বিবাহের বিজ্ঞাপন।"

বাম হস্তে সিদ্ধির গেলাস ধরিয়া, দক্ষিণে ছিন্ন কাগজখানি লইয়া রাম অওতার বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিল। আলোকের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল :—

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের জন্য একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র

মহাদেও ধূমপান করিতে করিতে বলিল, "লালা মুরলীধর ত নক্‌লে বদলি হইয়া গিয়াছে। চিঠি খোল্, দেখ্ কি সমাচার।"

কাহ্নাইয়া বলিল, "মুরলীধরকে ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইবে না?"

মহাদেও বলিল, "আরে,—কি সমাচার সে ত আগে দেখিতে হইবে! খোল্,—পড়্।"

কাহ্নাইয়ালাল গুরুজীর আদেশমত পত্র খুলিয়া পাঠ করিল।

মহাশয়,

সংবাদপত্রে আপনার কন্যাবিবাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি। আমি একজন সদ্বংশীয় কায়স্থ যুবক। আমার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। আমি এলাহাবাদ কলেজে বি-এ শ্রেণী অবধি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে পীড়াক্রান্ত হওয়ায় পাস করিতে পারি নাই। আমি জাতিভেদ মানি না। বিলাত যাইবার জন্য আমার বাল্যকাল হইতেই বাসনা। যদি মহাশয় আমাকে আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন, তবে আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি বাল্যবিবাহের বিরোধী; একারণে অদ্যাপি বিবাহ করি নাই। আমি সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী। আজ্ঞা পাইলে আমি মহাশয়ের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করি। যদি কুমারীর একখানি ফটোগ্রাফ থাকে ত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

লালা রাম অওতার লাল

মহল্লা গোরাবাজার, শহর গাজিপুর।

পত্র শুনিয়া মহাদেও মিশ্র হাসিতে লাগিল। বলিল, "এ ত বড় তামাসা! সে মেয়ের ত কবে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

"বলিতেছে যে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম। সে কি?"

মহাদেও বলিল, "জান না? লালা মুরলীধর অখ্‌বারে লুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল কিনা। উহারা বরম্‌সমাজী লোক,—উহাদের সঙ্গে ত ভাল কায়েথ কিরিয়া করম করিবে না। তাই লুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল।"

"আমি ত শুনিয়াছি যে কায়েথের সঙ্গেই বিবাহ হইয়াছে।"

"হাঁ হাঁ—কায়েথ বটে, কিন্তু বিলাতে গিয়া বালিষ্টর হইয়া আসিয়াছিল —কায়েথ বটে, বড় ঘরানাও বটে। লুটিস্ পড়িয়া সে সময় আরও

অনেক লোক আসিয়াছিল, কিন্তু লালা মুরলীধর বলিল, আমি যখন বালিষ্টরি পাস করা জামাই পাইতেছি তখন আর কাহাকেও দিব না। এই বাড়ীতেই ত বিবাহ হইল। সে আজ তিন বৎসরের কথা।"

কাহ্নাইয়ালাল ঘাড়টি নাড়িয়া বলিল, "ঠিক ঠিক।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "ঐ যে লিখিয়াছে ফোটুগিরাপ পাঠাইতে, সে কি?"

মিশ্র বলিল, "জান না? ঐ যে তসবীর হয়; একটা বাক্স থাকে, তাতে একটা সিসা লাগানো থাকে; মানুষকে সমুখে দাঁড় করাইয়া দেয় আর ভিতরে তসবীর উঠে; তাহাকেই ফোটুগিরাপ বলে।"

কাহ্নাইয়ালাল শুনিয়া বলিল, "ওঃ হো ঠিক ঠিক। এইবার মালুম হইয়াছে। তবে একটা ভাল শিকার জুটিয়াছে। উহাকে চিঠি লিখিয়া আনান হউক।"

মহাদেও মিশ্র বলিল, "তাহার কাছে আর কি মিলিবে? দুই চার দশ টাকা মিলিবে কি না সন্দেহ!"

কাহ্নাইয়ালাল বলিল, "না। সে যখন সাদি করিবে বলিয়া আসিবে, তখন নিশ্চয়ই সোণার ঘড়ি চেন আংটি লাগাইয়া আসিবে। নিজের না থাকিলে অন্যের চাহিয়া লইয়া আসিবে। তাহাকে আসিতে লিখি। কেবল ফোটুগিরাপটার কি করি?"

মহাদেও বলিল, "সে জন্য ভাবনা কি? ফোটুগিরাপ বাজারে অনেক মিলিবে। চৌকে যে মহম্মদ খানের দোকান আছে কি না, সেখানে পার্সী থিয়েটর দলের অনেক খাপসুরৎ খাপসুরৎ আউরতের তসবীর আছে। সেই একখানা কিনিয়া পাঠাইলেই হইবে।"

পরামর্শ তখনই স্থির হইয়া গেল। ইহাও স্থির হইল যে, এ বাড়ীতে আনা হইবে না, তাহা হইলে পরে পুলিশে সন্ধান পাইতে পারে। অন্য একটা বাড়ী সাজাইয়া, সেইখানে লইয়া গিয়া, কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। এক পেয়ালা ভাঙ, তাহার সঙ্গে একটু ধুতুরার রস—আর কিছুই করিতে হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নকাল। গোরাবাজারের সেই বৈঠকখানাটিতে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় রাম অওতার ধূমপান করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে রাজপথের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ডাকওয়ালার আসিবার আর বিলম্ব নাই। আজ দুই দিন হইতে রাম অওতার এই প্রকার সপ্রতীক্ষ, কারণ এখনও পত্রের উত্তর আসে নাই।

ডাকওয়ালা আসিয়া একখানি পত্র এবং একটি প্যাকেট দিয়া গেল। হস্তাক্ষর অপরিচিত। বেনারস সিটির মোহর রহিয়াছে।

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া রাম অওতার তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিল। প্রথমেই প্যাকেটটি উন্মুক্ত করিল। ফটোগ্রাফ—সুন্দরী যুবতীর মনোজ্ঞ সুন্দর ছবি। সতৃষ্ণ নয়নে রাম অওতার ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। পার্সী মহিলাদের ধরণে শাড়ীখানি পরিহিত। 'বরম্‌সমাজী'দের স্ত্রী-কন্যারা এইরূপ ধরণেই শাড়ী পরিধান করে বটে—তাহা সে রেলে যাতায়াতের সময় অনেকবার দেখিয়াছে। মুখ চক্ষুর গঠন কি সুন্দর! রাম অওতার মনে মনে বলিতে লাগিল—'বাহবা কি বাহবা। বাহ্‌ রে বাহ্‌!'

ছবিখানি রাখিয়া সে পত্রখানি খুলিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

মহাশয়,

আপনার পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যদি আপনি আসেন, তবে উত্তম হয়। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইলে তবে অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইবে। আমি সম্প্রতি বাড়ী বদল করিয়াছি, সুতরাং কেদারঘাটের বাড়ীতে আসিবেন না। আমি ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া দিব, আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে

ঐ দিন সন্ধ্যাকালে আমার আলয়ে আপনি ভোজন করিলে অত্যন্ত সুখী হইব। ফটোগ্রাফ পাঠাইলাম।

লালা মুরলীধর লাল।

পত্র রাখিয়া আবার ফটোগ্রাফখানি লইয়া রাম অওতার দেখিতে লাগিল। একটি বাহু পার্শ্বদেশে লম্বিত, অপরটি অর্দ্ধোত্থিতভাবে শাড়ীখানির এক অংশ ধরিয়া আছে। চক্ষুযুগল যেন হাস্যপূর্ণ। ভাবিতে লাগিল, ইহার সহিত আলাপ হইলে কি মজাদারই হইবে!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাম অওতার ভাবিল,—লিখিয়াছে শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইতে। সে আর দুই দিন বিলম্ব। শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন? যাহা হউক, এই দুই দিনে ভাল করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

শনিবার দিন আহারাদি শেষ করিয়া রাম অওতার বাড়ীতে বলিল—"একবার কাশীজী দর্শন করিয়া আসি।"—বলিয়া, নিজ বেশবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপভাবে বেশ করিয়া যাইতে হইবে যে, প্রথম দর্শনেই কুমারীর মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। ভাল রেশমী চাপকান বাহির করিয়া রাম অওতার সযত্নে পরিধান করিল। জরির কাযকরা সুন্দর মখমলের টুপী লইয়া মাথায় দিল। দিল্লী হইতে আনীত সুকোমল রঙীন জুতায় স্বীয় পদদ্বয়ের শোভা বৃদ্ধি করিল। উৎকৃষ্ট হেনার আতর লইয়া রুমালে মাখাইল, নিজের গুম্ফে ও ভ্রূযুগলেও কিঞ্চিৎ লাগাইয়া দিল। কয়দিন কাশীতে থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই—খরচপত্র একটু ভাল করিয়াই করিতে হইবে,—তাই দুই শত টাকাও নিজের সঙ্গে লইল। সোণার ঘড়ি, সোণার চেন এবং হীরকের অঙ্গুরীয় পরিধান করিয়া, ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল।

রেলগাড়ীতে তাহার মনে হইতে লাগিল, যুবতীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সঙ্গে কি প্রকার সম্ভাষণ করিতে হইবে। ইংরাজি ধরণে এক প্রকার কোর্টশিপ হয়, তাহা সে অবগত ছিল মাত্র, কিন্তু তাহার প্রণালীর বিষয় কিছুই জানিত না। ইংরাজি উপন্যাসাদি সে কখনও পাঠ করে নাই। তবে "লাল-হীরাকী কথা", "লয়লা-মজনু", "গুল-ই-বকাওলি" প্রভৃতি তাহার পড়া ছিল। ভাবিল, তত্তৎ গ্রন্থে বর্ণিত প্রথা

অবলম্বন করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেবল প্রথম প্রথম একটু আত্মসংযম দেখানই ভাল। প্রথমে আদরের 'তু' না বলিয়া সম্মানের 'আপ' বলাই সমীচীন হইবে,—কারণ এসকল মহিলা শিক্ষিতা এবং সভ্যতাপ্রাপ্তা কিনা। কথাটা হইতেছে,—এরূপ কোনও সম্ভাষণ না করা হয় যাহাতে সে বিরক্ত হয়। দুই চারি দিন যাতায়াতের পর, একদিন নির্জ্জনে 'পিয়ারী' বলিয়া সম্ভাষণ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

রাম অওতার মনে মনে এইরূপ পর্য্যালোচনা ও ভবিষ্য-সুখ কল্পনা করিতেছে, ক্রমে গাড়ী আসিয়া রাজঘাট ষ্টেশনে পৌছিল।

রাম অওতার নামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটি যুবক তাহার নিকট আসিয়া দাড়াইল। যুবকটির উত্তরীয় ও পাঞ্জাবী কামিজ আবিরের রঙে রঞ্জিত।

যুবকটি আসিয়া বলিল, "আপনার নাম কি লালা রাম অওতার লাল?"

"হাঁ। আপনার নাম কি?"

"কিষুণপ্রসাদ। আমি লালা মুরলীধর লালের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি।"—বলিয়া সমাদর করিয়া সে রাম অওতারকে বাহিরে লইয়া গেল।

সেখানে একখানা গাড়ী দাড়াইয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়া কিষুণ-প্রসাদ বলিল, "জানালাগুলা বন্ধ করিয়া দিব কি? আজ বৈশাখী পূর্ণিমা বলিয়া কাশীতে ছোট দোল। দেখুন না, আমার এই পোষাকে আসিবার সময় দুষ্টলোকে পিচকারী দিয়া দিয়াছে।"

রাম অওতার ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বন্ধ করিয়া দিন—বন্ধ করিয়া দিন।" তাহার ভয় হইল পাছে তাহার রেশমী পোষাক কেহ পিচকারী দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

দুইজনে কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ী গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছিল। অবতরণ করিয়া রাম অওতার দেখিল, একটি প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়াই কিষুণপ্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা অত্যন্ত অন্ধকার। তাহার পর একটা সিঁড়ি দেখা গেল,

সেখানে বাতি জ্বলিতেছে। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া, রাম অওতার একটি বৃহৎ কক্ষে নীত হইল। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, ইহারা যখন নব্যতন্ত্রের লোক, তখন গৃহসজ্জাদি সাহেবী ধরণের হইবে। দেখিল, তাহা নহে। কক্ষটির মধ্যস্থলে ফরাস বিছানা পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া রক্ষিত। মধ্যস্থলে বসিয়া একটি স্থূলকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ পুরুষ আলবোলায় ধূমপানে প্রবৃত্ত।

কিষুণ্‌প্রসাদ ওরফে কান্হাইয়ালাল পৌঁছিয়া বলিল, "চাচাজী—এই লালা রাম অওতার লাল আসিয়াছেন।"—'চাচাজী' আর কেহই নহেন—স্বয়ং মহাদেও মিশ্র। মহাদেও অভ্যর্থনা করিয়া রাম অওতারকে বসাইল। নানাপ্রকার কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, কান্হাইয়ালালকে ডাকিয়া বলিল, "কিষুণ্,—তবে আমি বাড়ীর ভিতর যাইয়া উঁহাদের প্রস্তুত হইতে বলি। তুমি ততক্ষণ ইঁহাকে জলযোগ করাও।"

ইহা বলিয়া মহাদেও মিশ্র বাহির হইয়া গেল। কান্হাইয়ালাল সেখানে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা ভৃত্য রূপার বাসনে কিছু মিষ্টান্ন এবং কিছু সুগন্ধি সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল।

কিষুণ্‌প্রসাদ বলিল, "আপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন,—তাই এক পেয়ালা সিদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা কাশীবাসীরা সিদ্ধির বড় ভক্ত। ক্লান্তি দূর করিতে সিদ্ধির মত পানীয় আর নাই।"

রাম অওতার অনুরোধক্রমে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধিটুকু শেষ করিয়া ফেলিল। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি ৮টা বাজে। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ দুইটি যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

কান্হাইয়ালাল বলিল, "আপনি গীতবাদ্য জানেন কি? আমাদের বাড়ীর মহিলারা অত্যন্ত গীতবাদ্যপ্রিয়।"

রাম অওতার বলিল, "গীত? গীত?—জানি বৈ কি! শুনিবে একটা?"

তখন নেশায় তাহার মস্তিষ্ক চন্ চন্ করিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতে লাগিল—যেন চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে; বহু লোক যেন তাহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া সারেং, বেহালা, বীণ হাতে

করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; ক্রমে তাহারা যেন সকলে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

রাম অওতার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"গীত? শুনিবে একটা?"—বলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আরম্ভ করিল—

"বতা দে সখি, কৌন গলি গয়ে মেরে শ্যাম।
গোকুল ঢুঁড়ি
বৃন্দাবন ঢুঁ—"

আর কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। ঢুঁ—ঢুঁ—ঢুঁ—কয়েকবার বলিয়া সেই ফরাস বিছানার উপর সে পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদেও মিশ্র আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল, "কি রে কাহ্নাইয়া, ঔষধ ধরিয়াছে?"

কাহ্নাইয়া হাসিয়া বলিল, "ধরিয়াছে বৈ কি! যায় কোথা?"

মহাদেও বলিল, "দেখ্‌ত কি আছে?"

কাহ্নাইয়ালাল তখন অচেতন রাম অওতারের দেহ হইতে তাহার ঘড়ি, চেন, হীরার আংটী, নগদ দুই শত টাকা, রৌপ্যনির্ম্মিত পানের ডিবা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইল।

মহাদেও টাকাগুলা গণিতে গণিতে বলিল, "পোষাক খোল্‌,—দামী পোষাক।" গুরুজীর আদেশমত কাহ্নাইয়ালাল সেই টুপি, জুতা, রেশমী পোষাক সমস্ত খুলিয়া লইয়া তাহাকে একখানা ছিন্নবস্ত্র পরাইতে লাগিল।

মহাদেও বলিল, "না—না। উহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়া ছাড়িয়া দে। কাল সকালে নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন খাইবে কি? একটা গেরুয়া কৌপীন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া দে। একটা চিম্‌টা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসীবেশী লোক কখনও ক্ষুধায় মরে না।"

কাহ্নাইয়ালাল সমস্তই ঐরূপ করিল। মহাদেও পকেট হইতে গোটাকতক পয়সা বাহির করিয়া বলিল—"দে,—এই পয়সা কটাও ঝুলিতে দিয়া দে। এখন ঘণ্টাদুই এইখানেই পড়িয়া থাকুক। তাহার

পরে অন্ধকার গলি দিয়া লইয়া গিয়া, মান-মন্দিরের দেউড়িতে শোয়াইয়া দিয়া আসিস। সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় ঘুমাইবে ভাল। নেশাও রাত্রি পোহাইতে পোহাইতে ছুটিয়া যাইবে।"

কয়েক দিবস পরে গাজীপুরের সকলেই শুনিল, রাম অওতার ধনসম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসার-বিরাগী হইয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল; সৌভাগ্যবশতঃ তাহার মাতুল কাশীর রাস্তায় তদবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া, অনেক কষ্টে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া এখন হইতে রাম অওতারের একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেল।

ফুলের মূল্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

লণ্ডন নগরের স্থানে স্থানে নিরামিষ ভোজনশালা আছে। আমি একদিন ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবি দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলিলাম। ক্রমে একটা বাজিল, অত্যন্ত ক্ষুধাও অনুভব করিতে লাগিলাম। সেখান হইতে অনতিদূরে, সেণ্ট মার্টিন্স লেনে এইরূপ একটি ভোজনশালা আছে,—মৃদুমন্দ পদক্ষেপে তথায় গিয়া প্রবেশ করিলাম।

তখনও লণ্ডনের ভোজনশালাগুলিতে লাঞ্চের জন্য বহুলোক সমাগম আরম্ভ হয় নাই। হলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দুই চারিটি মাত্র ক্ষুধাতুর এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে বসিয়া আছে। আমি গিয়া একটি টেবিলের সম্মুখে বসিয়া, দৈনিক সংবাদপত্রখানি উঠাইয়া লইলাম। নম্রমুখী ওয়েট্রেস্ আসিয়া দাঁড়াইয়া হুকুমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আমি সংবাদপত্র হইতে চক্ষু উঠাইয়া খাদ্যতালিকা হাতে লইয়া আবশ্যকমত অর্ডার দিলাম। "ধন্যবাদ, মহাশয়" বলিয়া ক্ষিপ্রগামিনী ওয়েট্রেস্ নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

এই মুহূর্ত্তে, আমার নিকট হইতে অল্প দূরে আর একখানি টেবিলের প্রতি আমার নজর পড়িল। দেখিলাম, সেখানে একটি ইংরাজ বালিকা বসিয়া আছে। তাহার পানে চাহিবামাত্র, সে আমার মুখ হইতে নিজ দৃষ্টি অন্যত্র ফিরাইয়া লইল। অবাক হইয়া সে আমাকে দেখিতেছিল।

ইহাতে বিশেষ কোন নূতনত্ব নাই, কারণ শ্বেতদ্বীপে আমাদের চমৎকার দেহবর্ণটির প্রভাবে জনসাধারণ সর্ব্বত্রই মোহিত হইয়া থাকে, এবং মনোযোগের অংশ, প্রাপ্যের কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রাতেই আমরা লাভ করি।

বালিকাটির বয়স ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে। তাহার পোষাক যেন কিছু দরিদ্রতাব্যঞ্জক। চুলগুলি অজস্রধারায় পিঠের উপর পড়িয়াছে। বালিকার চক্ষু দুইটি বৃহৎ, যেন একটু বিষণ্ণতাযুক্ত।

সে জানিতে না পারে এমন ভাবে আমি মাঝে মাঝে তাহার পানে চাহিতে লাগিলাম। আমার খাদ্যদ্রব্যাদি আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই সে আহার সমাধা করিয়া উঠিল। ওয়েট্রেস্ আসিয়া তাহার বিলখানি তাহাকে লিখিয়া দিল। বাহির হইবার দরজার নিকট অফিস আছে, সেখানে বিলখানি ও মূল্য দিয়া যাইতে হয়।

বালিকা উঠিলে, আমার দৃষ্টিও তাহাকে অনুসরণ করিল। স্বস্থানে বসিয়াই আমি দেখিলাম, বালিকা তাহার মূল্য প্রদান করিয়া, কর্ম্মচারিণীকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে—"Please Miss, ঐ যে ভদ্রলোকটি, উনি কি ভারতবর্ষীয়?"

"আমার তাহাই অনুমান হয়।"

"উনি কি সর্ব্বদাই এখানে আসেন?"

"বোধ হয় না। আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ নাই।"

"ধন্যবাদ"—বলিয়া মেয়েটি আমার দিকে ফিরিয়া, আর একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এইবার কিন্তু আমি বিস্মিত হইলাম। কেন? ব্যাপার কি? আমার সম্বন্ধে তাহার এই কৌতূহল দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধেও আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। আহার শেষ হইলে ওয়েট্রেস্কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ যে মেয়েটি ওখানে বসিয়াছিল, তাহাকে তুমি জান?"

"না মহাশয়, আমি ত বিশেষ জানি না, তবে প্রতি শনিবারে এখানে লাঞ্চ খাইয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি।"

"শনিবার ছাড়া অন্য কোনও বারে আসে না?"

"না, আর ত কখনও দেখি না।"

"ও যে কে তাহা তুমি কিছু অনুমান করিতে পার?"

"বোধ করি কোনও দোকানে কর্ম্ম করে।"

"কেন বল দেখি?"

"হয় ত সামান্য কিছু উপার্জ্জন করে, অন্য দিন লাঞ্চ খাইবার পয়সা কুলায় না, শনিবার সাপ্তাহিক বেতন পায়, তাই একদিন আসে।"

কথাটা আমার মনে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালিকাটির সম্বন্ধে কৌতূহল আমার মন হইতে দূর হইল না। এমন করিয়া আমার সংবাদ লইল কেন? ভিতরে এমন কি রহস্য আছে, যাহার জন্য আমার সম্বন্ধে উহার এত ঔৎসুক্য? তাহার সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট, চিন্তাপূর্ণ, বিষাদভরা মূর্ত্তি আমার মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। আহা, কে বালিকা? আমার দ্বারায় তাহার কি কোনও উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে? রবিবার দিন লণ্ডনের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। সোমবার দিন প্রাতরাশের পর আমি বালিকার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। সেণ্ট মার্টিন্স লেনের কাছাকাছি রাস্তাগুলিতে, বিশেষতঃ ষ্ট্র্যাণ্ডে অনেক দোকানে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কোনও একটা দোকানে প্রবেশ করিলে, অন্ততঃ কিছু না কিছু ক্রয় করিতে হয়।* অনাবশ্যক নেকটাই, রুমাল, কলারের বোতাম, পেনসিল, ছবিপোষ্টকার্ড প্রভৃতি আমার ওভারকোটের পকেটে স্তূপাকার হইয়া উঠিল, কিন্তু কোথাও বালিকার সন্ধান পাইলাম না।

*ইহা কেবলমাত্র চক্ষুলজ্জার খাতিরে নহে, কতকটা দয়াধর্ম্মের অনুরোধেও বটে। লণ্ডনের প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পুরুষ Shop-walkers আছে। তাহাদের কর্ত্তব্য, খরিদ্দারকে যথাবিভাগে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সাধারণভাবে কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করা। যদি কোনও খরিদ্দার কোনও বিভাগ হইতে জিনিষ দেখিয়া কিছু না কিনিয়া ফিরিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ সেই Shop-walker দোকানের ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট করিয়া দিয়া থাকে—"Miss অমুকের বিভাগ হইতে একজন ক্রেতা ফিরিয়া গিয়াছে।" এইরূপ রিপোর্ট হইলে সেই কর্ম্মচারিণীর কৈফিয়ৎ তলব হয়। প্রথম প্রথম সাবধান করিয়া দেওয়া হয়, বারম্বার এইরূপ রিপোর্ট হইলে জরিমানা হয়, কর্ম্মচ্যুতিও হইতে পারে। এই সকল Shop-girls অত্যন্ত সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিয়া থাকে। জিনিষ অপছন্দ হইলেও, তাহাদের চক্ষুর মিনতি উপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসা দুঃসাধ্য।

—লেখক।

সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শনিবার আসিল। আমি আবার সেই নিরামিষ ভোজনাগারে উপস্থিত হইলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, সেই টেবিলে বালিকা ভোজনে বসিয়াছে। আমি সেই টেবিলের নিকটে গিয়া, তাহার সম্মুখে চেয়ারখানি দখল করিয়া বলিলাম—"Good afternoon."

বালিকা সঙ্কোচের সহিত বলিল—"Good afternoon, Sir."

একটি আধটি কথা দিয়া আরম্ভ করিয়া, আমি ক্রমে জমাইয়া তুলিতে লাগিলাম। বালিকা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভারতবর্ষীয় ?"

"হাঁ।"

"আমায় ক্ষমা করিবেন,—আপনি কি নিরামিষভোজী ?"

উত্তর না দিয়া বলিলাম, "কেন বল দেখি ?"

"আমি শুনিয়াছি, ভারতবর্ষীয় লোকেরা অধিকাংশই নিরামিষ ভোজন করে।"

"তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কথা কেমন করিয়া জানিলে ?"

"আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভারতবর্ষে সৈন্য হইয়া গিয়াছেন।"

আমি তখন উত্তর করিলাম, "আমি প্রকৃত নিরামিষভোজী নহি; তবে মাঝে মাঝে আমি নিরামিষ ভোজন করিতে ভালবাসি বটে।"

শুনিয়া বালিকা যেন কিঞ্চিৎ নিরাশ হইল।

জানিলাম, এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া বালিকার আর কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই। ল্যাম্বেথে বৃদ্ধা বিধবা মাতার সহিত সে বাস করে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দাদার নিকট হইতে পত্রাদি পাও ?"

"না, অনেক দিন কোনও পত্রাদি পাই নাই। সেইজন্য আমার মা অত্যন্ত চিন্তিত আছেন। তাঁহাকে লোকে বলে, ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ। তাই তিনি আশঙ্কা করিতেছেন, আমার ভ্রাতার কোনওরূপ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। সত্যই কি ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ মহাশয় ?"

আমি একটু হাসিলাম। বলিলাম, "না। তাহা হইলে কি মানুষ সেখানে বাস করিতে পারিত ?"

বালিকা একটি মৃদুরকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল, "মা বলেন, যদি কোনও ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পাই, তবে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি।"—বলিয়া, অনুনয়পূর্ণ নেত্রে আমার পানে চাহিল।

আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। বাড়ীতে মার কাছে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে তাহার সাহস হইতেছে না; অথচ ইচ্ছা আমি একবার যাই।

এই দীন, বিরহকাতর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। দরিদ্রের কুটীরের সাক্ষাৎ পরিচয়লাভের অবসর আমার কখনও ঘটে নাই। দেখিয়া আসিব এদেশে তাহারা কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করে, কিরূপভাবে চিন্তা করে।

বালিকাকে বলিলাম, "চল না—আমাকে তোমাদের বাড়ী লইয়া যাইবে? তোমার মার নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিবে?"

এ প্রস্তাবে বালিকার দুইটি চক্ষু দিয়া যেন কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল। বলিল, "Thank you ever so much,—it would be so kind of you! এখন আসিতে পারিবেন কি?"

"আহ্লাদের সহিত।"

"আপনার কোন কার্য্যের ক্ষতি হইবে না ত?"

"না—না, মোটেই না। আজ অপরাহ্নে আমার সময় সম্পূর্ণ আমার নিজের।"

শুনিয়া বালিকা পুলকিত হইল। আহার সমাধা করিয়া আমরা দুইজনে উঠিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নামটি কি জানিতে পারি?"

"আমার নাম অ্যালিস্ মার্গারেট্ ক্লিফর্ড।"

রঙ্গ করিয়া বলিলাম,—"ওঃ হো—তুমিই Alice in Wonderland-এর অ্যালিস্ বুঝি?"

বিস্ময়ে বালিকা চক্ষুস্থির করিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?"

আমিও একটু অপ্রতিভ হইলাম। মনে করিতাম, এমন কোনও ইংরাজ বালিকা নাই, Alice in Wonderland নামক সেই অদ্বিতীয় শিশুরঞ্জন পুস্তকখানি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে নাই।

বলিলাম, "সে একখানি চমৎকার বহি আছে। পড় নাই ?"

"না, আমি ত পড়ি নাই!"

বলিলাম, "তোমার মাতা যদি আমায় অনুমতি করেন, তবে আমি তোমাকে সে বহি একখানি উপহার দিব।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, সেণ্ট মার্টিন্স চার্চ্চের পাশ দিয়া চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্ট্র্যাণ্ড দিয়া হুহু করিয়া বৃহদাকার দ্বিতল অম্‌নিবাসগুলি উভয় দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ক্যাবেরও সংখ্যা নাই। টেলিগ্রাফ অফিসের সম্মুখে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া বালিকাকে বলিলাম, "এস, আমরা এইখানেই ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার বাসের জন্য অপেক্ষা করি।"

বালিকা বলিল, "চলিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে কি ?"

আমি বলিলাম, "কিছুমাত্র না। কিন্তু তোমার কষ্ট হইবে না ?"

"না, আমি ত রোজই চলিয়া বাড়ী যাই।"

কোথায় সে কৰ্ম্ম করে, এইবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইলাম। ইংরাজি হিসাবে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাটা নিয়ম নহে, কিন্তু সকল নিয়মেরই ফাঁকি আছে কিনা! যেমন রেলগাড়ীতে উঠিয়া সহযাত্রিকে, 'কোথায় যাইতেছেন মহাশয় ?' জিজ্ঞাসা করা ভয়ানক পাপ, তবে, 'অধিকদূর যাইবেন কি ?' ইহা জিজ্ঞাসা করিতে দোষ নাই। সহযাত্রী ইচ্ছা করিলে বলিতে পারে, 'আমি অমুক স্থান অবধি যাইব।' ইচ্ছা না করিলে বলিতে পারে, 'না এমন বেশী দূর নয়।' আমার প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হইল, তাহার পর্দ্দাও বজায় রহিল! সেই হিসাবে আমি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এদিকে তুমি প্রায়ই আস বুঝি ?"

বালিকা বলিল, "হাঁ আমি সিভিল সার্ভিস ষ্টোর্সে টাইপ-রাইটারের কায করি। রোজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ী যাই। আজ শনিবার বলিয়া শীঘ্র ছুটি পাইয়াছি।"

আমি তাহাকে বলিলাম, "চল, ষ্ট্র্যাণ্ড দিয়া না গিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট দিয়া যাওয়া যাউক। ভীড় কম।" বলিয়া তাহার বাহুধারণ করিয়া সাবধানতার সহিত রাস্তা পার করিয়া দিলাম।

এখানে বলা আবশ্যক, লণ্ডনের রাজপথগুলি ভূমি হইতে উচ্চ হইয়া থাকে। রান্নাঘর প্রায়ই রাস্তার সমতলতা হইতে নিম্ন হয়।

মার স্বর শুনিয়া, আমার প্রতি চাহিয়া ম্যাগি বলিল, "Do you mind ?"

আমি বলিলাম, "Not in the least, চল।"

সিঁড়ি দিয়া বালিকার সঙ্গে আমি তাহাদের রান্নাঘরে নামিয়া গেলাম।

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ম্যাগি বলিল, "মা, একটি ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

বৃদ্ধা আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "কই তিনি ?"

আমি ম্যাগির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সস্মিত মুখে প্রবেশ করিলাম। বালিকা পরস্পর পরিচয় করাইয়া দিল—"ইনি মিষ্টার গুপ্ত। ইনি আমার মা।"

"How do you do ?"—বলিয়া আমি করপ্রসারণ করিয়া দিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন। আমার হাত ভাল নয়।" বলিয়া নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখাইলেন, তাহাতে ময়দা লাগিয়া রহিয়াছে। বলিলেন, "আজ শনিবার, তাই কেক প্রস্তুত করিতেছি। সন্ধ্যাবেলা লোক আসিয়া ইহা কিনিয়া লইয়া যাইবে, রাত্রে রাজপথে ইহা বিক্রয় হইবে। এইরূপ করিয়া কষ্টে আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করি।"

দরিদ্র পল্লীতে শনিবার রাত্রিটা মহোৎসবের ব্যাপার। পথে পথে আলোকময় ঠেলা গাড়ীতে করিয়া অসংখ্য লোক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। রাজপথে এই সন্ধ্যায় ভীড় সকল দিন অপেক্ষা অধিক। শনিবারেই দরিদ্রগণের একটু খরচপত্র করিবার দিন, কারণ সেই দিনই তাহারা সাপ্তাহিক বেতন পাইয়া থাকে।

ড্রেসারের* উপর ময়দা, চর্ব্বি, কিস্‌মিস, ডিম্ব প্রভৃতি কেক প্রস্তুতের উপকরণগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। টিনের আধারে সদ্য পক্ক কয়েকটি কেকও রহিয়াছে।

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন, "গরীব মানুষের পাকশালায় বসা কি আপনার প্রীতিকর হইবে ? আমার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। ম্যাগি, তুই ইঁহাকে বসিবার ঘরে লইয়া যা। আমি এখনই আসিতেছি।"

*রান্নাঘরের টেবিলের নাম ড্রেসার।—লেখক।

আমি বলিলাম, "না না। আমি এখানে বেশ বসিতে পারিব। আপনি বেশ কেক তৈয়ারী করিতেছেন ত!"

মিসেস ক্লিফর্ড সস্মিতমুখে আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

ম্যাগি বলিল, "মা বেশ টফি তৈয়ারী করেন। খাইয়া দেখিবেন?"

আমি আহ্লাদের সহিত সম্মতি জানাইলাম। ম্যাগি একটা কাবার্ড খুলিয়া একটি টিনের কৌটাপূর্ণ টফি আনিয়া হাজির করিল। আমি কয়েকটি খাইয়া সুখ্যাতি করিতে লাগিলাম।

কেক তৈয়ারী করিতে করিতে মিসেস ক্লিফর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ মহাশয়?"

"সুন্দর দেশ।"

"বাস করিবার পক্ষে নিরাপদ কি?"

"নিরাপদ বৈকি। তবে এদেশের মত ঠাণ্ডা নহে, কিছু গরম দেশ।"

"সেখানে নাকি সর্প ও ব্যাঘ্র অত্যন্ত অধিক? তাহারা মানুষকে বিনাশ করে না?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ও সব কথা বিশ্বাস করিবেন না। সর্প ও ব্যাঘ্র জঙ্গলে থাকে, তাহারা লোকালয়ে আসে না। দৈবাৎ লোকালয়ে আসিলে তাহারা বিনষ্ট হয়।"

"আর জ্বর?"

"জ্বর ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও একটু বেশী বটে—সর্ব্বত্র নহে. এবং সব সময়েও নহে।"

আমার পুত্র পাঞ্জাবে আছে। সে সৈনিক-পুরুষ। পাঞ্জাব কেমন স্থান মহাশয়?"

"পাঞ্জাব উত্তম স্থান। সেখানে জ্বর কম। স্বাস্থ্য খুব ভাল।"

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "আমি শুনিয়া সুখী হইলাম।"

তাঁহার কেক তৈয়ারী শেষ হইল। কন্যাকে বলিলেন, "ম্যাগি, তুই মিষ্টার গুপ্তকে উপরে লইয়া যা। আমি হাত ধুইয়া চা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি।"

ম্যাগি অগ্রে অগ্রে, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাদের বসিবার ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। আসবাব-পত্র অতি সামান্য এবং অল্পমূল্য। মেঝের

উপর কার্পেটখানি বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে ছিন্ন, কিন্তু সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ম্যাগি কক্ষে আসিয়া পর্দাগুলি সরাইয়া জানালাগুলি খুলিয়া দিল। একটি কাচে আবৃত পুস্তকের কেস ছিল, আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস ক্লিফর্ড চায়ের ট্রে হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে রন্ধনশালার সমস্ত চিহ্ন অন্তর্হিত। চা পান করিতে করিতে আমি ভারতবর্ষের গল্প করিতে লাগিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড তাঁহার পুত্রের একখানি ফোটোগ্রাফ দেখাইলেন। ইহা ভারতবর্ষ যাত্রার পূর্ব্বে তোলা হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রের নাম ফ্রান্সিস অথবা ফ্রাঙ্ক। ম্যাগি একখানি ছবির বই বাহির করিল। তাহার জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাহার দাদা এখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে সিমলা শৈলের অনেকগুলি অট্টালিকা এবং স্বাভাবিক দৃশ্যের ছবি রহিয়াছে। ভিতরের পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"To Maggie on her birthday from her loving brother Frank."

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ম্যাগি সেই আংটিটা মিষ্টার গুপ্তকে দেখা না?"

আমি বলিলাম, "তোমার দাদা পাঠাইয়াছেন না কি? কই ম্যাগি, কি রকম আংটি দেখি?"

ম্যাগি বলিল, "সে একটি যাদুযুক্ত অঙ্গুরীয়। একজন ইয়োগী সেটি ফ্রাঙ্ককে দিয়াছিল।" বলিয়া আংটি বাহির করিয়া দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ইহা হইতে ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন?"

Crystal gazing নামক একটা ব্যাপারের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়াছিলাম। দেখিলাম আংটিতে একটি স্ফটিক বসান রহিয়াছে। হাতে করিয়া সেটি দেখিতে লাগিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ফ্রাঙ্ক ওটি পাঠাইবার সময় লিখিয়াছিল, সংযত মনে ঐ স্ফটিকের পানে চাহিয়া দূরবর্ত্তী যে কোনও মানুষের বিষয়ে চিন্তা করিবে, তাহার সমস্ত কার্য্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইয়োগী ফ্রাঙ্ককে এই কথা বলিয়াছিল। বহুদিন ফ্রাঙ্কের কোনও সংবাদ না

পাইয়া, আমি ও ম্যাগি অনেকবার উহার প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। আপনি একবার দেখুন না? আপনি হিন্দু, আপনি সফল হইতে পারেন।"

দেখিলাম, কুসংস্কার শুধু ভারতবর্ষেই আবদ্ধ নহে। অথচ ইহা যে কিছুই নয়, একটা পিতলের আংটি এবং এক টুকরা সাধারণ কাচমাত্র, তাহাও এই জননী ভগিনীকে বলিতে মন সরিল না। তাহারা মনে করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের ফ্রাঙ্ক সেই বহুদূর স্বপ্নবৎ ভারতবর্ষ হইতে একটি অভিনব অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছে, সে বিশ্বাস-টুকু ভাঙ্গিয়া দিই কি প্রকারে?

মিসেস ক্লিফর্ড ও ম্যাগির আগ্রহ দর্শনে, অঙ্গুরীয়টি হাতে লইয়া স্ফটিকের প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিলাম। অবশেষে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম, "কই, আমি ত কিছু দেখিলাম না!"

মাতা, কন্যা উভয়েই একটু দুঃখিত হইল। বিষয়ান্তরের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য বলিলাম, "ঐ যে একটি বেহালা রহিয়াছে দেখিতেছি, ওটি তোমার বুঝি ম্যাগি?"

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "হ্যাঁ। ম্যাগি বেশ বাজাইতে পারে। একটা কিছু বাজাইয়া শুনাইয়া দে না ম্যাগি?"

ম্যাগি তাহার মাতার প্রতি রোষকটাক্ষ করিয়া বলিল—"Oh, mother!"

আমি বলিলাম, "ম্যাগি, একটা বাজাও না? আমি বেহালা শুনিতে বড় ভালবাসি। দেশে আমার একটি বোন আছে, সে'ও তোমারই মত এত বড় হইবে, সে আমায় বেহালা বাজাইয়া শুনাইত।"

ম্যাগি বলিল, "আমি যেরূপ বাজাই, তাহা মোটেই শুনিবার উপযুক্ত নহে।"

আমার পীড়াপীড়িতে শেষে ম্যাগি বাজাইতে স্বীকৃত হইল। বলিল, "আমার ভাণ্ডারে অধিক কিছুই নাই। কি শুনিবেন?"

"আমি ফরমাস করিব? আচ্ছা, তাহা হইলে তোমার music case লইয়া এস—কি কি আছে দেখি।"

ম্যাগি একটি কালো চামড়ায় নির্ম্মিত পুরাতন মিউজিক-কেস বাহির

করিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্বরলিপিই অকিঞ্চিৎকর, যথা "Goodbye Dolly Grey", "Honeysuckle and the Bee" প্রভৃতি। কয়েকটি রহিয়াছে যাহা যথার্থই ভাল জিনিষ, যদিও ফ্যাসান হিসাবে বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে—যথা, "Annie Laurie", "Robin Adair", "The Last Rose of Summer", ইত্যাদি। দেখিলাম, কয়েকটি স্কচ গানও রহিয়াছে। আমি স্কচ গানের বড়ই পক্ষপাতী। তাই "Blue-bells of Scotland" নামক স্বরলিপিটি বাছিয়া আমি ম্যাগির হস্তে দিলাম।

ম্যাগি বেহালায় বাজাইতে লাগিল, আমি মনে মনে সুর করিয়া গানটি গাহিতে লাগিলাম—

"Oh where—and oh where—is my
Highland laddie gone!"

বাজান শেষ হইলে, ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া আমি অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলাম। মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ম্যাগি কখনও উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পায় নাই। যাহা শিখিয়াছে, তাহা নিজের যত্নে শিখিয়াছে মাত্র! যদি কখনও আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তবে উহাকে lessons লওয়াইবার বন্দোবস্ত করিব।"

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে বলিলাম, "ম্যাগি, আর কিছু বাজাও না?"

এখন ম্যাগির সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়াছে। বলিল, "কি বাজাইব নির্দ্দেশ করুন।"

আমি তাহার স্বরলিপিগুলির মধ্যে খুঁজিতে লাগিলাম। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গান সৌখিন সমাজে আদৃত, তাহার কোনটিই দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম, সে সকল গানের প্রতিধ্বনি এখনও এ দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করে নাই।

খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ একটি যথার্থ উচ্চশ্রেণীর স্বরলিপি হাতে পাইলাম। এটি Gounod কর্ত্তৃক বিরচিত Faust-নামক Opera হইতে Flower song গান—হাতে তুলিয়া অনুরোধ করিলাম, "এইটি বাজাও।"

ম্যাগি বাজাইল। শেষ হইলে, আমি কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়ে মৌন হইয়া

রহিলাম। Culture নামক জিনিষটা ইউরোপীয় সমাজের কত নিম্নস্তর অবধি প্রবেশ করিয়াছে, ইহাই আমার বিস্ময়ের বিষয়। ম্যাগি এই কঠিন স্বরলিপিটিও সুন্দর বাজাইল—অথচ সে একটি নিম্নশ্রেণীর বালিকা-মাত্র। ভাবিলাম, কলিকাতায় কোনও দিগ্‌গজ ব্যারিষ্টার বা প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ানের এই বয়সের কন্যা, গুনোর ফাউষ্ট হইতে একটি সঙ্গীত যদি এমন সুন্দরভাবে বাজাইতে পারিত, তবে সমাজে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইত।

ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটিও কি তুমি নিজে শিখিয়াছ?"

"না। এটি আমি নিজে শিখিতে পারি নাই। আমাদের গির্জ্জার মিন্‌ষ্টারের কন্যার নিকট আমি এটি শিখিয়াছি। আপনি কখনও এ অপেরা শুনিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "না। আমি অপেরায় কখনও ফাউষ্ট শুনি নাই। তবে গইটের ফাউষ্টের ইংরাজি অনুবাদ, লাইসীয়মে অভিনয় দেখিয়াছি বটে।"

"লাইসীয়মে? যেখানে আভিং অভিনয় করেন?"

"হাঁ। তুমি কখনও আভিং-এর অভিনয় দেখিয়াছ?"

ম্যাগি দুঃখিতভাবে বলিল, "না, আমি কোন ওয়েষ্ট এণ্ড থিয়েটারে কখনও যাই নাই। আভিংকে কখনও দেখি নাই। ছবির দোকানের জানালায় তাঁহার ফোটোগ্রাফ দেখিয়াছি মাত্র।"

"এখন আর্ভিং লাইসীয়মে Merchant of Venice অভিনয় করিতেছেন। মিসেস ক্লিফর্ড আর তুমি যদি একদিন এস, তবে আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তোমাদিগকে লইয়া যাই।"

মিসেস ক্লিফর্ড ধন্যবাদের সহিত সম্মতি জানাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সান্ধ্য-অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা করেন, না অপরাহ্ণের অভিনয়?"

এখানে লণ্ডনের থিয়েটার সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক। কলিকাতার থিয়েটারের মত, আজ অমুক নাটকের অভিনয়ে 'হৈ হৈ শব্দ রৈ রৈ কাণ্ড',—কাল নাটকান্তরে 'হাসির হর্‌রা, গানের গর্‌রা, আমোদের

ফোয়ারা' উপস্থিত হয় না। প্রথমতঃ, সেখানে থিয়েটারে প্রতি রাত্রেই অভিনয় হইয়া থাকে (রবিবার ছাড়া)। ইহা ব্যতীত কোনও থিয়েটারে শনিবারে, কোনটাতে বা বুধবারে, কোনটাতে বা শনি ও বুধ উভয় বারেই 'ম্যাটিনে' অর্থাৎ অপরাহ্ণ-অভিনয়ও হইয়া থাকে। একটি নাটক কোনও থিয়েটারে আরম্ভ হইলে, প্রতিদিন তাহারই অভিনয় হয়। যতদিন অবধি দর্শকের অভাব না ঘটে, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। এইরূপে কোনও নাটক দুই মাস বা ছয় মাস—বা লোকপ্রিয় Musical comedy হইলে, এমন কি দুই তিন বৎসর অবধি অবিচ্ছেদে অভিনীত হইতে থাকে।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "আমার শরীর ভাল নহে। অপরাহ্ণ-অভিনয়ই সুবিধা। এক শনিবারে, ম্যাগির ছুটির পর একত্র যাওয়া যাইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "উত্তম! সোমবার দিন গিয়া, সামনের যে শনিবারের জন্য পাই, সেই শনিবারের টিকিট কিনিয়া রাখিয়া আপনাকে তারিখ জানাইব।"

ম্যাগি বলিল, "কিন্তু মিষ্টার গুপ্ত, আপনি যেন অধিক মূল্যের টিকিট কিনিবেন না! তাহা যদি কেনেন, তবে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব।"

আমি বলিলাম, "না, অধিক মূল্যের টিকিট কিনিব কেন? আপার সার্কলের টিকিট কিনিব এখন। আমি ত আর একজন ভারতবর্ষীয় রাজা নহি!—ভাল কথা, Merchant of Venice পড়িয়াছ?"

"মূল নাটক পড়ি নাই। স্কুলে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে Lamb's Tales হইতে গল্পাংশ কতকটা উদ্ধৃত ছিল। তাহাই পড়িয়াছি।"

"আচ্ছা, আমি তোমায় মূল নাটক একখানি পাঠাইয়া দিব। বেশ করিয়া পড়িয়া রাখিও। তাহা হইলে অভিনয় বুঝিবার সুবিধা হইবে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সোমবার দিন বেলা দশটার সময় লাইসীয়মের বক্স-অফিসে গিয়া

কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আগামী শনিবার অপরাহ্ণ-অভিনয়ের জন্য আমাকে তিনখানা আপার সার্কলের টিকিট দিতে পারেন ?"

কর্ম্মচারী চলিল, "না মহাশয়, এখন সামনের দুই শনিবার দিতে পারি না। সমস্ত আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।"

"তৃতীয় শনিবার ?"

"সেদিন দিতে পারি।"—বলিয়া সে ব্যক্তি, সে তারিখ অঙ্কিত একটি প্ল্যান বাহির করিল। দেখিলাম, সে তারিখেও আপার সার্কলের অনেক আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সেই সেই আসনের নম্বরগুলি নীল পেন্সিল দিয়া কাটা রহিয়াছে।

প্ল্যানখানি হাতে লইয়া, খালি আসনগুলি হইতে বাছিয়া. পরস্পর সংলগ্ন তিনটি আসন পছন্দ করিয়া, তাহার নম্বর কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলাম। সেই নম্বরযুক্ত তিনখানি টিকিট ক্রয় করিয়া, বার শিলিং মূল্য দিয়া চলিয়া আসিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার ম্যাগির সহিত গিয়া তাহার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। মধ্যে ম্যাগিকে একদিন জু-গার্ডেনে লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে Indian Rajah নামক হস্তীর পৃষ্ঠে, অন্যান্য বালক-বালিকার সহিত ম্যাগিও আরোহণ করিয়াছিল। হাতী চড়িয়া তাহার খুশীর আর সীমা নাই!

এখনও পর্যান্ত কিন্তু তাহার ভ্রাতার কোনও সংবাদ আসে নাই। একদিন মিসেস ক্লিফর্ডের অনুরোধক্রমে ইণ্ডিয়া অফিসে গিয়া সংবাদ লইলাম। শুনিলাম, যে রেজিমেণ্টে ফ্র্যাঙ্ক আছে, তাহা এখন সীমান্ত সমরে নিযুক্ত। এই কথা শুনিয়া অবধি মিসেস ক্লিফর্ড অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিন প্রভাতে ম্যাগির নিকট হইতে একখানি পোষ্টকার্ড পাইলাম, সে লিখিয়াছে—

প্রিয় মিষ্টার গুপ্ত,

আমার মা অত্যন্ত পীড়িত। আমি আজ এক সপ্তাহ কাল কর্ম্মস্থানে যাইতে পারি নাই। আপনি যদি দয়া করিয়া একবার আসেন তবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইব।

ম্যাগি

আমি যে পরিবারে বাস করিতাম, তাঁহাদিগের নিকট পূর্ব্বেই ম্যাগি ও তাহার জননী সম্বন্ধে গল্প করিয়াছিলাম। আজ প্রাতরাশের সময় টেবিলে এই সংবাদ উল্লেখ করিলাম।

গৃহিণী আমাকে বলিলেন, "তুমি যখন যাইবে, সঙ্গে কিছু অর্থ লইয়া যাইও। মেয়েটি এক সপ্তাহ কর্ম্ম করে নাই, বেতনও পায় নাই। তাহারা বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছে।"

প্রাতরাশের পর, আমি কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া ল্যাম্বেথ যাত্রা করিলাম। তাহাদের বাড়ীতে পৌঁছিয়া দরজায় ঘা দিলাম। ম্যাগি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

তাহার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু কোটরগত। আমাকে দেখিয়াই বলিল, "Oh, thank you Mr. Gupta. It is so kind—"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ম্যাগি, তোমার মা কেমন আছেন?"

ম্যাগি বলিল, "মা এখন নিদ্রিত। তিনি অত্যন্ত পীড়িত। ডাক্তার বলিয়াছে, ফ্রাঙ্কের সংবাদ না পাইয়া, দুশ্চিন্তায় পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হয় ত তিনি বাঁচিবেন না।"

আমি ম্যাগিকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম। নিজের রুমাল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলাম।

ম্যাগি একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "আপনার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

আমি বলিলাম, "কি ম্যাগি?"

"বসিবার ঘরে আসুন, বলিব।"

পাছে আমাদের পদশব্দে পীড়িত বৃদ্ধা জাগরিত হন, তাই আমরা সাবধানে বসিবার কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলাম। মাঝখানে দাঁড়াইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ম্যাগি?"

ম্যাগি আমার মুখের পানে আকুল নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। আমি প্রতীক্ষা করিলাম। শেষে ম্যাগি কিছু না বলিয়া, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। এ বালিকাকে আমি কি বলিয়া সান্ত্বনা দিই?—ইহার ভ্রাতা সীমান্ত-সমরে, জীবিত কি মৃত তাহা ভগবানই জানেন। পৃথিবীতে একমাত্র সম্বল মাতা। সেই মাতা চলিয়া গেলে, ইহার দশা কি হইবে? এই যৌবনোন্মুখী বালিকা, এই লণ্ডনে দাঁড়াইবে কোথা?

আমি জোর করিয়া ম্যাগির মুখ হইতে তাহার হস্তাবরণ খুলিয়া দিলাম। বলিলাম, "ম্যাগি, কি বলিবে বল? আমার দ্বারা যদি তোমার কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা করিতে আমি পরাঙ্মুখ হইব না।"

ম্যাগি বলিল, "মিঃ গুপ্ত, আমি যাহা প্রস্তাব করিব, তাহা শুনিয়া আপনি কি ভাবিবেন জানি না। তাহা যদি অত্যন্ত গর্হিত হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

"কি? কি প্রস্তাব?"

"গতকল্য সারাদিন মা খালি বলিয়াছেন, মিষ্টার গুপ্ত আসিয়া যদি সেই স্ফটিকের প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি করেন, তবে হয়ত ফ্রাঙ্কের কোনও সংবাদ বলিতে পারেন। তিনি ত হিন্দু বটে!—আমি তাই আপনাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম।"

"তুমি যদি ইচ্ছা কর, সে অঙ্গুরীয় লইয়া এস,—আমি অবশ্যই পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

ম্যাগি আকুল স্বরে বলিল, "কিন্তু এবারও যদি নিষ্ফল হয়?"

আমি ম্যাগির মনের ভাব বুঝিলাম। বুঝিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

ম্যাগি বলিল, "মিষ্টার গুপ্ত, আমি পুস্তকে পড়িয়াছি, হিন্দুজাতি অত্যন্ত সত্যপরায়ণ। আপনি যদি স্ফটিক অবলোকন করিবার পর

মাকে কেবলমাত্র বলেন, ফ্রাঙ্ক ভাল আছে, জীবিত আছে—তাহা হইলে কি নিতান্ত মিথ্যা হইবে? বড় অন্যায় হইবে?"

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল।

আমি কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আমি পুণ্যাত্মা নহি—এ জীবনে আমি অনেক পাপ করিয়াছি। আজ এই পাপটিও করিব। এইটিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পাপ হইবে।

প্রকাশ্যে বলিলাম, "ম্যাগি, তুমি চুপ কর, কাঁদিও না। কই সে অঙ্গুরীয়, দাও একবার ভাল করিয়া দেখি। যদি কিছু দেখিতে না পাই, তবে তুমি যেরূপ বলিতেছ সেইরূপই করিব। তাহা যদি অন্যায় হয়, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ম্যাগি আমাকে অঙ্গুরীয় আনিয়া দিল। আমি সেটি হাতে লইয়া তাহাকে বলিলাম, "যাও, তুমি দেখ তোমার মা জাগিয়াছেন কিনা।"

প্রায় পনেরো মিনিট পরে ম্যাগি ফিরিয়া আসিল। বলিল, "মা জাগিয়াছেন। আপনার আগমন সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছি।"

"আমি এখন গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারি?"

"আসুন।"

বৃদ্ধার রোগশয্যার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার হস্তে তখনও সেই অঙ্গুরীয়। তাঁহাকে সুপ্রভাত জানাইয়া বলিলাম—"মিসেস ক্লিফর্ড, আপনার পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধা তাঁহার উপাধান হইতে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিলেন। বলিলেন, "আপনি স্ফটিকে ইহা দেখিলেন কি?"

আমি অসঙ্কোচে বলিলাম, "হাঁ মিসেস ক্লিফর্ড, আমি স্ফটিকেই ইহা দেখিলাম।"

বৃদ্ধার মস্তক আবার উপাধানের সহিত মিলিত হইল। তাঁহার চক্ষু যুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি শুধু অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "God bless you—God bless you."

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মিসেস ক্লিফর্ড সে যাত্রা আরোগ্যলাভ করিলেন।

আমার দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় ঘনাইয়া আসিল। একবার ইচ্ছা হইল, ল্যাম্বেথে গিয়া ম্যাগি ও তাহার জননীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া আসি। কিন্তু সে পরিবার এখন শোকসন্তপ্ত। সীমান্ত-যুদ্ধে ফ্রাঙ্ক নিহত হইয়াছে। মাসখানেক হইল, কালো বর্ডার দেওয়া চিঠিতে ম্যাগিই এ সংবাদ আমাকে লিখিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলাম, যে সময় আমি মিসেস ক্লিফর্ডকে বলিয়াছিলাম তাঁহার পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে,—তাহার পূর্ব্বেই ফ্রাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে। এই সকল কারণে মিসেস ক্লিফর্ডের নিকট আমার আর মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতে লাগিল। তাই আমি একখানি পত্র লিখিয়া, ম্যাগি ও তাহার মাতার নিকট বিদায় বার্ত্তা জানাইলাম।

ক্রমে লণ্ডনে আমার শেষ রজনী প্রভাত হইল। আমি অন্য দেশ যাত্রা করিব। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে প্রাতরাশে বসিয়াছি, এমন সময় বহির্দ্বারে শব্দ উত্থিত হইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দাসী আসিয়া বলিল, "Please Mr. Gupta. মিস ক্লিফর্ড আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

আমার প্রাতরাশ তখনও শেষ হয় নাই। বুঝিলাম ম্যাগি আমার নিকট বিদায়গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। পাছে তাহার কর্ম্মস্থানে যাইতে বিলম্ব হইয়া যায়, তাই আমি তখনই গৃহকর্ত্রীর অনুমতি লইয়া টেবিল ছাড়িয়া উঠিলাম। হলে গিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া ম্যাগি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

নিকটেই পারিবারিক লাইব্রেরী ছিল, তাহার মধ্যে ম্যাগিকে লইয়া গিয়া বসাইলাম।

ম্যাগি বলিল, "আপনি আজ চলিলেন?"

"হ্যাঁ ম্যাগি, আজই আমার যাত্রা করিবার দিন।"

"দেশে পৌঁছিতে আপনার কয়দিন লাগিবে?"

"দুই সপ্তাহের কিঞ্চিৎ অধিক লাগিবে।"

"কোন্ স্থানে আপনি থাকিবেন?"

"আমি পাঞ্জাব সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছি। কোন্ স্থানে আমাকে থাকিতে হইবে, সেখানে না পৌঁছিলে জানা যাইবে না।"

"সেখান হইতে সীমান্ত কি অনেক দূর?"

"না, অধিক দূর নহে।"

"দেরা-গাজীখাঁর নিকট ফোর্ট মন্‌রোতে ফ্র্যাঙ্কের সমাধি আছে।"—কথাগুলি বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দুইটি ছল ছল করিল।

বলিলাম, "আমি যখন ওদিকে যাইব, তখন অবশ্যই তোমার ভ্রাতার সমাধি দর্শন করিয়া, তোমায় পত্র লিখিব।"

ম্যাগি বলিল, "কিন্তু আপনার কষ্ট ও অসুবিধা হইবে না?"

"কি কষ্ট? কি অসুবিধা? আমি যেখানে থাকিব, সেখান হইতে দেরা-গাজীখাঁ ত অধিক দূর হইবে না। আমি একবার নিশ্চই সুবিধা মত গিয়া, তোমায় পরে সব জানাইব।"

ম্যাগির মুখখানি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আমাকে ধন্যবাদ দিল,—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। নিজের পকেট হইতে একটি শিলিং বাহির করিয়া, আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "আপনি যখন যাইবেন, তখন অনুগ্রহ করিয়া এক শিলিং দিয়া কিছু ফুল ক্রয় করিয়া, আমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া আসিবেন।"

ভাবের আবেগে আমি চক্ষু নত করিয়া রহিলাম।

ভাবিলাম, বালিকার এই বহু কষ্টার্জ্জিত শিলিংটি ফিরাইয়া দিই। বলি, আমাদের দেশে ফুল যেখানে সেখানে অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায়, পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না।

কিন্তু আবার ভাবিলাম—এই যে ত্যাগের সুখটুকু, ইহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করি কেন? এই যে বহু শ্রমলব্ধ শিলিংটি, ইহার দ্বারা বালিকা যেটুকু সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্রয় করিতে পারিত, প্রেমের নামে সে তাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে ত্যাগের সুখটুকু মহামূল্য—সে সুখটুকু লাভ করিলে উহার বিরহতপ্ত হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে শীতল

হইবে। তাহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করিয়া ফল কি?—এই ভাবিয়া আমি সেই শিলিংটি উঠাইয়া লইলাম।

বলিলাম, "ম্যাগি, আমি এই শিলিং দিয়া ফুল কিনিয়া, তোমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া দিব।"

ম্যাগি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আমি আর আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব? আমার কর্ম্মস্থানে যাইবার বেলা হইল। Good bye;—পত্রাদি যেন পাই।"

আমি উঠিয়া ম্যাগির হস্তখানি নিজহস্তে লইলাম। বলিলাম—"Good bye Maggie—God bless you",—বলিয়া তাহার হাতখানি স্বীয় ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া তাহাতে একটি চুম্বন করিলাম।

ম্যাগি চলিয়া গেল।

চক্ষের দুই ফোঁটা জল রুমালে মুছিয়া, বাক্স-তোরঙ্গ গুছাইতে উপরে উঠিয়া গেলাম।

রসময়ীর রসিকতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রমোহন বাবুর অষ্টাদশবর্ষব্যাপী দাম্পত্যজীবন স্ত্রীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি করিতে করিতেই কাটিয়াছে। এমন রণরঙ্গিণী স্ত্রী বঙ্গদেশে প্রায়ই দেখা যায় না।

ক্ষেত্রমোহনের বয়স এখন চল্লিশ বৎসর। স্ত্রী রসময়ীর বয়স ত্রিশ। 'রসময়ী'!—এ নাম যে রাখিয়াছিল, বলিহারি তাহার প্রতিভা! তবে রসও ত অনেকগুলি আছে কি না—এ ক্ষেত্রে রৌদ্ররস!

ক্ষেত্রমোহন একজন বাঙ্গলানবীস মোক্তার; হুগলীতে থাকিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করেন। বাড়ী তাঁহার হুগলীতে নহে—জেলার মধ্যে কোন এক পল্লীগ্রামে। তবে কয়েক বৎসর হুগলীতে নিজ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রমোহনের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই—স্ত্রীর যেরূপ বয়স, আর হইবার ভরসাও নাই। অনেকদিন হইতে তাঁহার মাসী পিসী প্রভৃতি পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনের আন্তরিক বাসনাও তাহাই। কিন্তু রসময়ীর ভয়ে এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টাচরিত্র করিতে সাহস করেন নাই।

ইতিমধ্যে সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষ্যে রসময়ী ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া ক্ষেত্রমোহনকে দুই দিন গৃহছাড়া করিল। অবশেষে নিজে তাহার পিত্রালয় হালিসহরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন তখন সাহসে ভর করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, রসময়ীর আর মুখদর্শন করিবেন না—অন্যত্র বিবাহ করিবেন। এ বাড়ীতে রসময়ীকে আর ঢুকিতে দিবেন না—এই শেষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হালিসহর গ্রামটি হুগলীরই অপর পারে—মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিতা। চৌধুরীপাড়ায় রসময়ীর পিত্রালয়। অনেক দিন হইল তাহার পিতামাতার কাল হইয়াছে। এখন সে বাড়ীতে রসময়ীর বিধবা দিদি বিনোদিনী এবং তাহার দুইটি ছোট ভাই নবীন ও সুবোধ বাস করে। নবীন কাঁচড়াপাড়ার কারখানায় কর্ম্ম করে; সুবোধ স্কুল ছাড়িয়া এখন বাড়ীতেই বসিয়া আছে—এখনও কিছু জুটে নাই।

মাসাধিক কাল রসময়ী হালিসহরে বাস করিতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এরূপ স্থলে দুই চারি দিন বা বড় জোর এক সপ্তাহ পরে, দন্তে তৃণ করিয়া ক্ষেত্রমোহন আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং কত সাধ্যসাধনা করিয়া স্ত্রীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু এবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া রসময়ী কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

পাড়ার একজন বালক প্রত্যহ নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইয়া হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়িতে যাইত। সে ছেলেটি গ্রামে প্রচার করিয়া দিল—ক্ষেত্রমোহন বাবুর বিবাহ; দিনস্থির হইয়া গিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রসময়ীর দিদি বিনোদিনী একদিন বৈকালে ছেলেটিকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাকে সন্দেশ ও রসগোল্লা খাইতে দিয়া বলিলেন—"বাবা, শুনলাম নাকি আমাদের ক্ষেত্তর আবার বিয়ে করছে? এ কথা কি সত্যি?"

বালক বলিল—"হ্যাঁ সত্যি বৈকি। আমাদের ক্লাশে সুরেশ বলে একটি ছেলে পড়ে, চুঁচড়োয় তার মামার বাড়ী। তারই মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে।"

"ঠিক জান?"

"জানি বৈকি। সুরেশই ত আমাকে বলেছে। দিনস্থির পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।"

"তার মামার নাম কি ?"

"নাম হরিশ্চন্দ্র চাটুয্যে। জজ আদালতে কায করেন।"

"তাদের বাড়ীটি তুমি চেন বাবা ?"

"হাঁ চিনি বৈকি। সুরেশের সঙ্গে কতবার গিয়েছি।"

"কত বড় মেয়ে ?"

"এই আমাদের বয়সীই হবে।"—বালকটির বয়স ত্রয়োদশ বৎসর।

"কেমন দেখতে ?"

"তা—বেশ সুন্দর।"

বিনোদিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"আচ্ছা, কাল একবার আমাদের দু' বোনকে সে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারো বাবা ?"

"কেন ?"

"তাদের একবার মিনতি করে বলে দেখি। বিয়ে হলে আমার বোনটিরও সুখ হবে না—তার মেয়েও জলে পড়বে। কাল একবার আমাদের নিয়ে চল।"

"কখন ?"

"এই—খাওয়া দাওয়ার পরে ?"

"আমার ইস্কুল কামাই হবে যে ?"

"একদিনের জন্যে মাষ্টারের কাছে ছুটি নিও এখন ? আমি বরং তোমায় একটি টাকা দেব—ঘুড়ি, নাটাই এ সব কিনো।"

বালকটি ব্যগ্রভাবে নিজ সম্মতি জানাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা এগারোটার সময় দুই ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বালকটি চুঁচুড়া যাত্রা করিল। গঙ্গাপার হইয়া, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া, মাধবীতলায় হরিশবাবুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। খিড়কি দরজার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল।

রসময়ী বলিল—"এই বাড়ী ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তুমি গাড়ীর ভিতর বসে থাক। আমরা চট করে ওঁদের সঙ্গে দেখাটা করে আসি।"—বলিয়া দুইজনেই অবতরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে বাড়ীর মেয়েরা কেহ তখন স্নান করিতেছে, কেহ খাইতে বসিয়াছে, কেহ বা আহারান্তে উঠানে বসিয়া চুল শুকাইতেছে। হঠাৎ দুইজন ভদ্রঘরের অপরিচিতা স্ত্রীলোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একজন সবিস্ময়ে বলিল—"তোমরা কারা গা ?"

বিনোদিনী বলিল—"আমরা হালিসহর থেকে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

স্ত্রীলোকটি সন্দিগ্ধভাবে বলিল—"এস—বস।"

দুইজনে বারান্দায় উঠিয়া উপবেশন করিয়া বলিল—"বাড়ীর গিন্নী কোন্‌টি ?"

একজন প্রৌঢ়াকে দেখাইয়া সকলে বলিল—"ইনি গিন্নী।"

গৃহিণী বলিলেন—"তোমরা কি মনে করে এসেছ বাছা ?"

বিনোদিনী বলিল—"তোমাদের মেয়ের নাকি বিয়ে ?"

গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ—আমার ছোট মেয়েটির বিয়ে।"

'কবে ?"

"এই বিশে মাঘ দিনস্থির হয়েছে।"

"পাত্রটি কে ?"

"ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী—হুগলীতে মোক্তারী করেন।"

"সতীনের উপর মেয়ে দিচ্ছ বাছা ?"

গৃহিণীর বিস্ময় প্রতি কথায় বাড়িয়া চলিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা চেন নাকি ?"

বিনোদিনী বলিল—"চিনিনে আবার—খুব চিনি! আমাদের গ্রামেই ত বিয়ে করেছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ—সতীন আছে বটে—কিন্তু সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে।"

রসময়ী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল; তাহার মনের

রাগ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই কথা শুনিয়া হস্তপদ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—চক্ষু দুইটি লাল হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন পরিত্যাগ করেছে কিছু শুনেছ গা?"

"শুনেছি সে মাগী নাকি বড় দজ্জাল!"

শ্রবণমাত্র রসময়ী তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বারান্দার কোণে ছিল একগাছা ঝাঁটা। নিমেষ মধ্যে সেইটা দুই হস্তে ধরিয়া গৃহিণীর উপর সপাসপ্ মারিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল—"কেন?—কেন?—আর কি মরবার জায়গা পেলে না?—জায়গা পেলে না?—আমার সোয়ামি ছাড়া কি তোমার মেয়ের অন্য পাত্তর জুটলো না? জুটলো না?—"

এই অভাবনীয় ঘটনায় বাড়ীর লোকে ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার পর মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। অল্পবয়স্কা বালিকারা কাঁদিয়া ছুটিয়া কেহ খাটের নীচে, কেহ সিন্দুকের আড়ালে লুকাইল। বাড়ীর ঝি বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, সে বাসন ফেলিয়া—"ওরে খুন কল্লে রে—খুন কল্লে রে—সেপাই—এ সেপাই—এ পাহারাওয়ালা"—বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ীর অপর মেয়েরা আসিয়া রসময়ীকে ধরিয়া ফেলিল। রসময়ী তখন গৃহিণীকে ছাড়িয়া তাহাদের উপর কিল চড় ও নিষ্ঠীবন-বৃষ্টি করিতে লাগিল। কাহারও কাপড় ছিঁড়িয়া দিল, কাহারও চুল ছিঁড়িয়া দিল, কাহাকেও খামচাইয়া দিল, কাহাকেও কামড়াইয়া দিল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিল—"কনেটি গেল কোথা? তাকে একবার বের কর না! চোখ দুটো গেলে দিয়ে যাই! নাকটা কেটে দিয়ে যাই! দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিয়ে যাই!"

বিনোদিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ক্রমে সদর দরজায় লোক হৈ হৈ করিতে লাগিল। তখন সে বলিল—"রসময়ী—থাম্ থাম্—ক্ষ্যামা দে বোন—খুব হয়েছে। চল্ বাড়ী চল্।"

ঝি ছুটিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ওগো যেতে দিওনি—থানায় খবর দিয়ে এসেছি, দারোগা আসছে।"

পুলিশের নাম শুনিয়া রসময়ী বলিল—"চল দিদি, চল।"

"যাবে কোথা—দারোগা আসুক তবে যেও।"—বলিয়া দুই তিনটি স্ত্রীলোক রসময়ীকে ধরিতে অগ্রসর হইল।

রসময়ী এক লম্ফে উঠানের কোণ হইতে আঁশবটিখানা সংগ্রহ করিয়া মাথার উপর সবেগে ঘুরাইয়া বলিল—"খুন চেপেছে—আমার খুন চেপেছে—সবাইকে খুন করে ফাঁসি যাব।"

ইহা দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীলোক 'মা গোঃ' বলিয়া ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। "পাহারাওয়ালা—এ পাহারাওয়ালা—আসামী পালায়"—বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঝি পুনশ্চ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

রসময়ী তখন দিদির সহিত খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বলিল—"পারঘাটে চল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বলা বাহুল্য, হরিশচন্দ্রবাবু ক্ষেত্রমোহনকে কন্যাদান করিলেন না। তাঁহার গৃহিণী বলিলেন—"সে খুনে মেয়েমানুষ, বিয়ে দিলে আমার মেয়েকে খুন করে ফেলবে। তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।"

পরদিন কাছারীতে গিয়া হরিশবাবুর মুখে ক্ষেত্রমোহন সকল কথাই শ্রবণ করিলেন। রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল।

কাছারি হইতে বাড়ী ফিরিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, অন্তঃপুরে বসিয়া ক্ষেত্রবাবু তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের মত রসময়ী আসিয়া প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক হইয়া ক্ষেত্রমোহনের পানে দৃষ্টিপাত করিল—সেই প্রকার দৃষ্টিপাত, যে দৃষ্টিপাতে পূর্ব্বে মুনি-ঋষিরা লোককে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"কি মনে করে?"

রসময়ী অসম্ভব সংযমের সহিত উত্তর করিল—"একটা শ্রাদ্ধের

যোগাড় করতে।” তাহার ওষ্ঠযুগল ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল।

তামাক টানিতে টানিতে ক্ষেত্রমোহন বাবু বলিলেন—“শ্রাদ্ধটা কার?”

“হরিশ চাটুয্যের মেয়ের—আর মেয়ের মার।”

“তা হলে দুটো শ্রাদ্ধ বল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজেরটাও সেরে নিলে হয় না?”

“সেইটি হবে না এখন। বুড়ো বয়সে বিয়ে করছ নাকি শুনলাম?”

হুঁকা নামাইয়া, একটু উত্তেজিত ভাবে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—“করছিই ত। করব না কেন? তোমার ভয়ে না কি?”

রসময়ী চীৎকার করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—“কর না, করে একবার মজাটাই দেখ না!”

“কি করবে তুমি?”

“এই এমন কিছু না। আঁশবঁটি দিয়ে সে মেয়ের নাকটা কেটে দেব—আর বুকে একখানা দশমুণে পাথর চাপিয়ে দেব।”

“আর তোমার নাকটা কাণটা কেউ যদি কেটে দেয়?”

“এস না! কাট না! তুমিই কাট না হয়!”—বলিয়া রসময়ী নিজ কোমরে দুই হাত দিয়া, ঝুঁকিয়া, নিজের মুখ ক্ষেত্রমোহনের অতি নিকটে সরাইয়া দিল।

স্ত্রীর এতাদৃশ বিনয় দেখিয়া ক্ষেত্রমোহন আবার হুঁকা উঠাইয়া লইয়া আপন মনে টানিতে লাগিলেন। ঝুঁকিয়া থাকিয়া যখন ক্লান্তি বোধ হইল, রসময়ী তখন নিজের মুখ সরাইয়া লইয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল—“তা হলে আঁশবঁটিতে শাণ দিয়ে রাখিগে? সম্বন্ধ পাকা হলে খবরটা দিও—চুপি চুপি যেন শুভকর্ম্মটা সেরে ফেল না!”

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—“তুমি না মরলে আর বিয়ে করছিনে। মরবে কবে?”

এই কথা শুনিয়া রসময়ী বিদ্রূপের স্বরে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—“আমি মরব কবে জিজ্ঞাসা করছ? রসি বামনি

এখনি মরছে না। তার এখনও অনেক দেরী—বিস্তর বিলম্ব। তোমার বিয়ে করবার বয়স যাবে—বুড়ো থুড়থুড়ো হবে—ভুঁয়ে মুয়ে হয়ে যাবে—যখন আর কেউ তোমায় মেয়ে দিতে রাজি হবে না—তখন আমি মরব।"

দাম্পত্য রসালাপ এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে বাহিরে একখানি গাড়ী থামিবার শব্দ হইল। রসময়ী বলিল—"তবে সেই কথাই রইল। এখন তবে আসি। দিদি ওপাড়ায় তার যায়ের বাড়ী গিয়েছিল—ভাবলাম তার সঙ্গে এসে তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কয়ে যাই।" বলিয়া রসময়ী প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উক্ত কথোপকথনের পর ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। রসময়ীর গর্ব্ব সফল হইল না। সে এখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত।

সংবাদ পাইয়া ক্ষেত্রমোহন বাবু হালিসহরে গেলেন। চিকিৎসাদির কিছুই ত্রুটি হইল না।

কিন্তু রসময়ী বাঁচিল না।

গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর মুখাগ্নি করিলেন। আশ্চর্য্য সংসারের মায়া—যে এত কষ্ট দিয়াছে, তাহার জন্যও ক্ষেত্রমোহন ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

আরও মাস ছয় কাটিল। ক্ষেত্রমোহনের পার্শ্বচর বন্ধুবান্ধবগণ নানা স্থানে পাত্রী অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। অবশেষে হুগলীর নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে সুযোগ্য পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন স্বয়ং গিয়া দেখিয়া আসিলেন। মেয়েটি ডাগর—দেখিতেও ভাল। বিশেষ, মেয়ের পিতা একটি বড় জমিদারের নায়েব—ওদিককার মামলা মোকর্দ্দমাগুলিও এই সূত্রে ক্ষেত্রমোহন বাবুর করায়ত্ত হইবে! কন্যার পিতা রজনীকান্ত ঘোষাল ইংরাজী লেখাপড়া-জানা ব্যক্তি।

বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইল! বরের খুড়া মহাশয় গ্রাম হইতে

আসিয়াছেন—কল্য আশীর্ব্বাদ। প্রভাতে অফিসকক্ষে বসিয়া দুই চারিজন মক্কেলের সঙ্গে মোক্তারবাবু কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন—খুড়া মহাশয় একখানি 'বঙ্গবাসী' হস্তে ঘরের কোণে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় ডাকপিয়ন আসিল, ক্ষেত্রমোহন বাবুর হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল।

খামের উপর হস্তাক্ষরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষেত্রমোহনের মাথা ঘুরিয়া গেল। দুই চারিবার চক্ষু রগড়াইয়া বারম্বার খামখানির শিরোনামা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাছে আনিয়া, দূরে সরাইয়া, নানা প্রকারে দেখিলেন।

অবশেষে কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিলেন। পড়িয়া তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মক্কেলগণকে বলিলেন—"আচ্ছা, এখন তোমরা যাও—আজ সকাল সকালই কাছারি যাব—সেইখানেই বাকী কথাবার্ত্তা হবে এখন।"

মক্কেলগণ চলিয়া গেলে খুড়া মহাশয় বলিলেন—"চিঠি এল ক্ষেত্তর?"

জড়িতস্বরে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ।"

"কোথাকার চিঠি?"

"তাই ত ভাবছি!"

ক্ষেত্রমোহনের মুখভাব এবং কণ্ঠস্বরের বিকৃতি লক্ষ্য করিয়া খুড়া মহাশয় উঠিয়া নিকটে আসিলেন। তখন ক্ষেত্রমোহন পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিতেছেন। তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, চক্ষু কপালে উঠিয়াছে।

খুড়া মহাশয় দ্রুতভাবে বলিলেন—"কি? ব্যাপার কি? কোনও দুঃসংবাদ নয় ত?"

ক্ষেত্রমোহন বাবু নীরবে পত্রখানি খুড়া মহাশয়ের হাতে দিলেন। তিনি পত্র লইয়া চশমা অনুসন্ধান করিয়া চক্ষে পরিলেন। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া খুড়া মহাশয় পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। সাধারণ পাতলা চিঠির কাগজে, বেগুনী রঙের ম্যাজেণ্টা কালি দিয়া লেখা—উপরে স্থানের নাম নাই, তারিখ নাই—নিম্নপ্রকার লিখিত :—

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়

প্রণামপুর্ব্বক নীবেদনঞ্চ বিসেস—

তোমার মোতিশ্চন্ন ধরিআছে। মোনে করিআছ রসমই মরিআছে আপোদ গিআছে। এইবার বিবাহ করি। আমি মরিআছি বটে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি নিস্কিতি পাইআছ তাহা মোনেও করিও না। বাড়ির সনমুখে যে বটগাচ আছে তাইতে আমি আজ কাল বাস করিতেছি। তুমি কি কর কোতায় যাও সমস্তই আমি সেখানে বসিয়া দেখিতেছি। রাত্তিরে গাচ হইতে নামিয়া মাজে মাজে তোমার সয়নঘরে যাই। তোমার খাটের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াই। এক একবার ইচ্ছা করে গলাটা টিপিয়া দিআ তোমাকেও আমার সঙ্গি করি। আমার একানে বর্ডো একলা বোধ হয়। আমার চেহারা একন ওতিশয় খারাপ হইয়া গিআছে। আমার গাএর মাংসো চামড়া আর কিছুই নাই। খালি হাড় আছে তাও সাদা নয়। গংগাস্তিরে আমাকে জে পোড়াইআছিলে তাইতে হাড়গুনো কালো কালো হইয়া গিআছে। যাহা হউক নিজের রূপ বর্ন্ননা নিজের মুখে শোভা পায় না। বিবাহ করিও না করিলে তোমার নলাটে অসেস দুগগতি নেকা আছে।

রসমই।

পত্র পড়িয়া খুড়া মহাশয়েরও মুখ কালিমাময় হইয়া গেল। ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ হাতের লেখা কার চিনতে পারছ?"

"খুব চিনি। তারই হাতের লেখা।"

"অন্য কেউ জাল করেনি ত?"

"ভগবান জানেন।"

খুড়া মহাশয় নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ ছাদের কড়িকাটের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"জয়রাম—সীতারাম—রাম-রাঘব-রাবণারি—রাম—রাম—রাম।"

খুড়া মহাশয়কে এতদবস্থায় দেখিয়া, ক্ষেত্রমোহনের আরও ভয় হইল। বলিলেন—"আচ্ছা খুড়ো মশায়—ভূতে কখন চিঠি লেখে?"

খুড়া মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"ভূত বলতে নেই—ভূত বলতে নেই—উপদেবতা বল। জয় রাঘব রামচন্দ্র।"

দুইজনেই নির্ব্বাক। অবশেষে খুড়া মহাশয় বলিলেন—"দেখ—কারুর বদমাইসি নয় ত? এমনটাই কি হতে পারে? অনেক রকম ভৌতিক উপদ্রবের কথা শুনেছি বটে—কিন্তু—এ রকমটা—কখনও ত শোনা যায় নি। আচ্ছা,—বউমার হাতের লেখা আগেকার চিঠিপত্র কিছু আছে কি? লেখাটা মিলিয়ে দেখলে হয়?"

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"পুরাণো চিঠি আছে বৈ কি।"—বলিয়া বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারি পাঁচখানা বাহির করিয়া আনিলেন।

খুড়া মহাশয় চশমার কাচ দুইখানি কোঁচার কাপড়ে ভাল করিয়া মার্জ্জনা করিয়া লইলেন। পরে পত্রগুলি লইয়া অত্যন্ত সাবধানে হস্তাক্ষর মিলাইতে লাগিলেন। অবশেষে সেগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"একই হাতের লেখা ত দেখছি।" খামখানা উলটিয়া পালটিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক পয়সার ছয়খানা-ওয়ালা সাধারণ শাদা খাম। তাহাতে একখানি দুই পয়সার টিকিট আঁটা আছে। ক্ষেত্রমোহনের হাতে খামখানি দিয়া বলিলেন—"কোথাকার ছাপ দেখ ত?"

ক্ষেত্রবাবু বাঙ্গলানবীশ মোক্তার হইলেও ইংরাজি ছাপার অক্ষর পড়িতে পারিতেন। ছাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"হুগলির ছাপ। কালকের তারিখ।"

খুড়া মহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে কেবল অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন—"জয় রাম—শ্রীরাম—সীতারাম।"

কাছারির বেলা হয় দেখিয়া মোক্তারবাবু স্নান করিয়া আহারে বসিলেন—কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না। রান্নাঘরের বারান্দায় যেখানে বসিয়া তিনি আহার করিতেছিলেন, সেখান হইতে বটগাছটার অগ্রভাগ দেখা যায়। খান, আর মাঝে মাঝে সেই গাছটার পানে চাহেন। এক সময় একটা গাছের ডাল খড় খড় করিয়া নড়িয়া উঠিল। কাহার যেন হাসিরও শব্দ শোনা গেল। ক্ষেত্রমোহন বাবুর আর খাওয়া হইল না। উঠিয়া পড়িলেন। মুখ প্রক্ষালন করিয়া

বাহিরে আসিয়া বটগাছটার পানে চাহিয়া রহিলেন। দুই তিনটা কাঠ-বিড়ালী ডালে ডালে পরস্পরকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে। গোটাকতক কাক উচ্চশাখায় বসিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছে। ইহা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় ক্ষেত্রমোহনের শয়নকক্ষে খুড়া-ভাইপো বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। দিবসে খুড়ামহাশয় কপাটের বাহিরে এবং ভিতরে দেওয়ালময় রামনাম লিখিয়া দিয়াছেন। অদ্য দুইজনেই এক শয্যায় শয়ন করিবেন। বালিসের তলায় একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ রক্ষিত হইবে। এবং ঘরে সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলিবে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"তা হলে খুড়ো মশায়, কি করা যায়? বিবাহটা বন্ধ করে দেওয়া যাবে?"

খুড়া মহাশয় বলিলেন—"আমি ত তার দরকার দেখছিনে।"

"যদি কোনও উপদ্রব অত্যাচার হয়?"

খুড়া মহাশয় কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"ভয়ের কোনও কারণ দেখিনে।"

"ঐ যে বলেছে 'ইচ্ছা করে তোমার গলাটা টিপে দিই'?"

"নাঃ—তা পারবে না। হাজার হোক স্বামী ত বটে!"

"আর যে বলেছে 'বিয়ে কোরো না, করলে তোমার অশেষ দুর্গতি হবে'?"

"অশেষ দুর্গতি হবে, তার মানে এ নাও হতে পারে যে আমি তোমার অশেষ দুর্গতি করব। ওর মানে বোধ হয় এই যে, অধিক বয়সে বিবাহ করলে যে সমস্ত সাংসারিক অশান্তি উপস্থিত হয়, তাই তোমারও অদৃষ্টে ঘটবে।"

ক্ষেত্রমোহন বাবু চুপ করিয়া রহিলেন। মনে ভয়ও যথেষ্ট আছে—অথচ বিবাহ করিবার লোভটিও সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য।

পরদিন আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল; কিন্তু ক্ষেত্রমোহন যে ভৌতিক পত্র পাইয়াছেন সে কথাও রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। নায়েব রজনী বাবুরও কাণে ক্রমে এ কথা পৌঁছিল। বলিয়াছি—তিনি ইংরাজী-জানা ব্যক্তি,—শুনিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ভূত! এই বিংশ শতাব্দীতে ভূত বিশ্বাস করতে হবে?"

বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে ৮ই ফাল্গুন। আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী আছে। উভয় পক্ষ হইতে সমস্ত আয়োজনাদি হইতেছে। বিকালে বৈঠকখানায় ক্ষেত্রবাবু জনকয়েক বন্ধু-বান্ধব সহ বসিয়াছিলেন।—ইঁহাদের মধ্যে একজন সরকারী উকিল—নাম মনোহরবাবু। লোকটির বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। চোখে সোণার চশমা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—মুখমণ্ডল প্রচুর গোঁফদাড়িতে আবৃত—হাতে বড় বড় নখ—এক কথায়,—লোকটি থিয়জফিষ্ট। ক্ষেত্রবাবুর ভৌতিক পত্র প্রাপ্তির সমাচার অবগত হইয়া অবধি, মনোহর বাবু ইঁহার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া লইয়াছেন।—অপর একজন নব্য যুবক—নাম সুরেন্দ্রনাথ। ইনি এল-এ ফেল করা শিক্ষিত মোক্তার। বিস্তর ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"ক্ষেত্রবাবু, একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। অনেক উপন্যাসে পড়া গেছে, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যেমন রেলে কলিশন বা নৌকাডুবি বা আর কিছু, সকলেই মনে করেছে অমুক লোকটা মরে গেছে, মৃত্যুর চাক্ষুষ সাক্ষীরও অভাব নেই,—কিন্তু বইয়ের শেষ দিকটায় দেখা গেল সে বেঁচে আছে। তাই আমার মনে হয়, হয় আপনার স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন, নয় এ চিঠি জাল। কিন্তু আপনার দৃঢ় বিশ্বাস এ চিঠি তাঁরই হাতের লেখা—জাল নয়। সুতরাং আপনার স্ত্রী বেঁচে আছেন বিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই। কারণ, এ বিংশ শতাব্দীতে, ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারা যায় না।"

থিয়জফিষ্ট উকিল বাবুটি ইহা শুনিয়া বলিলেন—"কেন মশাই—বিংশ শতাব্দীতে ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারেন না কেন?"

নবীন মোক্তারবাবু বলিলেন—"কারণ আমি কখনও দেখিনি।"

শুনিয়া মনোহরবাবু বিজ্ঞভাবে হাস্য করিয়া বলিলেন—"সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডকে কখনও দেখেছেন ?"

"না, দেখিনি।"

"তিনি আছেন বলে বিশ্বাস করেন ?"

"করি। তার কারণ, আমি না দেখলেও, হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখেছে। তাঁর দশ বিশ খানা ছবিও দেখেছি। কিন্তু 'ভূত আমি নিজে দেখেছি' এমন কথা আজ পর্য্যন্ত কাউকে বলতে শুনলাম না। সবাই বলে, খুব বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছে যে তারা স্বয়ং ভূত দেখেছে।"

মনোহরবাবু তাঁহার সুঘন দাড়ির মধ্যে দীর্ঘনখ অঙ্গুলিগুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন—"আপনি বললেন, হাজার হাজার লোক সম্রাটকে দেখেছে। তেমনি হাজার হাজার লোক অশরীরী আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করেছে। আপনি বললেন যে, সম্রাটের দশ বিশ খানা ছবি দেখেছেন। তেমনি দশ বিশ খানা ভূতেরও ছবি আপনাকে আমি দেখাতে পারি। যদি দেখতে চান, একদিন আমার বাড়ীতে যাবেন। আমার একখানা বইয়ে কেটি কিং-এর ছবি আছে। প্রথম চার্লসের সময় কেটি কিং নামে একটি মেয়ে জীবিত ছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থানে অনেক সেয়াঁসে, কেটি কিং স্থূলশরীর ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করা হয়েছে, তাঁর শরীরে ছুরী ফুটিয়ে দিয়ে দেখা হয়েছে ঠিক মানুষের মত রক্তপাত হয়, তাঁর ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তোলা হয়েছে; ফটোগ্রাফ থেকে তৈরি ছবি আমার বইয়ে আছে—আসবেন, দেখাব।"

সুরেন্দ্রবাবু মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"আপনারাও যেমন ভাল মানুষ! ঐ সব বিশ্বাস করেন ? ভূতবাদীদের কত জোচ্চুরি ধরা পড়েছে তার সংখ্যা নেই। কেটি কিং-এর দেহে ছুরী ফুটিয়ে রক্তপাত হয়েছে, ঐটে আপনি বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ বলে উল্লেখ করলেন। আমার ত ঠিক উল্টো মনে হয়। ছুরী ফোটালে রক্ত না পড়ত—অথচ শরীরী মানুষ একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখছি—তা হলে

বরং বিশ্বাস হত এটা বাস্তবিক মানুষ নয়। এ ক্ষেত্রে দেখুন, ভূত, তিনি বাড়ীর সামনেই বটগাছে থাকেন। চিঠি যখন লিখতে পারেন, তখন অনায়াসেই মূর্ত্তি গ্রহণ করে নিজের বক্তব্য বলে যেতে পারতেন। কিন্তু তা না করে খাম, কাগজ, কালী, কলম সংগ্রহ করবার কষ্ট স্বীকার করলেন। এইটুকু থেকে এইটুকু—চিঠিখানি টেবিলের উপর রেখে গেলেই হত, তা না করে এক মাইল দূরে পোষ্ট আপিসে গেলেন তাকে পোষ্ট করতে। আবার দুটো পয়সা খরচ করে টিকিট কিনতে হল। মশায়, ভৌতিক জগতে পয়সা যদি বাস্তবিকই এত সস্তা হয়, তা হলে না হয় সেইখানে গিয়েই প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করি!"

মনোহরবাবু একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"মশায়, জিনিষটা হাসি তামাসার নয়। এ সব গভীর বিষয়। অনেক চর্চ্চা, অনেক আলোচনা না করে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়। ভৌতিক জগৎ থেকে ডাকে চিঠি আসা এই প্রথম নয়। হিমালয় থেকে মহাত্মারাও মাঝে মাঝে ডাকে চিঠিপত্র লিখে থাকেন। কুটুম্বিলাল নামক এক মহাত্মা এ রকম অনেক চিঠি আমাদের মাদাম ব্লাভাট্‌স্কিকে লিখেছিলেন। তাঁরাও মনে করলে সাক্ষাৎ আবির্ভাব হয়ে বক্তব্য বলে যেতে পারতেন কিম্বা চিঠি উড়িয়ে টেবিলের উপর ফেলে যেতে পারতেন—কিন্তু ডাকেই তাঁরা চিঠিপত্র পাঠাতেন।"

ইহা শুনিয়া শিক্ষিত মোক্তারবাবু মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"কুটুম্বিলালের চিঠি ত কোন্ কালে জাল বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। ডাক্তার হজ্‌সন বলে একজন বৈজ্ঞানিক নিজে ভারতবর্ষে এসে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি আর দামোদর বলে এক ব্যক্তি সব চিঠি জাল করেছিলেন।"

একথা শুনিয়া থিয়জফিষ্ট বাবুটি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"ও সব ঈর্ষাপরায়ণ লেখকের বই পড়বেন না। আমার কাছে আসবেন, ভাল ভাল বই সব আপনাকে পড়তে দেব। তা পড়লে আপনার সমস্ত অবিশ্বাস দূর হয়ে যাবে। মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি যে কত বড় লোক তা তাঁর 'আইসিস্ আন্‌ভেল্ড' বইটে পড়লেই বুঝতে পারবেন।"

সুরেন্দ্রবাবু মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সে বইটে পড়িনি বটে, তবে এড্‌মণ্ড গ্যারেট প্রণীত "আইসিস্‌ ভেরি মচ্‌ আন্‌ভেল্ড—অর্‌ দি ষ্টোরি অব্‌ দি গ্রেট মাহাৎমা হোক্স" বইটে পড়েছি। লাইব্রেরীতে আছে। দেখতে চান ত এনে দিতে পারি।"

এ কথায় মনোহরবাবু রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ঐ আপনারা এক কথা শিখে রেখেছেন! গাল দেওয়া যায় না এমন ভাল জিনিষই নেই। যত সব কুচক্রী বদমায়েস লোক মিছামিছি মাদামের অপরাধ রটনা করেছে।"

এমন সময় বাহিরে শব্দ উত্থিত হইল—"বাবু—চিঠি আছে।"

পরমুহূর্ত্তে ডাকপিয়ন প্রবেশ করিয়া ক্ষেত্রবাবুর হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি হাতে লইয়াই ক্ষেত্রমোহন বাবুর চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বলিলেন—"মশাই—আবার সেই।"

পত্র খুলিয়া পাঠ করিয়া সেখানি সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। থিয়জফিষ্ট বাবুটি অতি আগ্রহের সহিত সেখানি কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিলেন। শেষে নবীন মোক্তারবাবুর হাতে সেখানি দিলেন।

পত্রখানি এইরূপ—

শ্রীশ্রী দুর্গা

সহায়

প্রণাম পুর্ব্বক নীবেদনঞ্চ বিসেস

এত সাহস তোমার। আসিব্বাদ পজন্ত হইয়া গিআছে। তুমি মোনে করিআছ আমি তোমায় জে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা ফাকা আওআজ। রসি বামনি তেমন মেয়ে নয়। আমি মানা করা সত্যেও বিবাহ করিবে। একনও সাবধান হও। এ দুরমোতি পরিত্যাগ কর। নহিলে একদিন গভির রাত্তিরে তুমি যকন ঘুমাইয়া থাকিবে বটগাচ হইতে নামিয়া তোমার বুকে একখান দসমুনে পাতর চাপাইয়া দিব। ঘুম আর ভাঁগিবে না।

রসমই।

একে একে সকলে পত্রখানি পড়িলেন। পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। শিক্ষিত মোক্তারবাবুরও মুখ শুকাইয়া গেল। তথাপি তিনি

মন হইতে সংশয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা ক্ষেত্রবাবু— আর একবার বেশ করে লেখাটা পরীক্ষা করে দেখুন দেখি। আপনার স্ত্রীর হাতের লেখাই বটে ত? না কোন জায়গায় কোন সন্দেহজনক তফাৎ আছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"কোন সন্দেহ নেই। শুধু হাতের লেখার মিল হলেও বা সন্দেহ করতাম। তার যেখানে যেখানে যে যে বানানভুল চিরকাল হত, এ চিঠিতেও তাই। সে চিরকালই শ্রীশ্রী এক জায়গায়, দুর্গা একটু তফাতে লিখত—এ দুখানা চিঠিতেও তাই। তা ছাড়া, চিঠিতে এমন সব কথাবার্ত্তা রয়েছে যা সে জীবিত কালেও মুখে সর্ব্বদা ব্যবহার করত।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎপরে সুরেন্দ্রবাবু গলা ঝাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাঁর মৃত্যুর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"ছিলাম বৈকি।"

"সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে গিয়েছিলেন?"

"গিয়েছিলাম।"

"চিতার উপর তাঁর দেহ রাখবার পর তাঁর মুখ আপনি আর দেখেছিলেন?"

"দেখিনি আবার? আমি নিজেই ত মুখাগ্নি করেছি। ওহে তুমি যা ভাবছ তা নয়। কোনও ভুল হয় নি।"

নব্য মোক্তারবাবু তখন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বলিল—"There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy"

(হে হোরেশিও—স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার বিষয় তোমার দর্শনবিজ্ঞান স্বপ্নেও অবগত নহে)।

অপর একজন বলিলেন—"তা ত বটেই, তা ত বটেই। ধরুন আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশই বা বলি কেন—সকল দেশেই, আদিকাল থেকে যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, ভূত বলে একটা জিনিষ আছে, তার কি কিছুই ভিত্তি নেই?"

সরকারী উকিল বাবুটি বলিলেন—"শুধু অন্ধ বিশ্বাসের কথা নয়। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপে ও আমেরিকায় ভূতের অস্তিত্ব নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। এক সময় বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ টিণ্ডাল পর্য্যন্ত ভূতকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন আর শিক্ষিত সমাজে সে ভাব নেই। বিখ্যাত সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেব তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন —"of all the vulgar superstitions of the half educated, none dies harder than the absurd delusion that there are no such things as ghosts (অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে যতগুলি ইতরজনোচিত কুসংস্কার আছে, তাহার মধ্যে 'ভূত নাই' এই অদ্ভুত ভ্রমটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল)"—বলিয়া বিজয়ী বীরের মত তিনি সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল—সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল। সেই বটগাছের তলা দিয়া যাইতে সুরেন্দ্রবাবুরও গাটা যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খুড়া মহাশয় কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, দ্বিতীয় পত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন—"দেখ ক্ষেত্তর— ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। বিবাহটা এখন না হয় বন্ধই রাখা যাক। আমার মতে, বৎসর পূর্ণ হলেই, গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ড দিয়ে এস, উদ্ধার হয়ে যাবেন। বৎসর পূর্ণ হতে ত আর বেশী দেরী নেই—আর মাসখানেক হলেই হয়। তখন নির্ব্বিঘ্নে শুভকর্ম্ম শেষ করা যাবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"তা বেশ—সেই ভাল কথা।"

কন্যার পিতাকে বলিয়া কহিয়া বিবাহের দিন পিছাইয়া দেওয়া হইল। নিমন্ত্রণ পত্র সমস্ত প্রত্যাহৃত হইল। গয়া-শ্রাদ্ধ সারিয়া আসিয়া ক্ষেত্রবাবু বিবাহ করিবেন ইহা সকলেই জানিতে পারিল।

ক্ষেত্রবাবুর হস্তে একটা বড় জালিয়াতির মোকর্দ্দমার তদ্বিরের ভার রহিয়াছে। মোকর্দ্দমাটা দায়রা-সোপর্দ্দ হইয়াছে। সেটা শেষ না হইলে ক্ষেত্রবাবু গয়া যাইতে পারিতেছেন না। ফরিয়াদি পক্ষের সাক্ষীদিগকে সমস্ত দিন ধরিয়া তালিম দিতে হইতেছে।

মোকর্দ্দমার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা কাছারি হইতে ফিরিবার সময় 'রসময়ী'র তৃতীয় পত্র ক্ষেত্রবাবুর হস্তগত হইল। তাহাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখা আছে—

"সুনিলাম না কি গয়ায় আমার পিণ্ডি দিতে যাইতেছ। ভাবিআছ বুঝি পিণ্ডি দিলে আমি উধার হইয়া যাইব তকন সচন্দে বিবাহ করিবে। গয়ায় যদি যাও তবে চোরের বেস ধরিয়া রেলগাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।"

ক্ষেত্রবাবুর আর বাড়ী যাওয়া হইল না। কাছারির পোষাকেই মনোহরবাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহাকে পত্র দেখাইলেন।

মনোহরবাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন—"এ যে বড়ই বিপদ দেখছি। বিবাহ করবার কল্পনা আপনাকে পরিত্যাগ করতে হল।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"আচ্ছা মশায়, অশরীরী আত্মা মানুষের বুকে ছুরী বসিয়ে দিতে পারে? আপনাদের থিয়জফি শাস্ত্রে কি বলে?"

মনোহরবাবু একখানি মোটা বহি আলমারি হইতে পাড়িয়া এক স্থান খুলিয়া বলিলেন—"এ সম্বন্ধে থিয়জফি শাস্ত্রের মত এই—মুক্তাত্মাগণ সাধারণতঃ অশরীরী। কিন্তু কখন কখনও তাঁরা নিজেকে মেটিরিয়েলাইজ অর্থাৎ জড়দেহসম্পন্ন করে থাকেন। তাঁদের এমন ক্ষমতা আছে যে, বায়ু থেকে, গাছপালা থেকে, ভূমি থেকে,—এমন কি কাছাকাছি মানুষের দেহ থেকে, আবশ্যক পদার্থগুলি সংগ্রহ করে নিজ দেহ ধারণ করেন। সুতরাং সে অবস্থায় বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আর এও বিবেচনা করুন না, যে হস্ত কলম ধরে চিঠি লিখতে সক্ষম, সে হস্ত ছুরী ধরতে পারবে না কেন?"

ক্ষেত্রমোহন বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখুন, এ পত্রগুলো জাল কিনা সেটা একবার ভাল করে তদন্ত করতে

হচ্ছে। আমি বলি কি, এই যে কলকাতা থেকে হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক আমাদের দায়রার মোকর্দ্দমায় সাক্ষী দিতে আসছেন, তাঁকে দিয়ে এ চিঠি গুলো পরীক্ষা করালে হয় না ?"

থিয়জফিষ্ট বাবুটি ক্ষেত্রমোহনের এ সন্দেহবাদে মনে মনে বিরক্ত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—"তা—যদি আপনার ইচ্ছে হয়, পরীক্ষা করাতে পারেন।"

পরদিন দায়রায় জালের মোকর্দ্দমাটির বিচার আরম্ভ হইল। হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক সফ্‌টমোর সাহেব সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। দিন শেষে কাছারির পর, ক্ষেত্রমোহন ডাক-বাঙ্গলায় গিয়া সফ্‌টমোর সাহেবকে ভৌতিক পত্র তনখানি দিলেন। তুলনার জন্য রসময়ীর কয়েকখানি পুরাতন আসল পত্রও দিয়া আসিলেন। সাহেব বলিলেন—"কল্য প্রাতে পরীক্ষার ফলাফল জানাইব।"

পরদিন প্রাতঃকালে সরকারী উকীল মনোহরবাবুকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রমোহন আবার ডাক-বাঙ্গলায় উপস্থিত হইলেন। সাহেব বলিলেন—"পরীক্ষাধীন পত্র তিনখানি এবং আসল পত্রগুলি সমস্তই এক হস্তের লেখা।"

ইহা শুনিয়া ক্ষেত্রবাবুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল। মনোহরবাবু বলিলেন—"সাহেব, অনুগ্রহ করিয়া একখানি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতে পারেন ?"

সাহেব মনে করিলেন—নিশ্চয়ই এ পত্র লইয়া একটা মামলা মোকর্দ্দমা হইবে। আবার সাক্ষী দিতে আসিয়া ফী পাওয়া যাইবে।—সুতরাং আহ্লাদের সহিত তিনি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

বাসায় যাইতে যাইতে মনোহরবাবু ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন—"এই চিঠিগুলির নকল আর সায়েবের সার্টিফিকেট যদি আমাদের 'থিয়জফিক্যাল রিভিউ' নামক মাসিক পত্রে ছাপাতে পাঠাই তাতে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি ?—আমরা যাকে স্পিরিট্-রাইটিং বলি, তার সুন্দর অকাট্য প্রমাণ হবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"তাতে আমার আপত্তি নেই।"

পরবর্ত্তী সংখ্যা 'থিয়জফিক্যাল রিভিউ' পত্রে সার্টিফিকেট সহ চিঠিগুলি

ছাপা হইয়া গেল। নানাস্থান হইতে বড় বড় থিয়জফিষ্টগণ ক্ষেত্র-মোহন বাবুকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ হুগলীতে আসিয়া পত্রগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

থিয়জফিষ্ট মহলে ক্ষেত্রবাবুর পসারের আর সীমা নাই—কিন্তু ইহাতে তিনি কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিলেন না। পত্রগুলি জাল প্রমাণ হইলে তিনি বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিতেন। ভয়ে গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান করিতেও পারিলেন না। তাঁহার অদৃষ্টে বুঝি বিবাহ আর নাই!

চৈত্র মাস আসিল—বসন্তের বাতাস বহিতেছে। দোল উপলক্ষ্যে কাছারি বন্ধ। ক্ষেত্রমোহন বাড়ীতে বসিয়া নিজ দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল, হালিসহরে তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে মহাবিপদ উপস্থিত। দোল উপলক্ষ্যে বাজি পোড়াইতে গিয়া, একটা বোম্ ফুটিয়া তাঁহার ছোট সম্বন্ধী সুবোধ বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাকে হুগলীর হাঁসপাতালে আনা হইয়াছে।

শুনিয়া ক্ষেত্রবাবু থাকিতে পারিলেন না—গাড়ী ভাড়া করিয়া হাঁসপাতাল অভিমুখে ছুটিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, ছেলেটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—বিছানার নীচে মেঝের উপর বসিয়া বিধবা বিনোদিনী রোদন করিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনকে দেখিয়া তিনি আরও রোদন করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন ঔষধ-প্রয়োগ ও শুশ্রূষা চলিল। সন্ধ্যার দিকে ডাক্তারেরা বলিলেন আর প্রাণের আশঙ্কা নাই।

ক্ষেত্রমোহন শ্যালিকাকে বলিলেন—"ঠাকুরঝি, সন্ধ্যা হল—এইবার বাড়ী চল।"

বিনোদিনী বলিলেন—"আমি সুবোধকে ছেড়ে বাড়ী যেতে পারব না।"

"সমস্ত দিন অনাহারে আছ—স্নানাহার পর্য্যন্ত হল না!"

"তা না হোক! আমি যেতে পারব না।"

অবস্থা বুঝিয়া হাঁসপাতালের ডাক্তারেরা বলিলেন—"আপনাকে বাড়ী যেতে হবে। এখানে ত রাত্রে থাকতে পাবেন না। কাল সকালে আবার আসবেন এখন। আর কোন ভয় নেই। বিপদ যা, তা কেটে গেছে। আমরা সেবা শুশ্রূষা করব—আপনার কোন চিন্তা নেই—আপনি বাড়ী যান।"

অনেক বুঝাইতে, বিনোদিনী সম্মত হইলেন। ক্ষেত্রমোহনকে বলিলেন—"তুমি তবে আমায় হালিসহরে নিয়ে চল। রাত্রে সেখানে থাকবে। কাল ভোরে আবার এখানে আমায় পৌঁছে দিতে হবে।"

ক্ষেত্রমোহন তাহাই করিলেন। হালিসহরে রাত্রি কাটিল।

ভোরে উঠিয়া স্বহস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ক্ষেত্রমোহন ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় বাড়ীর বাহিরে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া বাহিরে গিয়া দেখিলেন, লালপাগড়ীতে বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। অশ্বপৃষ্ঠে স্বয়ং পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দুয়ারে দাঁড়াইয়া। সঙ্গে কয়েকজন দারোগা ও হেড্‌কনেষ্টবলও আছে।

পুলিস সাহেবের সঙ্গে ক্ষেত্রবাবুর পরিচয় ছিল। নত হইয়া সাহেবকে সেলাম করিলেন।

সাহেব চুরুট মুখে বলিলেন—"হেল্লো মুখ্‌টিয়ার, টুমি হেখানে খি খড়িতেছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"হুজুর এই আমার শ্বশুরবাড়ী।"

"ইঁহা টোমার শ্বশুরবাড়ী আছে? উটম, হামি টোমার শ্বশুরবাড়ী সার্চ্চ খড়িবে।"

"কেন হুজুর?"

"হেখানে বোমা টৈয়াড়ি হয় কিনা ডেখিবে। ইহা সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট আছে।"—বলিয়া সাহেব সার্চ্চ-ওয়ারেণ্টখানি ক্ষেত্রবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন।

ক্ষেত্রবাবু সেখানি উলটিয়া পালটিয়া দেখিয়া, সাহেবের হাতে

ফিরাইয়া দিলেন। বলিলেন—"হুজুর মালেক—যা ইচ্ছা করতে পারেন।"

সাহেব বলিলেন—"স্ত্রীলোক ঘন্‌কে লুকাইয়া রাখ।"

পুলিস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেবল বিনোদিনী। তিনি পুলিসের ভয়ে কোথাও লুকাইবার প্রয়োজন দেখিলেন না। হরিনামের মালাটি হাতে করিয়া উঠানে তুলসীতলায় বসিয়া রহিলেন।

খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। বন্দুক, বারুদ, ডিনামাইট্‌, বোমা, বর্ত্তমান রণনীতি, যুগান্তর, গীতা, দেশের কথা, রিভিউ অব্‌ রিভিউজ্‌ প্রভৃতি কিছুই বাহির হইল না। বাহির হইল—হিন্দু সৎকর্ম্মমালা, গুপ্ত-প্রেস পঞ্জিকা, কাশীদাসী মহাভারত এবং একখানা বটতলার ছেঁড়া উপন্যাস। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও দেশনায়কের কোনও ছবি বাহির হইল না—বাহির হইল কেবল খানকতক কালীঘাটের পট এবং একখানা আর্ট ষ্টুডিওর গণেশ মূর্ত্তি। জমিদারের খানকতক পুরাতন দাখিলা এবং একটা ধূলিমলিন চিঠির ফাইল বাহির হইল। বিনোদিনীর বাক্স হইতে বাহির হইল এক বাণ্ডিল চিঠি এবং খানকতক ঠিকানা লেখা শাদা খাম।

সমস্ত জিনিষ উঠানে আনিয়া জমা করা হইল। একজন দারোগা কাগজপত্রগুলির ফিরিস্তি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রমোহনও সেইখানে বসিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, শাদা খামগুলির প্রত্যেক খানিতে তাঁহারই শিরোনামা লেখা এবং রসময়ীর হস্তাক্ষর! পুলিস সাহেবের অনুমতি লইয়া খাম ও চিঠিগুলি ক্ষেত্রবাবু পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। খানকুড়ি চিঠি রহিয়াছে—সমস্তই বেগুনী রঙের ম্যাজেন্টা কালিতে, রসময়ীর হস্তাক্ষরে লিখিত। কয়েকখানি চিঠি খুলিয়া ক্ষেত্রবাবু পাঠও করিলেন। নানা অবস্থা কল্পনা করিয়া অনুমানে পত্র-গুলি লিখিত। কোন কোনটাতে বটগাছে বাসস্থানেরও উল্লেখ আছে। একখানাতে আছে—'গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া আসিয়াছ বলিয়া মনে করিও না আমি আর তোমার অনিষ্ট করিতে পারি না। এখনও রসি বামনী তোমার ঘাড় মটকাইতে পারে।' একখানাতে রহিয়াছে—'শুনিলাম বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে, এখনও সাবধান।' একখানাতে

আছে—কল্য তোমার বিবাহ। এত মানা করিলাম, কিছুতেই শুনিলে না। আচ্ছা বাসরঘরে আগুন জ্বালাইয়া তোমাকে ও তোমার বন্ধুকে পোড়াইয়া মারিব।'

সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত তখন ক্ষেত্রমোহনের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল।

বিনোদিনী তুলসীতলায় বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"ঠাকুরঝি, এসব কি?"

ঠাকুরঝি আপন মনে মালা জপ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

মাতৃহীন

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে দিন সংবাদ বাহির হইল আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয় বার অকৃতকার্য্য হইয়াছি, সেদিন একটু যে মনঃক্ষুণ্ণ হই নাই এমন কথা বলিতে পারি না। অথচ পরীক্ষোত্তীর্ণগণের তালিকায় শরৎকুমার মিত্র নামটি ছাপা না হওয়া সম্বন্ধে এক প্রকার কৃতনিশ্চয় ছিলাম। তাহার কারণ এই যে, সারা বৎসর আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি নানা গুরুতর কার্য্যে নিরতিশয় ব্যস্ততাপ্রযুক্ত পাঠ অভ্যাসের মোটেই সময় পাই নাই। পাস হইতে পারিব না এই ধারণা পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতেই আমার ছিল, এবং লিখিয়া আসিয়া সে মত পরিবর্ত্তনের কোনও প্রয়োজন বিবেচনা করি নাই।

ফেল হইয়া অবনত মস্তকে আমার বেজ্‌ওয়াটারের বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। তখন নভেম্বর মাস। সারা দিনে সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মাঝে মাঝে টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছে। ভিতর ও বাহির হইতে অন্ধকারের চাপে আমার বুকটা যেন পিষিয়া যাইতে লাগিল। আমার বাসার অনতিদূরেই 'দি আর্টেজিয়ান্' নামক একটি দোকান ছিল, সেখানে মনের আঁধারের ঔষধ বিক্রয় হইত। ল্যাণ্ডলেডিকে ডাকিয়া সেই ঔষধ এক বোতল আনাইয়া লইলাম। সোডাওয়াটার অনুপানযোগে কয়েক মাত্রা তাহা সেবন করিতেই আমার মন হইতে মেঘান্ধকার কাটিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে তথায় নবোদিত সূর্য্যের অপার আলোক অনুভব করিলাম। মনে হইল—'উঃ—ভাগ্যিস ফেল হইয়াছি! নহিলে ত ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দিবার মতি হইত না। বৎসর খানেক পরিশ্রম করিলেই সব পরীক্ষাগুলি পাস করিতে পারিব—টার্ম ত আমার কম্‌প্লিট করাই আছে। ব্যারিষ্টারিতে বিপুল অর্থোপার্জ্জন আমার অদৃষ্টে রহিয়াছে, বিধিলিপিকে কে খণ্ডাইতে পারে? আমার পিতা

ব্যারিষ্টারি করিয়া বিস্তর টাকা রোজগার করিয়াছিলেন,—আমিও রাপকা বেটা হইব, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।'—আমার সঙ্গে একত্র পরীক্ষা দিয়া যাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাদের জন্য মনে দুঃখও হইল। ভাবিলাম,—'আহা বেচারিরা সারাজীবন খাটিলেও মাসে দুই তিন হাজার টাকার বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিবে না। আর দশ বৎসর পরে হাইকোর্টের সেই প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, মক্কেলকুলের মাথার মণি, মিষ্টার শরৎ মিত্র?'—দশ বৎসর কাটিয়াছে—কিন্তু মক্কেলেরা যে উক্ত দুর্লভ রত্নের সন্ধান পাইয়াছে এমন ত কোনও লক্ষণ দেখিতেছি না!

সে কথা যাউক—আমার বর্ত্তমান অবস্থা এ গল্পের বিষয়ীভূত নহে। তৎকালে বিলাতে কি ঘটিয়াছিল তাহাই বর্ণনা করিবার জন্য অদ্য লেখনী ধারণ করিয়াছি। আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সন্ধ্যার পর সাজসজ্জা করিয়া থিয়েটারে চলিয়া গেলাম। আমার সঙ্গে কেহ ছিল না—আমি একা। শেক্সপীয়ার প্রণীত একখানি ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় হইল। অভিনয় দর্শনে আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। আমি বারটার সময় বাসায় আসিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধটি আরও দুই এক মাত্রা সেবন করিয়া শয়নের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। শেক্সপীয়ারের নাটকের কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে—মাত্রা বাড়িয়া গেল। তখন মনে হইল,—কি আক্ষেপ, বাঙ্গলা দেশে একজনও শেক্সপীয়ার নাই। আমি কি ইচ্ছা করিলে বঙ্গীয় শেক্সপীয়ার হইতে পারি না? কেন পারিব না? যখন দেশে ছিলাম, 'বিশ্বদর্পণ' নামক মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে আমার কবিতা ছাপা হইত। তখনি বন্ধুরা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, কালে আমি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইয়া দাঁড়াইব। আমার ভিতরে প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রহিয়াছে— ইহা স্পষ্ট অনুভব করিলাম। আমিই বঙ্গের ভবিষ্যৎ শেক্সপীয়ার তাহাতে সন্দেহমাত্র রহিল না। কল্যই একটা ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়া দিব। "রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"—এই কথাগুলি অনুচ্চস্বরে বারম্বার বলিতে বলিতে জিহ্বা জড়াইয়া আসিল। তখন উঠিয়া কোনক্রমে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন নয়টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া দেখি, তুষারপাত হইতেছে। তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সমাধা করিয়া মহোৎসাহে সেই তুষারের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলাম। অম্‌নিবাসে আরোহণ করিয়া বৃটিশ মিউজিয়মে গিয়া উপস্থিত। এক শিলিং দিয়া একখানি চক্‌চকে বাঁধানো খাতা কিনিয়া, মিউজিয়ামের পাঠাগারে (Reading Room) প্রবেশ করিলাম। এই খাতাখানিই বঙ্গীয় শেক্সপীয়ারের সর্ব্বপ্রথম নাট্যরচনা বক্ষে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে।

বৃটিশ মিউজিয়মের এই পাঠাগার জগতের অষ্টম আশ্চর্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্বকালের ও সর্ব্বজাতির সর্ব্ববিদ্যা এখানে পুঞ্জীভূত। এই সুবিপুল পাঠাগারটির তলদেশ বৃত্তাকার। কেন্দ্রস্থলে কতকটা স্থান কর্ম্মচারিগণের বসিবার জন্য। সেই স্থানটি দিয়া বৃত্তাকারে সজ্জিত তিনসারি পুস্তকাধার—তাহাতে সহস্রাধিক খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থতালিকা রক্ষিত। এই তালিকা বর্ণানুক্রমিক—গ্রন্থকারের নামানুসারে এবং বিষয়ানুসারে সঙ্কলিত। তাহার পর হইতে ব্যাসার্দ্ধের আকারে বহু সারি টেবিল—প্রত্যেক টেবিল বহু পাঠকের উপবেশন-কল্পে বিভক্ত ও সংখ্যাকৃত।

পাঠাগার বেলা ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তখনও অধিক সংখ্যক পাঠার্থী আগমন করেন নাই। আমি আসন গ্রহণ করিয়া, তালিকা হইতে খুঁজিয়া রাজপুত ইতিহাসের দুইখানি গ্রন্থের নাম লিখিয়া দিয়া আসিলাম। দশ মিনিট পরে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া বই দুখানি দিয়া গেল।

তখন সেই ইতিহাস গ্রন্থ খুলিয়া আমার নাটকের বিষয়নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত লইলাম। নায়ক পদের জন্য একজন রাজা আবশ্যক—যিনি অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া দুই একটা বিখ্যাত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। সে যুদ্ধ দেশের জন্য হউক, অথবা নিজ সম্পত্তি রক্ষার জন্যই হউক, কিছু

আসে যায় না—যুদ্ধকালে আমি তাঁহার মুখে দেশভক্তির সুন্দর বক্তৃতা বসাইয়া দিব তজ্জন্য চিন্তা নাই। রাজা অপেক্ষা রাজপুত্র হইলেই ভাল হয়, কারণ রাজা প্রায়ই অবিবাহিত পাওয়া যায় না। তাঁহাকে প্রেমে পড়াইবার সুযোগ অতি দুর্লভ। নায়ক যে ললনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—তাঁহার নামটি কটমট হইলে চলিবে না। নামটি যদি মোলায়েম হয়, তবে তিনি সঙ্গীতকুশলা বা অশ্বারোহণদক্ষা না হইলেও ক্ষতি নাই—আমি তাঁহার ও সকল অক্ষমতা দূর করিয়া দিবার ভার লইতে পারি। এক ঘণ্টার অধিক কাল এইরূপ নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর দেখিলাম, একজন বর্ষীয়সী শুভ্রকেশিনী ইংরাজ মহিলা ধীর পদক্ষেপে পাঠাগারে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার হস্তে কালো চামড়ার একটি 'কেস' বা আধার ঝুলিতেছে—এইরূপ আধারে চিত্রকরগণ তাঁহাদের চিত্রলিখনের সরঞ্জাম রাখিয়া থাকেন। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, বৃদ্ধা সেই দিকেই আসিতে লাগিলেন। আমার কাছাকাছি আসিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া, তিনি যেন স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। দেখিলাম, পরক্ষণেই আবার আত্মসম্বরণ করিয়া, মৃদুমন্দ গমনে আমাকে ছাড়াইয়া গেলেন এবং আমার স্থান হইতে চারি পাঁচটি আসনের ব্যবধানে উপবেশন করিলেন।

আমি ভাবিলাম, বৃদ্ধা ক্ষীণদৃষ্টি—আমাকে প্রথমে কোন পরিচিত ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকিবেন। এ তুচ্ছ ঘটনা আমার মনে অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—আমি আবার নায়ক-মৃগয়ায় ব্যাপৃত হইলাম। এইরূপে আরও কিছুক্ষণ কাটিল। মনোমত নায়কের সন্ধান না পাইয়া, আরও দুই একখানা পুস্তকের অন্বেষণে যাইতেছিলাম। সেই মহিলাটির নিকট দিয়া যাইতে দেখিলাম, তাঁহার সম্মুখে দুই তিনখানি ভারতবর্ষীয় ছবির পুস্তক খোলা রহিয়াছে—আর তিনি কাগজে পেন্সিল দিয়া একটা জঙ্গল আঁকিতেছেন। আরও কিয়ৎক্ষণ পরে সেই স্থান দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম, জঙ্গলের অন্তরালে একটা বাঘ থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে, হস্তিপৃষ্ঠ হইতে সৈনিক-বেশধারী একজন ইংরাজ পুরুষ তার প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিতেছেন।

ক্রমে একটা বাজিল—লাঞ্চের সময় উপস্থিত। বহি স্বস্থানে রাখিয়া

আমি বাহির হইয়া গেলাম। অল্প দূরেই ভিয়েনা রেষ্টোরাঁ নামক ভোজনশালা ছিল, তথায় প্রবেশ করিয়া খাইতে বসিলাম।

দুই এক মিনিট পরেই দেখি, সেই বৃদ্ধাটিও প্রবেশ করিলেন। আমারই টেবিলে আমার সম্মুখস্থিত চেয়ারখানি দখল করিলেন। আমার পানে চাহিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন—"Good afternoon—আপনি এইমাত্র বৃটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে ছিলেন না?"

আমি তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলাম—"আমি আপনার আসন হইতে অল্প দূরেই উপস্থিত ছিলাম!"

বৃদ্ধা বলিলেন—"আমায় ক্ষমা করিবেন—আপনি কি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছেন?"

"আমি বাঙ্গালী।"

"কলিকাতার?"

আমি বলিলাম—"কলিকাতাতেই আমাদের নিবাস।"

বৃদ্ধা একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আমার এ সকল প্রশ্নে আপনি বিরক্ত হইতেছেন না ত? আমি শুধু অলস কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছি না।"

আমি বলিলাম—"সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আপনার যাহা জানিবার আছে আপনি অনুগ্রহ করিয়া অবাধে আমায় জিজ্ঞাসা করুন।"

"বহু ধন্যবাদ। পাঞ্জাব কিংবা মধ্যভারতে আপনি বেড়াইয়াছেন কি?"

"মধ্যভারতে কখনও যাই নাই, তবে পাঞ্জাবের কয়েকটি নগর দেখিয়াছি।"

এই সময় পরিচারক আসিয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইল। "আমায় একমুহূর্ত্ত ক্ষমা করুন"—বলিয়া বৃদ্ধা, খাদ্যতালিকা হাতে লইয়া, স্বেচ্ছামত দ্রব্যগুলি ফরমাস করিলেন। তাহার পর আমায় বলিলেন—"আমার জিজ্ঞাস্য কি, আপনাকে বুঝাইয়া বলি। আমি কয়েকটি বিখ্যাত মাসিকপত্রের জন্য ছবি আঁকিয়া থাকি। ভারতবর্ষই আমার বিশেষ বিষয়। সম্প্রতি কোনও পত্রসম্পাদক একটি ভারতীয় শিকারের গল্প আমায় ছবি আঁকিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।

গল্পটি এই—পাঞ্জাবের একজন রাজা এবং একজন বৃটিশ সৈনিক একত্র হস্তিপৃষ্ঠে জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। দূর হইতে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিয়া রাজার মনে অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি হস্তী হইতে নামিয়া পলায়ন করিলেন। ইংরাজ সৈনিক শব্দানুসারে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাঘকে গুলি করিলেন। এ গল্পের জন্য সম্পাদক দুই একখানি ছবি চাহেন। একখানি রাজার পলায়নের ছবি, দ্বিতীয়খানি বাঘ মারিবার ছবি। দ্বিতীয়খানি আমি আঁকিতেছি। কিন্তু প্রথমখানি সম্বন্ধে আমি বড় সমস্যায় পড়িয়াছি। ভারতবর্ষের রাজাদের যে পোষাক দরবার প্রভৃতি ছবিতে দেখা যায়, সেই পোষাক পরিয়াই তাঁহারা শিকার করিতে যান, অথবা শিকারের উপযুক্ত অন্য কোনও রূপ পোষাক আছে ?”

এই কাহিনী শুনিয়া আমার রক্ত গরম হইয়া গেল। আমি যথাসাধ্য আত্মসংযমের সহিত বলিলাম—“মহাশয়া, ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিয়া রাজা পলাইলেন কেন ? ইংরাজ সৈনিক ত ভয়ে পলাইতে পারিত এবং রাজা গিয়া ব্যাঘ্রকে শিকার করিতে পরিতেন !”

আমার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মহিলাটি মৃদুহাস্য করিলেন। বলিলেন—“আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, আমি ও গল্পের লেখক নহি। আমি পারিশ্রমিক লইয়া ছবি আঁকিব মাত্র।”

আমি তখন লজ্জিত হইলাম। বলিলাম—“আমি অন্যায় করিয়াছি—আমায় ক্ষমা করিবেন। স্বদেশবাসীর নিন্দা শুনিয়া হঠাৎ আমার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল।”

বৃদ্ধা বলিলেন—“আপনার দেশভক্তি দেখিয়া প্রীত হইলাম। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।”

আমি বলিলাম—“আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইল। আমি স্বচক্ষে যে দুই চারিটা রাজা দেখিয়াছি—তাহা হয় কলিকাতার রাজপথে, নতুবা রেলওয়ে ট্রেণে। শিকারে বাহির হইয়াছেন, এমন রাজা দেখিবার কোনও সুযোগ পাই নাই।

ইহা শুনিয়া মহিলাটি কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—“কল্য একবার ভাল করিয়া সচিত্র পুস্তকাদি অন্বেষণ

করিয়া দেখিব, শিকার পরিচ্ছদে কোনও রাজার ছবি পাওয়া যায় কি না।"

অতঃপর অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। আমি এদেশে কত দিন আছি প্রভৃতি বিষয় তিনি অতি সঙ্কোচের সহিত আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে নিজের একখানি কার্ড আমায় দিয়া বলি-লেন—"আমার বাসা নিকটেই। যদি অবসর মত একদিন আসেন তবে আমার অঙ্কিত অনেকগুলি রেখাচিত্র আপনাকে দেখাইতে পারি।"

আমি এ সদয় নিমন্ত্রণের জন্য তাঁহাকে বহু ধন্যবাদ দিয়া, আমার নিজের একখানি কার্ড তাঁহাকে অর্পণ করিলাম। আমার নামটি দেখিয়া তিনি বলিলেন—"মিত্র? কলিকাতার সেই পরলোকগত প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিত্র আপনার কেহ হইতেন না কি?"

আমার পিতার যশোব্যাপ্তির প্রমাণ পাইয়া গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। বলিলাম—"আমি তাঁহারই পুত্র। আপনি তাঁহার নাম শুনিলেন কি করিয়া?"

বৃদ্ধা বলিলেন—"সংবাদপত্রে দেখিয়াছি। বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে একটা অবিকৃত ধারণা করিয়া লইবার জন্য মাঝে মাঝে ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরিতে গিয়া কলিকাতার সংবাদপত্র আমি পাঠ করিয়া থাকি। উঃ—আজ এ ভোজনশালায় লোকের কি ভীড় হইয়াছে! গরমে আমার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। আমি চলিলাম।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহার পর দুই দিন মহিলাটিকে আর বৃটিশ মিউজিয়মে দেখিলাম না। এ দুই দিনে আমার নাটকের প্লট স্থির করিয়া রচনা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

তৃতীয় দিন রাজপুত ইতিহাসের অন্যান্য পুস্তকের জন্য তালিকা অনুসন্ধান করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম সেই বৃদ্ধা—কার্ড হইতে জানিয়াছিলাম—ইহার নাম মিস ক্যাম্বেল—আসিয়া আমার নিকট

দাঁড়াইলেন। সহাস্য বদনে আমায় অভিবাদন করিয়া নিজ কর প্রসারিত করিয়া দিলেন। করমর্দ্দন ও কুশল প্রশ্ন শেষ হইলে তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—"রাজপুতানা আপনি দেখিতেছেন বুঝি?"—বৃটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে স্বাভাবিকস্বরে বাক্য কথন নিষিদ্ধ।

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"আপনার কি এই খণ্ডটি আবশ্যক? এই লউন, আপনার হইলে আমি দেখিব এখন।"

"আসুন না, দুই জনে এক সঙ্গেই দেখি। রাজাদের শিকার-পরিচ্ছদ কিরূপ দেখিবার জন্য আজ রাজপুতানার ইতিহাস অন্বেষণ করিব। আপনি কি খুঁজিতেছেন?"

"আমি রাজপুত ইতিহাস হইতে একখানা নাটক লিখিতেছি।"

"আপনি নাট্যকার?"

লজ্জিতভাবে বলিলাম—"আমি নাট্যকার নহি। তবে একখানি নাটক রচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি বটে।"

"বেশ বেশ—একদিন আপনার নাটকের গল্পটি শুনিব।"

"সে ত আমার সৌভাগ্যের কথা"—বলিয়া তাঁহার জন্য আমি কয়েক খানি পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া দিলাম। উভয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়া আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম।

আমি প্রত্যহই পাঠাগারে গিয়া নাটক লিখিতে লাগিলাম। মিস ক্যাম্বেলও প্রতিদিন আসিতেন। কিন্তু আর কোন দিন তাঁহাকে ভিয়েনা রেষ্টোরাঁতে যাইতে দেখিলাম না। তিনি সম্ভবতঃ বাড়ী গিয়া লাঞ্চ খাইয়া আসিতেন।

একদিন তাঁহার বসিবার স্থানে গিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিলাম—"আজ বিকালে আপনার ওখানে ছবি দেখিতে আসিব কি?"

তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"বেশ ত! নিশ্চয়ই আসিবেন। আজ আমার ওখানেই আপনাকে চা পান করিতে হইবে। আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব এখন।"

"বহু ধন্যবাদ"—বলিয়া আমি স্বস্থানে আসিয়া নিজ কার্য্যে মন দিলাম।

বেলা তিনটা বাজিলে মিস ক্যাম্বেল আসিয়া বলিলেন—"চলুন যাওয়া যাক।"

আমি পাঠাগারে পুস্তক ফিরাইয়া দিয়া, নাটকের খাতাখানি লইয়া মিস ক্যাম্বেলের সঙ্গে তাঁহার আবাসে গমন করিলাম। ব্লুমস্‌বেরি ম্যান্‌সন্‌স্‌ নামক একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার একটি ফ্ল্যাট লইয়া বৃদ্ধা বাস করেন। ফ্ল্যাটের একটি কক্ষে তাঁহার চিত্রশালিকা (Studio)—সেখানে লইয়া গিয়া আমাকে বসাইলেন। বলিলেন—"পাঁচ মিনিটের জন্য আমায় মার্জ্জনা করুন। পাচিকাকে চায়ের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া আসি। আপনি ততক্ষণ দেওয়ালের এই ছবিগুলি দেখুন।"—বলিয়া তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আমি অলসভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া ছবিগুলি দেখিতে লাগিলাম। অধিকাংশই জলবর্ণের চিত্র। বৃক্ষরাজিবেষ্টিত নীলহ্রদ, নৃত্যশীলা শৈলনির্ঝরিণী, সিন্ধুজলধৌত সিকতাভূমি—প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য। দুই একখানি তৈলচিত্রও আছে। ঈজেলের উপর স্থাপিত একটি অর্দ্ধসমাপ্ত নারীমূর্ত্তিও দেখিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিস ক্যাম্বেল ফিরিয়া আসিলেন। ছবিগুলি একে একে আমায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন—"এইগুলি আমার সাধের ছবি। শিল্পকলার সাধনার জন্য এইগুলি আঁকিয়াছি। জীবিকার জন্য যে সকল ছবি আমায় আঁকিতে হয়,—যেমন পলায়নপর রাজা প্রভৃতি—এইবার সেইগুলি দেখুন।"—বলিয়া তিনি একটি বৃহৎ পোর্টফোলিও বাহির করিলেন।

আমি বলিলাম—"আপনার সে ছবির কি করিলেন ?"

বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন—"দরবারের বেশেই রাজাকে আঁকিয়া দিতে হইয়াছে। আমি সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করিয়া পরিচ্ছদ সমস্যার কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—সাময়িক পত্রের ছবিতে অত খুঁটিনাটি ধরিতে গেলে চলে না। রাজাকে বেশ স্থূলকায় করিয়া আঁকিয়া, তাঁহার অঙ্গে দরবারের পোষাকই পরাইয়া দিন। নহিলে পাঠকেরা রাজা বলিয়া চিনিতে পারিবে কেন ?—সুতরাং আমাকে সেইরূপই আঁকিতে হইল।"

পোর্টফোলিওর ছবিগুলি দেখিলাম, অধিকাংশই গল্প বা উপন্যাসের উপযোগী করিয়া চিত্রিত। সেগুলি দেখিতে দেখিতে চা প্রস্তুত হইবার সংবাদ আসিল। মিস ক্যাম্বেল আমাকে লইয়া তাঁহার ড্রয়িং-রুমে

গেলেন। চা পান করিতে করিতে গল্প হইতে লাগিল। সহসা টেবিলের উপর হইতে আমার চকচকে বাঁধান খাতাখানি তুলিয়া লইয়া মিস ক্যাম্বেল দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন—"এইখানিই আপনার নাটক বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কতদূর হইল?"

"তৃতীয় অঙ্ক হইতেছে। আরও দুইটি অঙ্ক হইবে।"

তিনি খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন—"ইহার গল্পটি কি বলুন দেখি?"

আমি গল্পটি বর্ণনা করিতে লাগিলাম। ঘটনা সন্নিবেশ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে তিনি পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিলেন। দেখিলাম, সেগুলি অত্যন্ত উপযোগী ও সমীচীন। অবশেষে খাতাখানি রাখিয়া তিনি বলিলেন—"আমার আক্ষেপ এই যে, আপনার রচনা পাঠ করিবার আনন্দ আমি লাভ করিতে পারিব না। অথচ আমি এক সময় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—"বাঙ্গালা শিখিতেছিলেন? কি চমৎকার! কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন?"

"যৎসামান্য।"

"এখনও কিছু কিছু মনে আছে?"

"না। সে বহু বৎসরের কথা। এইটুকু মাত্র মনে আছে, গোপাল এবং রাখাল দুইটি বালক ছিল। ইহাদের মধ্যে রাখালকে আমার বেশ লাগিত—তাহার ভিতরে যথেষ্ট প্রাণ ছিল। গোপালটা একেবারে অপদার্থ—যাহাকে আমরা goody goody বলি।"

আমি শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম। বলিলাম—"আপনার যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিতেছি, আপনি যদি আবার চেষ্টা করেন, অল্প দিনেই বাঙ্গালা শিখিয়া ফেলিতে পারেন।"

মিস ক্যাম্বেল বলিলেন—"এ বয়সে আর শিখিয়া কি হইবে? যখন শিখিতাম, তখন আমি বিংশতিবর্ষীয়া বালিকা।"—বলিয়া তিনি অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন দিবালোক অত্যন্ত হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মুখ আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। তথাপি আমার

সন্দেহ হইল, তাঁহার চক্ষু দুইটি যেন জলে ছলছল করিতেছে। তাঁহার চিত্ত অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বলিলাম—"আর এক পেয়ালা চা পাইতে পারি কি ?"

তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"ক্ষমা করিবেন—আপনার পেয়ালা খালি হইয়াছে আমি লক্ষ্যই করি নাই। আমার আতিথেয়তা মোটেই অনুকরণীয় নহে"—বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে আমার পেয়ালা লইয়া চায়ে পূর্ণ করিয়া দিলেন। বলিলেন—"আপনি ঐতিহাসিক নাটকই লিখিবেন, না গার্হস্থ্য নাটকও লিখিবার ইচ্ছা আছে ?"

"ক্রমে গার্হস্থ্য নাটকও লিখিব বৈকি।"

"আমি আপনাকে একটি গার্হস্থ্য নাটকের প্লট দিতে পারি। বাস্তব জীবনের ঘটনা—একটি হৃদয়ভেদী প্রণয়-কাহিনী।"

আগ্রহের সহিত বলিলাম—"বহু ধন্যবাদ। প্লটটি কি বলুন না ?"

"আগে এই নাটকটি শেষ করুন। তাহার পর একদিন বলিব।"

আরও দশ মিনিট গল্পে কাটিলে অন্ধকার বাড়িয়া উঠিল। পরিচারিকা আসিয়া গ্যাস জ্বালিয়া দিল। আমি তখন মিস ক্যাম্বেলের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম।

তিনি উঠিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। শেষমুহূর্ত্তে বলিলেন—"আপনার নাটক সমাপ্ত হইলে, একদিন আসিয়া অনুবাদ করিয়া আমায় শুনাইতে হইবে মনে রাখিবেন।"

"আমি সেই সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব"—বলিয়া, অভিবাদনান্তর বিদায় হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার ঐতিহাসিক নাটক শেষ হইয়া গিয়াছে, এ সংবাদ পাঠাগারেই মিস ক্যাম্বেলকে দিয়াছি। ইতিমধ্যে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমি তাঁহার আবাসে আরও দুইবার চা পান করিয়াছি। তাঁহার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারি, আমাকে তিনি আন্তরিক স্নেহ করেন।

একদিন বৃটিশ মিউজিয়মে তিনি আমায় বলিলেন—"কল্য আমার হাতে কোন কায নাই। তোমার নাটকখানি শুনাইবে?"

"বেশ ত। কাল কখন আসিব বলুন?"

"কাল পাঠাগারে আসিবে কি?"

"আসিব।"

"তবে নাটকখানি সঙ্গে আনিও। এখান হইতে একটার সময় গিয়া কাল আমার সঙ্গে তুমি লাঞ্চ খাইও।"

"বহু ধন্যবাদ। আপনি কাল আসিতেছেন কি?"

"না, আমি আসিব না।"

"আচ্ছা, আমি তবে একটার সময় আপনার আবাসে উপস্থিত হইব।"

তখন ডিসেম্বর মাস। শীতটা খুবই প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই তুষারপাত হয়।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রাতরাশ সমাপন করিতে নয়টা বাজিল—বৃষ্টি থামিল না। দশটা বাজিল, তবু থামে না। আমার ল্যাণ্ডলেডি প্রচলিত প্রবাদবাক্য* কোট্ করিয়া বলিল—সাতটার পূর্ব্বেই যখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, এগারটার মধ্যে নিশ্চয়ই বন্ধ হইবে। কিন্তু এগারটা বাজিবামাত্র, ল্যাণ্ডলেডির ভবিষ্যদ্বাণীর যেন প্রতিবাদ করিবার জন্যই, বৃষ্টি প্রবলতর ভাবে আরম্ভ হইল। বারোটা বাজিল, তখনও তদ্রূপ। অন্য সময় হইলে এমন দিনে আমি বাহির হইতাম না। কিন্তু আজ প্রথম রসগ্রাহী ব্যক্তি আমার প্রথম রচনা শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। আজ কি আমি থাকিতে পারি? ক্যাব ডাকাইয়া, মিস ক্যাম্বেলের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"How very sweet of you to come in this weather! তোমার জুতা বোধ হয় ভিজিয়া গিয়াছে?"

* Rain before seven, clear before eleven.

আমি বলিলাম—"বেশী ভিজে নাই। আমি ত বৃটিশ মিউজিয়মে যাই নাই। বাসা হইতে ক্যাবে আসিয়াছি। তবে উঠিবার নামিবার সময় অল্প ভিজিয়া থাকিবে।"

আমার কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না। ঝুঁকিয়া, আমার জুতা দেখিয়া বলিলেন—"এই যে বেশ ভিজিয়াছে। খুলিয়া ফেল, খুলিয়া ফেল।"

একজন মহিলার সম্মুখে জুতা খুলিয়া ফেলিবার প্রস্তাব মাত্রে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তিনি আমার ভাব দেখিয়া বলিলেন—"Silly boy! তুমি এমন horrified হইতেছ কেন? সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। খুলিয়া ফেল, নহিলে শক্ত ব্যারামে পড়িবে।"

আমি অপরাধীর মত বলিলাম—"বেশী ত ভিজে নাই। বরং আগুনের কাছে পা রাখিয়া বসিয়া থাকি, জুতা শুকাইয়া যাইবে এখন।"

তিনি বলিলেন—"খুব ভিজিয়াছে। তবে জল এখনও তোমার মোজায় পৌঁছে নাই, মোজাও ভিজিয়া গেলে সর্ব্বনাশ হইবে। জুতা খুলিয়া আগুনের কাছে রাখ। লাঞ্চের এখনও বিলম্ব আছে। দাসী আসিবার পূর্ব্বেই তোমার জুতা শুকাইয়া যাইবে।"

আমি তথাপি ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া অবশেষে তিনি বলিলেন—"নহে ত বল আমি অন্য ঘরে যাই। তোমার জুতা না শুকান পর্য্যন্ত আসিব না! তোমার মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁহার সম্মুখে তুমি কি জুতা খুলিতে না? আমাকে তোমার মা মনে কর না কেন?"

তাঁহার শেষ কথাগুলি এতই করুণা মাখা, আমার মাতৃহারা হৃদয়ে এমনই সুধাবৃষ্টি করিল যে, আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া জুতা খুলিয়া ফেলিলাম।

তখন দুইজনে আমরা অগ্নির সম্মুখে বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। ক্রমে দেড়টা বাজিল। আমার জুতাও শুকাইয়া গেল। জুতা পরিয়া আবার আমি ভদ্রলোক হইলাম।

মিস ক্যাম্বেল তখন লাঞ্চ আনিবার জন্য দাসীকে বলিয়া আসিলেন। ক্ষণকাল পরে আমাকে তাঁহার ভোজনকক্ষে লইয়া গেলেন। গল্প-গুজবের মধ্যে আমরা আহার সমাধান করিলাম। দাসী টেবিল সাফ

করিয়া লইলে, সেই কক্ষেই বসিয়া আমার নাটক পাঠ আরম্ভ করিলাম। কতকগুলা দৃশ্যের গল্পভাগ মুখেই বলিয়া গেলাম। যে যে দৃশ্যে আমার রচনার বিশেষ বাহাদুরী আছে মনে করিলাম, সেই সেই দৃশ্য অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলাম। মোটের উপর, তিনি প্রীত হইলেন। বলিলেন—"প্রথম উদ্যমের পক্ষে খুবই ভাল হইয়াছে।" এইরূপে চারিটা বাজিল। চা পান করা গেল।

এখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। আকাশ অন্ধকার। আমি বলিলাম—"আপনি আমাকে একটি গার্হস্থ্য নাটকের প্লট দিবেন প্রতিশ্রুত আছেন,—আজ সেটি বলিবেন কি?"

"বলিব। ড্রয়িং-রুমে চল, সেইখানে বলিব। এ ঘরটা শীঘ্র অন্ধকার হইয়া যায়।"

আমরা ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কুণ্ডস্থিত অগ্নি নির্ব্বাপিতপ্রায়। চারিদিকের বায়ুপথরোধী সার্সি বন্ধ রহিয়াছে, তথাপি কন্‌কনে শীত। দাসী আসিয়া কুণ্ডে প্রচুর পরিমাণে কয়লা নিক্ষেপ করিয়া, Poker দিয়া খুব খোঁচাইয়া দিল। অগ্নিদেব তখন আবার নবোদ্যমে জ্বলিতে লাগিলেন।

মিস ক্যাম্বেল তাঁহার পশমের শালখানি গায়ে বেশ করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"এই লণ্ডনের অনতিদূরে একটি সহরতলীতে—তোমার নাটকে উহা হ্যামারস্মিথ বা রিচ্‌মণ্ড বলিয়া লিখিতে পার—একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহাদের একটি পুত্র এবং দুইটি কন্যা ছিল। পুত্রটি একবিংশতিবর্ষীয়;—তাহার নাম কি রাখিবে? জর্জ্জ—না হয় ফ্রেড্রিক। ফ্রেড্রিকের আদরের নাম ফ্রেড্‌ বেশ শুনাইবে। কন্যা দুইটির মধ্যে বড়টির নাম—মনে কর এলিজ্যাবেথ বা লিজি। এইটি তোমার নায়িকা। নামটা বড় সেকেলে—তোমার বুঝি পছন্দ হইল না? তবে তাহাকে মড্‌ কিম্বা গ্ল্যাডিস্‌ বলিতে পার। মডের বয়স তখন উনবিংশতিবর্ষ। কনিষ্ঠা ক্যাথরিন্‌, মডের অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট।

লেখাপড়ার দিকে বড় মেয়েটির বেশী ঝোঁক ছিল। সে ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। ভিক্টর হিউগো,

গইটে এবং ডাণ্টের মূলগ্রন্থ পাঠ করিতে পারিত। গ্রীকও শিখিতেছিল। ইতিমধ্যে কেম্‌ব্রিজ হইতে ফ্রেড্‌ তাহারর মাকে পত্র লিখিল সেখানে একটি ভারতবর্ষীয় তাহার সহপাঠী বন্ধু আছে; ইচ্ছা, ছুটির দেড়মাস তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া রাখে। মাতা আহ্লাদের সহিত সম্মতি দিলেন। ফ্রেড্‌ লিখিল, অমুক তারিখে আমরা পৌছিব।

"মড্‌ কিন্তু এ সংবাদে বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। পিতামাতাকে বলিল, ভারতবর্ষীয় লোকের সঙ্গে এক বাড়ীতে কেমন করিয়া থাকিবে? তাঁহারা কত বুঝাইলেন, কিছুতেই মডের শঙ্কা দূর হইল না। ফ্রেড বন্ধুসহ যেদিন পৌছিবে, তার পূর্ব্বদিন মড্‌ পলাইয়া লণ্ডনে তাহার মাসীর বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইল।

"দুই তিন দিন পরে ফ্রেড্‌ ও তাহার বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া, মাতা মড্‌কে আনিতে গেলেন। মড্‌ যখন দেখিল, ভারতবর্ষীয় লোকটির মাথায় পালকের টুপি নাই, রঙ মাখে না, হাতে তীর ধনুক নাই, ভালুকের চামড়া পরে না—তখন সে আশ্বস্ত হইয়া বাড়ী আসিল।

"ক্রমে মড্‌ আবিষ্কার করিল—তিনি—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—"নায়কের নামটি কি রাখিব?"

মিস ক্যাম্বেল বলিলেন—"তিনি বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের কি নাম হয় আমার চেয়ে তুমিই ত ভাল জান। যাহোক্‌ একটা নাম রাখিয়া দিও।"

আমি ভাবিয়া বলিলাম—"চারুচন্দ্র দত্ত।"

"বেশ হইবে। ক্রমে মড্‌ জানিল, চারু সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন। তখন সে মাকে ধরিয়া বসিল, আমি সংস্কৃত শিখিব। চারু শুনিয়া বলিল—'বেশ ত। আমারও ফরাসী ভাষা শিক্ষার অত্যন্ত ইচ্ছা। আপনি আমায় ফরাসী পড়াইবেন আমি আপনাকে সংস্কৃত পাঠ দিব।'

"এইরূপে উভয়ে উভয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। তখন মে মাস। আকাশ পরিষ্কার নীল। বাড়ীর পশ্চাতের বাগানটি বাটারকপ্‌ প্রিম্‌রোজ ও ডেজি ফুলে ভরিয়া গিয়াছিল। বাগানের মাঝখানে একটি লাইলাকের গাছ—তাহার সর্ব্বাঙ্গে তখন ফুল আর ধরে না। ঘরের মধ্যে গরম—তাই প্রভাতে ও বৈকালে, একটি চিনা-বেতের টেবিল আর

দুখানি হাল্কা চেয়ার সেই লাইলাকের তলায় বিছাইয়া, তাহারা পরস্পরকে পাঠ দিত। গাছটির শাখায় ফুলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া একযোড়া মেভিস্ পক্ষী সারাদিন প্রণয়গান গাহিত। ক্রমে দুজনের মনে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইল।

"মডের পিতামাতা এ ব্যাপারের কিছুই সন্ধান রাখেন নাই—কিন্তু ফ্রেড্ ঠিক ধরিয়াছিল।—সে, বোন দুটি এবং চারুকে সঙ্গে লইয়া কোনও দিন রিচ্‌মণ্ড পার্কে, কোন দিন কিউ গার্ডেন্সে বেড়াইতে যাইত। মড্ ও চারু—বেড়াইতে বেড়াইতে—অনেক সময় ক্যাথরিণ ও ফ্রেড্‌কে খুঁজিয়া পাইত না। ফ্রেডের কৌশলে এরূপ ঘটিত সন্দেহ নাই।

"ক্রমে চারু মনে করিল, মডের পিতমাতার নিকট আর ইহা গোপন রাখিলে তাহার পক্ষে অন্যায়াচরণ হয়। তখন সে মডের পিতার কাছে গিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিল। মডের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিল।

"সমস্ত শুনিয়া, মডের পিতা গম্ভীর হইয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি মডকেও সেখানে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। স্নেহের স্বরে উভয়কে বলিলেন—'তোমরা এখন দুজনেই অল্পবয়স্ক। সংসারাভিজ্ঞতা তোমাদের কিছুই নাই। পরস্পরের প্রতি তোমাদের এ আকর্ষণ—ইহা স্থায়ী প্রেম অথবা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র—তাহারও পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিতে চারুর এখনও বৎসরাধিক কাল বিলম্ব আছে। আমি বলি, এ এক বৎসর তোমরা আত্মপরীক্ষা কর। এক-বৎসর তোমরা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ না পত্রালাপ করিও না। যদি বৎসরান্তে তোমাদের মনের ভাব এই রূপই থাকে,—তবে তোমাদের পরিণয়ে আমি সম্মতি দিব।'

"মড্ ও চারু এ কথা শুনিয়া বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িল। অথচ পিতার যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিল। চারুর ছুটি ফুরাইয়া আসিল। এক বৎসরের জন্য উভয়ে উভয়ের নিকট সজলনেত্রে বিদায় গ্রহণ করিল।

"মডের পিতার নিকট তাহারা যে সত্যে আবদ্ধ হইয়াছিল, এক বৎসর কাল ধর্ম্মভাবে তাহা পালন করিল। কেবল ফ্রেডের নিকট পরস্পরের

সংবাদ তাহারা পাইত। মড্ ভাইকে কেম্ব্রিজে যে পত্র লিখিত, ফ্রেড্ চারুকে সে সকল দেখিতে দিত। এক বৎসর কাল সেই পত্রগুলিই চারুর অবলম্বন ছিল। আবার, ছুটিতে ফ্রেড্ বাড়ী আসিলে, চারু তাহাকে যে সকল পত্র লিখিত, ফ্রেড্ সেগুলি ভগিনীকে দেখাইত।

"এইরূপে সুদীর্ঘ পরীক্ষাকাল অতিবাহিত হইল। চারু আবার আসিল। মডের পিতামাতার সম্মতিক্রমে তাহারা বিবাহ-অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইল। পরম আনন্দে দুইজনে দিনযাপন করিতে লাগিল।

"জুন মাসের ১৬ই তারিখে চারু বারে কল্ড্ হইবে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বিবাহের দিনস্থির হইল। বিবাহের পর এক পক্ষ কাল নবদম্পতী ইতালীদেশে মধুচন্দ্র যাপন করিয়া, ব্রিন্দিসি হইতে স্বদেশে যাত্রা করিবে।

"তাহার পিতামাতা এ বিবাহে সম্মত হওয়া সম্বন্ধে চারুর মনে সংশয় ছিল। অথচ পিতামাতার প্রতি তাহার ভক্তি ও ভালবাসা যথেষ্ট। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ না করিয়া বিবাহ করিতে কিছুতেই তাহার মন সরিতেছিল না। তাই সে একখানি দীর্ঘ পত্রে সমস্ত কথা লিখিয়া, অনেক মিনতি করিয়া পিতামাতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল।

"চারু হিসাব করিয়া দেখিল, যেদিন বারে সে কল্ড্ হইবে তাহার দুইদিন পরে ভারতবর্ষ হইতে পিতার উত্তর আসিবে। পত্র প্রতীক্ষায় শেষ সপ্তাহ সে অতি বিমর্ষভাবে কাটাইল। তাহার মনে হইল, পিতামাতার বিনা আশীর্ব্বাদে বিবাহ করিতে হইলে, মিলনের অর্দ্ধেক আনন্দ তাহার চলিয়া যাইবে।"

এই সময় দাসী আলো জ্বালিয়া দিতে আসিল। আলো জ্বালিয়া, অগ্নিকুণ্ডে আবার প্রচুর পরিমাণ কয়লা নিক্ষেপ করিল। অগ্নিদেব লেলিহ রসনা বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আমার মনে একটা বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া আসিতেছিল—এই মড্, মিস ক্যাম্বেল ছাড়া আর কেহই নহে। উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহার পর?—কি উত্তর আসিল?"

মিস ক্যাম্বেল বলিলেন—"পত্রের কোন উত্তর আসিল না। ১৮ই জুন—সে দিন ওয়াটার্লু যুদ্ধজয়ের বার্ষিকোৎসব—পত্রের পরিবর্ত্তে চারুর

বৃদ্ধ পিতা স্বয়ং আসিয়া পড়িলেন। মডের পিতার পা জড়াইয়া ধরিয়া, বলিতে লাগিলেন—'আমায় ক্ষমা করুন। আমার ঐ একমাত্র পুত্র। আমাদের বুড়াবুড়ীর ঐ একমাত্র অবলম্বন। দেশে লইয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উহাকে জাতিতে তুলিয়া লইব। সেইখানে হিন্দুমতে উহার বিবাহ দিব। আপনার কন্যাকে বিবাহ করিলে জন্মের মত উহার জাতিচ্যুতি ঘটিবে—বংশাবলীক্রমে আর কখনও সমাজে উঠিবার আশা থাকিবে না। ছেলেকে আমি ঘরে রাখিতে পারিব না। মরিবার সময় আমাদের মুখে ও জলগণ্ডূষ দিবার অধিকারী থাকিবে না। আপনার কন্যাকে বিবাহ করিলে আমার স্ত্রী শোকে আত্মহত্যা করিবে—আমি দুঃখে পাগল হইয়া যাইব। কাশ্মীর বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া বোম্বাই হইতে জাহাজে আমি আসিয়াছি। সারাপথ চিঁড়া খাইয়া আসিয়াছি। আমার ধন আমায় ফিরাইয়া দিন।'

"মডকেও তিনি মাতৃসম্বোধন করিয়া ঐ প্রকার বলিতে লাগিলেন।

"মডের পিতা বলিলেন—'পাত্র পাত্রী উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক। উহারা ভাল বুঝিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। আমি নিশ্চয়ই তাহাতে বাধা দিব না, আপনারও বাধা দিবার কোন অধিকার নাই। মনে রাখিবেন, ইহা ইণ্ডিয়া নয়—ইহা গ্রেট ব্রিটেন—স্বাধীন দেশ।'

"মডের পিতা তখন চারুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। চারু বলিল—'আমি বিবাহ করিব। পিতার সম্মতি পাইলাম না—ইহা আমার পক্ষে পরম দুর্ভাগ্য। তথাপি আমি বাগ্‌দত্তা বধূকে পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিতে প্রস্তুত নহি।'

"চারুর পিতা বলিলেন—'ওরে পাষাণ, বাগ্‌দত্তা বধূ পরিত্যাগই কি কেবল অধর্ম্ম? পিতৃমাতৃহত্যা কি পুণ্য কার্য্য?'

"চারু তথাপি অটল রহিল, কিন্তু মড্ বাঁকিয়া বসিল। সে বলিল—'এমন অবস্থায় আমি কখনই চারুকে বিবাহ করিব না।'

"তাহার পিতা মাতা, ফ্রেড, ক্যাথরিন্ তাহাকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু মড্ কিছুতেই রাজী হইল না।

"অবশেষে চারু তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া প্রেমের দোহাই দিয়া কত মিনতি করিল। কিন্তু মড্ তথাপি স্বীকৃত হইল না।

"তখন চারু বলিল—'আমার প্রতি তোমার ভালবাসা যেরূপ ঐকান্তিক বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতাম, তাহা যদি যথার্থ হইত, তবে আমাদের মিলনের কোন বাধাই তোমায় নিরস্ত করিতে পারিত না। আমার সে বিশ্বাস কি তবে ভুল?'

"মড এ কথার প্রতিবাদ করিল না।

"চারু বলিল—'বুঝিয়াছি। বিচ্ছেদ যখন অপরিহার্য্য, তোমার অচল ভালবাসা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলেও জীবনে অনেক সান্ত্বনা পাইতাম। সে সান্ত্বনা হইতেও তুমি আমায় বঞ্চিত করিলে!'

"মড্ তথাপি এ কথার কোন প্রতিবাদ করিল না।

"চারু তখন মডের দক্ষিণ হস্তখানি নিজ হস্তের মধ্যে ধারণ করিয়া, তাহার উপর অজস্র চুম্বন ও অনাবিল অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পর জন্মের মত বিদায় লইল।"

এই শোককাহিনী শুনিতে শুনিতে আমারও চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল। মিস ক্যাম্বেল নীরব হইলেন। কষ্টে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহার পর?"

কয়েক মুহূর্ত্ত মিস ক্যাম্বেলও কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার গণ্ডযুগল দিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দু গড়াইতে লাগিল। আমি এ দৃশ্য দেখিয়া মস্তক অবনত করিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আবার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল—"মড্ তখন প্রতিবাদ করে নাই, কিন্তু একদিন প্রতিবাদ করিবে। পরলোকে আবার যখন চারুর সহিত দেখা হইবে—তখন প্রতিবাদ করিবে বলিয়া সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। চারু চলিয়া গেলে পর মড্ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার জীবনের কোন আশা ছিল না। কিন্তু যে দুর্ভাগিনী, অত সহজে সে মরিবে কেন? দেশ হইতে আনাইয়া চারু তাহাকে দুই যোড়া সোণার চুড়ি দিয়াছিল। সেই চুড়ি সর্ব্বদা সে পরিয়া থাকিত। কয়েক বৎসর হইল, একদিন হঠাৎ সে একখানি ভারতীয় সংবাদপত্রে দেখিল, তাহার বাঞ্ছিত ইহজগতে আর নাই। সেই দিন সে হাতের চুড়িগুলি খুলিয়া ফেলিল। সে শুনিয়াছিল, হিন্দুবধূ বিধবা হইলে হাতে আর চুড়ি পরে না। মডের

শয়নকক্ষে তাহার প্রণয়ীর একখানি তৈলচিত্র আছে। তাহাই দেখিয়া, ইহজগতের পরপারে চিরমিলনের প্রতীক্ষা করিয়া সে জীবন ধারণ করে।"

বলিয়া মিস ক্যাম্বেল নীরব হইলেন। আমি অশ্রুমোচন করিয়া, পূর্ব্ববৎ অবনত মস্তকে ভাবিতে লাগিলাম—কে সেই ব্যারিষ্টার! কলিকাতার অধিকাংশ প্রবীণ ব্যারিষ্টারকেই ত আমি চিনি। কোন্ বৎসরের এ ঘটনা জানিতে পারিলে, ল-লিষ্ট দেখিয়া নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিতে পারিব। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ বৎসর এ ঘটনা ঘটিয়াছিল?"

কোনও উত্তর নাই।

আমি তখন মাথা তুলিয়া দেখিলাম, মিস ক্যাম্বেল নিস্পন্দ—তাঁহার চক্ষু পলকশূন্য—তাঁহার মস্তক একদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

সর্ব্বনাশ!—ইনি মূর্চ্ছিতা!

ভিত্তিগাত্রলগ্ন ঘণ্টার ফিতা ধরিয়া ভয়ানক জোরে টান দিলাম। দাসী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"কি মহাশয়?"

"তোমার ঠাকুরাণী মূর্চ্ছা গিয়াছেন; জল—জল আন।"

দাসী ছুটিয়া জল আনিতে গেল। আমি সমস্ত জানালাগুলা খুলিয়া দিলাম। বরফের মত শীতল বাতাস কক্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল। মিস ক্যাম্বেলের অঙ্গ হইতে শালটা খুলিয়া ফেলিয়া দিলাম। জল আসিল। তাঁহার মুখে সেই কন্‌কনে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিলাম। দাসী তাঁহার পোষাকের কিয়দংশ খুলিয়া দিল। স্মেলিং সল্ট আনিয়া তাঁহার নাসারন্ধ্রে ধরিল। মিস ক্যাম্বেল তখন ধীরে ধীরে মাথাটা তুলিলেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"কি হইয়াছে?"

দাসী বলিল—"ঠাকুরাণী, আগুনের গরমে আপনি মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন।"

আমি বলিলাম—"ঘরের সকল জানালা এমন বন্ধ করিয়া এত আগুন জ্বালা ভুল হইয়াছিল। এখন আপনি কেমন আছেন মিস ক্যাম্বেল?"

"আমি মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম? কষ্ট দিলাম—মাফ করিও। এখন ভাল আছি।"

আদরিণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়ার উকিল কুঞ্জবিহারী বাবু বিকালে পাণ চিবাইতে চিবাইতে, হাতের ছড়ি দুলাইতে দুলাইতে জয়রাম মোক্তারের নিকট আসিয়া বলিলেন—"মুখুয্যে মশায়, পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ী থেকে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছি, এই সোমবার দিন মেজবাবুর মেয়ের বিয়ে। শুনছি নাকি ভারি ধুমধাম হবে। বেনারস থেকে বাই আসছে, কলকাতা থেকে খেমটা আসছে। আপনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কি ?"

মোক্তার মহাশয় তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আগন্তুকগণের এই প্রশ্ন শুনিয়া হুঁকাটি নামাইয়া ধরিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"কি রকম ? আমি নিমন্ত্রণ পাব না কি রকম ? জান, আমি আজ বিশ বচ্ছর ধরে তাদের এষ্টেটের বাঁধা মোক্তার ?—আমাকে বাদ দিয়ে তারা তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে, এইটে কি সম্ভব মনে কর ?"

জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে ইঁহারা বেশ চিনিতেন—সকলেই চিনে। অতি অল্প কারণে তাঁহার তীব্র অভিমান উপস্থিত হয়—অথচ হৃদয়খানি স্নেহে, বন্ধুবাৎসল্যে কুসুমের মত কোমল, ইহা, যে তাঁহার সঙ্গে কিছুদিনও ব্যবহার করিয়াছে, সেই জানিয়াছে। উকিলবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না—না—সে কথা নয়—সে কথা নয়। আপনি রাগ করলেন মুখুয্যে মশায় ? আমরা কি সে ভাবে বলছি ? এ জেলার মধ্যে এমন কে বিষয়ী লোক আছে, যে আপনার কাছে উপকৃত নয়—আপনার খাতির না করে ? আমাদের জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, আপনি সে দিন পীরগঞ্জে যাবেন কি ?"

মুখোপাধ্যায় নরম হইলেন। বলিলেন—"ভায়ারা, বস।"—বলিয়া

সম্মুখস্থ আর একখানি বেঞ্চ দেখাইয়া দিলেন।—উভয়ে উপবেশন করিলে বলিলেন—"পীরগঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে একটু কঠিন বটে। সোম মঙ্গল দুটো দিন কাছারি কামাই হয়। অথচ না গেলে তারা ভারি মনে দুঃখিত হবে! তোমরা যাচ্ছ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"যাবার ত খুবই ইচ্ছে—কিন্তু অত দূর যাওয়া ত সোজা নয়! ঘোড়ার গাড়ীর পথ নেই। গোরুর গাড়ী করে যেতে হলে, যেতে দুদিন আসতে দুদিন। পাল্কী করে যাওয়া—সেও যোগাড় হওয়া মুস্কিল। আমরা দুজনে তাই পরামর্শ করলাম, যাই মুখুয্যে মশায়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি যান, নিশ্চয়ই রাজবাড়ী থেকে একটা হাতী টাতী আনিয়ে নেবেন এখন, আমরা দুজনেও তাঁর সঙ্গে সেই হাতীতে দিব্যি আরামে যেতে পারব!"

মোক্তার মহাশয় স্মিতমুখে বলিলেন—"এই কথা? তার জন্যে আর ভাবনা কি ভাই?—মহারাজ নরেশচন্দ্র ত আমার আজকের মক্কেল নন—ওঁর বাপের আমল থেকে আমি ওঁদের মোক্তার। আমি কাল সকালেই রাজবাড়ীতে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি—সন্ধ্যে নাগাদ হাতী এসে যাবে এখন।"

কুঞ্জবাবু বলিলেন—"দেখলে হে ডাক্তার, আমি ত বলেইছিলাম—অত ভাবছ কেন, মুখুয্যে মশায়ের কাছে গেলেই একটা উপায় হয়ে যাবে। তা মুখুয্যে মশায়, আপনাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। না গেলে ছাড়ছিনে।"

"যাব বৈকি ভায়া—আমিও যাব। তবে আমার ত বাই খেমটা শোনবার বয়স নেই—তোমরা শুনো। আমি মাথায় এক পাগ্ বেঁধে, একটি খেলো হুঁকো হাতে করে, লোকজনের অভ্যর্থনা করব, কে খেলে, কে না খেলে দেখব—তদারক করে বেড়াব। আর তোমরা বসে শুনবে 'পেয়ালা মুঝে ভর দে'—কেমন?"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সেইরূপ অনেকে আগমন করিয়াছেন—পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারবাবু ও উকিল বাবুও আছেন। হাতীকে বাঁধিবার জন্য বাগানে খানিকটা স্থান পরিষ্কৃত করা হইতেছে, হাতী রাত্রে খাইবে বলিয়া বড় বড় পাতাশুদ্ধ কয়েকটা কলাগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের ডাল কাটাইয়া রাখা হইতেছে—মোক্তার মহাশয় সে সমস্ত তদারক করিতেছেন। মাঝে মাঝে বৈঠকখানায় আসিয়া, কোনও ব্রাহ্মণের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুই চারি টান দিয়া আবার বাহির হইয়া যাইতেছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জয়রাম বৈঠকখানায় বসিয়া পাশাখেলা দেখিতে ছিলেন। এমন সময় সেই পত্রবাহক ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হাতী পাওয়া গেল না।"

কুঞ্জবাবু নিরাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ! –পাওয়া গেল না?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তাই ত! সব মাটী?"

মোক্তার মহাশয় বলিলেন—"কেন রে, হাতী পাওয়া গেল না কেন? চিঠির জবাব এনেছিস?"

ভৃত্য বলিল—"আজ্ঞে না। দেওয়ানজীকে গিয়ে চিঠি দিলাম। তিনি চিঠি নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এসে বললেন; বিয়ের নেমতন্ন হয়েছে তার জন্যে হাতী কেন? গরুর গাড়ীতে আসতে বোলো।"

এই কথা শুনিবামাত্র জয়রাম ক্ষোভে, লজ্জায়, রোষে যেন একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই চক্ষু দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। কম্পিতস্বরে ঘাড় বাঁকাইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন—"হাতী দিলে না! হাতী দিলে না!"

সমবেত ভদ্রলোকগণ ক্রীড়া বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিলেন। কেহ কেহ বলিলেন—"তার আর কি করবেন মুখুয্যে মশায়! পরের জিনিষ, জোর ত নেই? একখানা ভাল দেখে গোরুর গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে রাত্রি দশটা এগারটার সময় বেরিয়ে পড়ুন, ঠিক সময় পৌঁছে যাবেন। ঐ ইমামদ্দি শেখ এক যোড়া নতুন বলদ কিনে এনেছে—খুব দ্রুত যায়।"

জয়রাম বক্তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া বলিলেন—"না। গোরুর গাড়ীতে চড়ে আমি যাব না। যদি হাতী চড়ে যেতে পারি, তবেই যাব, নইলে এ বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহর হইতে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে দুই তিন জন জমিদারের হস্তী ছিল। সেই রাত্রেই জয়রাম তত্তৎ স্থানে লোক পাঠাইয়া দিলেন, যদি কেহ হস্তী বিক্রয় করে, তবে কিনিবেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর একটি মাদী হাতী আছে—এখনও বাচ্ছা। বিক্রী করবে, কিন্তু বিস্তর দাম চায়।"

"কত?"

"দু হাজার টাকা।"

"খুব বাচ্ছা?"

"না, সওয়ারি নিতে পারবে।"

"কুছ পরওয়া নেই। তাই কিনব। এখনই তুমি যাও। কাল সকালেই যেন হাতী আসে। লাহিড়ী মশায়কে আমার নমস্কার জানিয়ে বোলো, হাতীর সঙ্গে যেন কোন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী পাঠিয়ে দেন, হাতী দিয়ে টাকা নিয়ে যাবে।"

পরদিন বেলা সাতটার সময় হস্তিনী আসিল। তাহার নাম—আদরিণী। লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ম্মচারী রীতিমত ষ্ট্যাম্প-কাগজে রসিদ লিখিয়া দিয়া দুই হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

বাড়ীতে হাতী আসিবামাত্র পাড়ার যাবৎ বালক বালিকা আসিয়া বৈঠকখানার উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। দুই এক জন অশিষ্ট বালক সুর করিয়া বলিতে লাগিল—"হাতী, তোর গোদা পায়ে নাতি।" বাড়ীর বালকেরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং অপমান করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

হস্তিনী গিয়া অন্তঃপুরদ্বারের নিকট দাঁড়াইল। মুখুয্যে মহাশয় বিপত্নীক—তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ একটী ঘটীতে জল লইয়া সভয়-পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন। কম্পিত হস্তে তাহার পদচতুষ্টয়ে সেই জল একটু একটু ঢালিয়া দিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে আদরিণী তখন জানু পাতিয়া বসিল। বড়বধূ তৈল ও সিন্দুরে তাহার ললাট রঞ্জিত করিয়া দিলেন। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। আবার দাঁড়াইয়া উঠিলে, একটা ধামায় ভরিয়া আলোচাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রক্ষিত হইল—শুঁড় দিয়া তুলিয়া তুলিয়া কতক সে খাইল, অধিকাংশ ছিটাইয়া দিল। এইরূপে বরণ সম্পন্ন হইলে, রাজহস্তীর জন্য সংগৃহীত সেই কদলীকাণ্ড ও বৃক্ষশাখা আদরিণী ভোজন করিতে লাগিল।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পীরগঞ্জ হইতে ফিরিবার পরদিন বিকালেই মহারাজ নরেশচন্দ্রের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বলা বাহুল্য, হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই গেলেন।

মহারাজের দ্বিতল বৈঠকখানার নিম্নে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে প্রবেশের সিংহদ্বার। বৈঠকখানায় বসিয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ ও সিংহদ্বারের বাহিরেরও অনেক দূর অবধি মহারাজের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

রাজসমীপে উপনীত হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মোকর্দ্দমা ও বিষয়-সংক্রান্ত দুই চারি কথার পর মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুখুয্যে মশায়, ও হাতীটি কার?"

মুখুয্যে মহাশয় বিনীত ভাবে বলিলেন—"আজ্ঞে, হুজুর বাহাদুরেরই হাতী।"

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আমার হাতী! কই, ও হাতী ত কোনও দিন আমি দেখিনি? কোথা থেকে এল?"

"আজ্ঞে, বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে কিনেছি।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া রাজা বলিলেন—"আপনি কিনেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে বললেন আমার হাতী?"

বিনয় কিংবা শ্লেষসূচক—ঠিক বোঝা গেল না—একটু মৃদু হাস্য করিয়া জয়রাম বলিলেন—"যখন হুজুর বাহাদুরের দ্বারাই প্রতিপালন হচ্ছি—আমিই যখন আপনার—তখন ও হাতী আপনার বৈ আর কার?"

সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর নিকট মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষোভ ও লজ্জা আজ তাঁহার মুছিয়া গেল। কয়েক দিন পরে আজ তাঁহার সুনিদ্রা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত ঘটনার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়াছে—এই পাঁচ বৎসরে মোক্তার মহাশয়ের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

নূতন নিয়মে পাস করা শিক্ষিত মোক্তারে জেলাকোর্ট ভরিয়া গিয়াছে। শিথিল নিয়মের আইন-ব্যবসায়ীর আর কদর নাই। ক্রমে ক্রমে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আয় কমিতে লাগিল। পূর্ব্বে যত উপার্জ্জন করিতেন এখন তাহার অর্দ্ধেক হয় কি না সন্দেহ। অথচ ব্যয় প্রতি বৎসর বর্দ্ধিতই হইতেছে। তাঁহার তিনটি পুত্র। প্রথম দুইটি মূর্খ—বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও কর্ম্ম করিবার যোগ্য নহে। কনিষ্ঠ পুত্রটি কলিকাতায় পড়িতেছে—সেটি যদি কালক্রমে মানুষ হয় এইমাত্র ভরসা।

ব্যবসায়ের প্রতি মুখোপাধ্যায়ের আর সে অনুরাগ নাই—বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ছোকরা মোক্তারগণ, যাহাদিগকে এক সময় উলঙ্গাবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা এখন শামলা মাথায় দিয়া (মুখোপাধ্যায় মাথায় পাগড়ী বাঁধিতেন, সেকালে মোক্তারগণ শামলা ব্যবহার করিতেন না) তাঁহার প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া ফর্ ফর্ করিয়া ইংরাজিতে হাকিমকে কি বলিতে থাকে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। পার্শ্বস্থিত ইংরাজিজানা জুনিয়রকে জিজ্ঞাসা করেন,

খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে—ওদের একে একে বিক্রী করে ফেল।”—এরূপ উক্তির পর আর কথা চলে না।

হাতীটিকে দেখিয়া মুখোপাধ্যায়ের মনে হইল, ইহাকে যদি মধ্যে মধ্যে ভাড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ত কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতে পারে। তখনই কাগজ কলম লইয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুসাবিদা করিলেন :—

হস্তী ভাড়ার বিজ্ঞাপন

বিবাহের শোভাযাত্রা, দূরদূরান্তে গমনাগমন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য নিম্ন সাক্ষরকারীর আদরিণী নাম্নী হস্তিনী ভাড়া দেওয়া হইবে। ভাড়া প্রতি রোজ ৩৲ মাত্র, হস্তিনীর খোরাকী ১৲ এবং মাহুতের খোরাকী ৷৹ একুনে ৪৷৹ ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন ঠিকানায় তত্ত্ব লইবেন।

শ্রীজয়রাম মুখোপাধ্যায় (মোক্তার)
চৌধুরীপাড়া

এই বিজ্ঞাপনটি ছাপাইয়া, সহরের প্রত্যেক ল্যাম্পপোষ্টে, পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষকাণ্ডে, এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দেওয়া হইল।

বিজ্ঞাপনের ফলে, মাঝে মাঝে লোক হস্তী ভাড়া লইতে লাগিল বটে—কিন্তু তাহাতে ১৫।২০৲ টাকার বেশী আয় হইল না।

মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্রটি পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ডাক্তার-খরচ, ঔষধ-পথ্যাদির খরচ প্রতিদিন ৫৲।৭৲ টাকার কমে নির্ব্বাহ হয় না। মাসখানেক পরে বালকটি কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল। বড়বধূ মেজবধূ উভয়েই অন্তঃসত্ত্বা। কয়েক মাস পরেই আর দুইটি জীবের অন্নসংস্থান করিতে হইবে।

এদিকে জ্যেষ্ঠা পৌত্রী কল্যাণী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যেরূপ ডাগর হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়। নানাস্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতেছে বটে, কিন্তু ঘর-বর মনের মতন হয় না। যদি ঘর-বর মনের মতন হইল, তবে তাহাদের খাঁই শুনিয়া চক্ষুস্থির হইয়া যায়। কন্যার পিতা এ সম্বন্ধে একেবারে

নির্লিপ্ত। সে নেশাভাঙ করিয়া, তাস পাশা খেলিয়া, ফ্লুট বাজাইয়া বেড়াইতেছে। যত দায় এই ষাট বৎসরের বুড়ারই ঘাড়ে।

অবশেষে একস্থানে বিবাহ স্থির হইল। পাত্রটি রাজসাহী কলেজে এল-এ পড়িতেছে, খাইবার পরিবার সংস্থানও আছে। তাহারা দুই হাজার টাকা চাহে; নিজেদের খরচ পাঁচ শত—আড়াই হাজার টাকা হইলেই বিবাহটি হয়।

কোম্পানীর কাগজের বাণ্ডিল দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে—তাহা হইতে আড়াই হাজার বাহির করা বড়ই কষ্টকর হইয়া দাড়াইল। আর, শুধু ত একটি নহে—আরও নাতিনীরা রহিয়াছে। তাহাদের বেলায় কি উপায় হইবে?

এই সকল ভাবনা চিন্তার মধ্যে পড়িয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। একদিন সংবাদ আসিল; কনিষ্ঠ পুত্রটি বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল, সেও ফেল হইয়াছে।

বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন—"মুখুয্যে মশায়, হাতীটিকে বিক্রী করে ফেলুন—করে নাতনীর বিবাহ দিন। কি করবেন, বলুন। অবস্থা বুঝে ত কায করতে হয়! আপনি জ্ঞানী লোক, মায়া পরিত্যাগ করুন।"

মুখোপাধ্যায় আর কোনও উত্তর দেন না। মাটির পানে চাহিয়া ম্লানমুখে বসিয়া কেবল চিন্তা করেন, এবং মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

চৈত্র সংক্রান্তিতে বামুনহাটে একটি মেলা হয়। সেখানে বিস্তর গরু বাছুর ঘোড়া হাতী উট বিক্রয়ার্থ আসে। বন্ধুগণ বলিলেন—"হাতীটিকে মেলায় পাঠিয়ে দিন, বিক্রী হয়ে যাবে এখন। দু' হাজারে কিনেছিলেন, এখন হাতী বড় হয়েছে—তিন হাজার টাকা অনায়াসে পেতে পারবেন।"

কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"কি করে তোমরা এমন কথা বলছ?"

বন্ধুরা বুঝাইলেন—"আপনি বলেন, ও আমার মেয়ের মত। তা মেয়েকেই কি চিরদিন ঘরে রাখা যায়? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে

শ্বশুরবাড়ী চলে যায়, তার আর উপায় কি? তবে পোষা জানোয়ার অনেক দিন ঘরে রয়েছে, মায়া হয়ে গেছে, একটু দেখে শুনে কোনও ভাল লোকের হাতে বিক্রী করলেই হয়। যে বেশ আদর যত্নে রাখবে, কোনও কষ্ট দেবে না—এমন লোককে বিক্রী করবেন।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া জয়রাম বলিলেন—"তোমরা সবাই যখন বলছ তখন তাই হোক। দাও, মেলায় পাঠিয়ে দাও। একজন ভাল খদ্দের ঠিক কর—তাতে দামে যদি দু-পাঁচশো টাকা কমও হয়, সেও স্বীকার।"

মেলাটি চৈত্র-সংক্রান্তির প্রায় পনের দিন পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। তবে শেষের চারি পাঁচ দিনই জমজমাট বেশী। সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যাত্রা স্থির হইয়াছে। মাহুত ত যাইবেই—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রটিও সঙ্গে যাইবে।

যাত্রার দিন অতি প্রত্যূষে মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে হস্তী ভোজন করিতেছে। বাটীর মেয়েরা, বালকবালিকাগণ সজলনেত্রে বাগানে হস্তীর কাছে দাঁড়াইয়া। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বদিন দুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ডালপালা প্রভৃতি মামুলি খাদ্য শেষ হইলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে মুঠা মুঠা করিয়া সেই রসগোল্লা হস্তিনীকে খাওয়াইলেন। শেষে, তাহার গলার নিম্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—"আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস।"—প্রাণ ধরিয়া বিদায়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। উদ্বেল দুঃখে, এই ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন।

হাতী চলিয়া গেল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় শূন্য মনে বৈঠকখানার ফরাস বিছানার উপর গিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। অনেক বেলা হইলে, অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া বধূরা তাঁহাকে স্নান করাইলেন। স্নানান্তে আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু পাতের অন্ন-ব্যঞ্জন অধিকাংশই অভুক্ত পড়িয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কল্যাণীর বিবাহের সমস্ত কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুভকার্য্যের দিনস্থির হইয়াছে। বৈশাখ পড়িলেই উভয় পক্ষের আশীর্ব্বাদ হইবে। হস্তি বিক্রয়ের টাকাটা আসিলেই গহনা গড়াইতে দেওয়া হয়।

কিন্তু ১লা বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা মস্ মস্ করিয়া আদরিণী ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিক্রয় হয় নাই—উপযুক্ত মূল্য দিবার খরিদ্দার জোটে নাই।

আদরিণীকে ফিরিতে দেখিয়া বাড়ীতে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। বিক্রয় হয় নাই বলিয়া কাহারও কোনও খেদের চিহ্ন সে সময় দেখা গেল না। যেন হারাধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে—সকলের আচরণে এইরূপই মনে হইতে লাগিল।

বাড়ীর লোকে বলিতে লাগিল—"আহা, আদর রোগা হয়ে গেছে। বোধ হয় এ ক'দিন সেখানে ভাল করে খেতে পায়নি। ওকে দিন-কতক এখন বেশ করে খাওয়াতে হবে।"

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস অপনীত হইলে, পরদিন সকলের মনে হইল—কল্যাণীর বিবাহের এখন কি উপায় হইবে?

প্রতিবেশী বন্ধুগণ আবার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। অত বড় মেলায় অমন ভাল হাতীর খরিদ্দার কেন জুটিল না, তাহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। একজন বলিলেন—"ঐ যে আবার মুখুয্যে মশায় বল্লেন 'আদর, যাও মা, মেলা দেখে এস'—তাই বিক্রী হল না। উনি ত আর আজকালকার মুর্গীখোর ব্রাহ্মণ নন! ওঁর মুখ দিয়ে যে ব্রহ্মবাক্য বেরিয়েছে, সে কথা কি নিষ্ফল হবার যো আছে! কথায় বলে—ব্রহ্মবাক্য বেদবাক্য।"

বামুনহাটের মেলা ভাঙ্গিয়া, সেখান হইতে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রসুলগঞ্জে সপ্তাহব্যাপী আর এক মেলা হয়। যে সকল গো-মহিষাদি

বামুনহাটে বিক্রয় হয় নাই—সে সব রসুলগঞ্জে গিয়া জমে। সেইখানেই আদরিণীকে পাঠাইবার পরামর্শ হইল।

আজ আবার আদরিণী মেলায় যাইবে। আজ আর বৃদ্ধ তাহার কাছে গিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। রীতিমত আহারাদির পর আদরিণী বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী আসিয়া বলিল—"দাদামশায়, আদর যাবার সময় কাঁদছিল।"

মুখোপাধ্যায় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—"কি বল্লি? কাঁদছিল?"

"হ্যাঁ দাদামশায়। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।"

বৃদ্ধ আবার ভূমিতে পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন—"জানতে পেরেছে। ওরা অন্তর্য্যামী কি না! এ বাড়ীতে যে আর ফিরে আসবে না, তা জানতে পেরেছে।"

নাতিনী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"যাবার সময় আমি তোর সঙ্গে দেখাও করলাম না—সে কি তোকে অনাদর করে? না মা, তা নয়। তুই ত অন্তর্য্যামী—তুই কি আমার মনের কথা বুঝতে পারিস নি?—খুকীর বিয়েটা হয়ে যাক। তার পর, তুই যার ঘরে যাবি, তাদের বাড়ী গিয়ে আমি তোকে দেখে আসব। তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব—রসগোল্লা নিয়ে যাব। যতদিন বেঁচে থাকব, মনে কোনও অভিমান করিসনে মা।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন বিকালে একটি চাষীলোক একখানি পত্র আনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে দিল।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মধ্যমপুত্র লিখিয়াছে—'বাটী হইতে সাত ক্রোশ দূরে আসিয়া কল্য বিকালে আদরিণী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। সে আর পথ চলিতে পারে না। রাস্তার পার্শ্বে একটা আমবাগানে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার পেটে বোধ

হয় কোনও বেদনা হইয়াছে—শুঁড়টি উঠাইয়া মাঝে মাঝে কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। মাহুত যথাবিদ্যা সমস্ত রাত্রি চিকিৎসা করিয়াছে—কিন্তু কোনও ফল হয় নাই—বোধ হয় আদরিণী আর বাঁচিবে না। যদি মরিয়া যায় তবে তাহার শবদেহ প্রোথিত করিবার জন্য নিকটেই একটু জমি বন্দোবস্ত লইতে হইবে। সুতরাং কর্ত্তা মহাশয়ের অবিলম্বে আসা আবশ্যক।'

বাড়ীর মধ্যে গিয়া উঠানে পাগলের মত পায়চারি করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"আমার গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দাও। আমি এখনি বেরুব। আদরের অসুখ—যাতনায় সে ছটফট করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হবে না। আমি আর দেরী করতে পারব না।"

তখনই ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে লোক ছুটিল। রাত্রি দশটার সময় গাড়ী ছাড়িল। জ্যেষ্ঠপুত্রও সঙ্গে গেলেন। পত্রবাহক সেই চাষীলোকটী কোচবাক্সে বসিল।

পরদিন প্রভাতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন—সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আদরিণীর সেই নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহখানি আম্রবনের ভিতর পতিত রহিয়াছে—তাহা আজ নিশ্চল—নিস্পন্দ।

বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া হস্তিনীর শবদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—"অভিমান করে চলে গেলি মা? তোকে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলাম বলে—তুই অভিমান করে চলে গেলি?"

ইহার পর দুইটি মাস মাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন।

খোকার কাণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক মাসের নূতন হিম লাগিয়া হরসুন্দরবাবুর যে কাসিটীর সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা আজিও ভাল হইল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবস্থা এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে সারারাত্রি নিদ্রা নাই, স্ত্রী পঙ্কজিনীর শুশ্রূষার গুণে যদি একটু বা ঘুম আসিল, দশ মিনিট যাইতে না যাইতেই হরসুন্দরবাবু খক্ খক্ করিয়া কাসিতে কাসিতে একেবারে উঠিয়া বসেন। দেড় মাস কাল অনেক প্রকার ঔষধপত্র হইয়াছে, কিন্তু কিছুই ফল পাওয়া যায় নাই। কাসি আর কার না হয়?—তবে ভাবনার কথা এই যে ব্যাধিটা কৌলিক—হরসুন্দর বাবুর পিতার ইহা ছিল, এবং তাঁহার দুইটি সহোদর অল্প বয়সেই এই রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই কারণে হরসুন্দরবাবু একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। দুইটি কোম্পানীতে দশ হাজার টাকায় তাঁহার জীবন বীমা করা ছিল, পলিসি দুইখানি এবং রসিদগুলি সেদিন বাহির করিয়া, স্ত্রীর জিম্মা করিয়া দিয়াছেন। একখানি কোম্পানির কাগজ ছিল, সেখানিও পঙ্কজিনীর সাক্ষাতে তাহার নামে এন্‌ডোর্স করিয়া রাখিয়াছেন।

হরসুন্দরবাবুর বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসরের কাছাকাছি। পঙ্কজিনী ইঁহার অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট। বিবাহের দুই তিন বৎসর পরেই হরসুন্দরবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই অবধি তিনি নববিধান সমাজের একজন বিশেষ উৎসাহশীল সভ্য। এম-এ উপাধি গ্রহণের পর আইন পরীক্ষাতেও পাস করিয়াছিলেন, কিন্তু ওকালতী ব্যবসায়ে মিথ্যা কথা কহিতে হয় শুনিয়া, সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্কুল মাষ্টারি কার্য্যে প্রবেশ করেন। বিগত পাঁচ বৎসর হইতে কোনও বে-সরকারী কলেজে তিনি অধ্যাপকের কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছেন। রামদয়াল মল্লিকের লেনে একটি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করেন। বাড়ীতে

তাঁহার স্ত্রী, তিন বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র—তাহার নাম সত্যসুন্দর অথবা খোকা—রামটহল নামক একজন পশ্চিমী ভৃত্য এবং পিয়ারী নাম্নী একজন কাহার-কুলোদ্ভবা ঝি আছে, কিন্তু সচরাচর তাহাকে আয়া বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

সেদিন সন্ধ্যার পর হরসুন্দরবাবু পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়াছিলেন, পঙ্কজিনী বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। পালঙ্ক হইতে দূরে একটি কোণে টেবিলের উপর ল্যাম্প জ্বলিতেছিল—আলো খুব কমানো ছিল—সেই সামান্য আলোকও পাছে হরসুন্দরবাবুর চোখে আসিয়া লাগে তাই একখানি 'সঞ্জীবনী' সেই ল্যাম্পের গায়ে হেলাইয়া আড়াল করা হইয়াছে। আয়া খোকাকে লইয়া কক্ষান্তরে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, বাড়ীটি নিস্তব্ধ। পঙ্কজিনী স্বামীর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে মনে মনে, 'মা কালী', 'মা দুর্গা' প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্ম-বহির্ভূত নিষিদ্ধ দেবতাগণকে ডাকিয়া সজল নয়নে প্রার্থনা করিতেছিল, যেন তাঁহারা কৃপা করিয়া উপায়বিহীনার স্বামীটিকে সত্বর আরোগ্য-দান করেন।

এরূপ একজন পূরাদস্তর ব্রাহ্মের স্ত্রী কালী দুর্গাকে ডাকিতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। নিজের যোগ্য স্ত্রীলাভ কয়জনের অদৃষ্টে ঘটে? হরসুন্দরবাবুরও ঘটে নাই। অনেক সময়েই দেখা যায় অত্যন্ত নিরীহ ব্যক্তির স্ত্রী উগ্রচণ্ডাস্বরূপিনী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের ব্রাহ্মণী বর্ণজ্ঞানহীনা, কোপনস্বভাব দুশ্চরিত্রের জীবনসঙ্গিনী পাতিব্রত্য-গুণে সমাজের আদর্শস্থানীয়া। যোগ্যের সহিত যোগ্যার যোজনা উপন্যাসের বাহিরে প্রায়ই হয় না—বিশ্বসৃষ্টির অনাসৃষ্টিত্ব বিশেষ করিয়া এইখানেই।

বিবাহের সময় পঙ্কজিনী যেরূপ গোঁড়া হিন্দু ছিল, ভিতরে ভিতরে এখনও সে তাহাই আছে। হিন্দুকন্যার পক্ষে একটু অধিক বয়সেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। প্রথম কয়েক বৎসর স্বামীর অনাচার ও অহিন্দুয়ানী দেখিয়া সে যে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিল এমন নহে—সে ভাবিত, আজি কালিকার লেখাপড়া-জানা অধিকাংশ যুবকই ত ঐরূপ। পরে যখন হরসুন্দরবাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন তাহার পিত্রালয়ে

ইহা লইয়া খুবই একটা গোলযোগ উঠিয়াছিল। এমন কি তাঁহার পিতা, জামাতার নিকট কন্যা পাঠাইবেন না বলিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া পঙ্কজিনী কাঁদাকাটা আরম্ভ করে এবং পিত্রালয়ে ফিরিবার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইল জানিয়াও, স্বামীর নিকট চলিয়া আসে। এখন পঙ্কজিনীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস, যদি মা কালী, মা দুর্গা তাহার স্বামীকে বাঁচাইয়া রাখেন, তবে চুল পাকিবার, দাঁত নড়িবার সময় সময় তিনি অবশ্যই গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পৈতৃক ধর্ম্মের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিবেন। এমন ত কত লোক আসিয়াছে। তাহাদেরই গ্রামের কুমুদিনীর পিতা এরূপ করিয়াছিলেন এবং ছেলেবেলা মাতার সহিত সেই প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়ার কথা আজিও পঙ্কজিনীর স্পষ্ট মনে আছে।

পার্শ্বের একটি কক্ষ হইতে ঘড়িতে আটটা বাজিবার শব্দ আসিল। হরসুন্দর এইবার পাশ ফিরিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—"পঙ্কজ, ও ক'টা বাজল ?"—এই কথা কয়টি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কাসিতে আরম্ভ করিলেন।

পঙ্কজিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কাসি থামিলে বলিল, "আটটা বেজেছে। তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। ওষুধ এনে দিই ?"

ঔষধ পান করিবার পর হরসুন্দরবাবু একটু সুস্থ হইলেন। একটি আধটি করিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। খোকার কথা, ঘর-সংসারের কথা, নিজের রোগের কথা কহিতে কহিতে বলিলেন, "পঙ্কজ, একটা কথা আজ ক'দিন থেকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি—"

পঙ্কজিনী বলিল, "কি কথা ?"

হরসুন্দর বলিলেন, "দেখ, আমরা ত দুজনেই এ ক'বছর ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করেছি। আমি এই ধর্ম্ম মানবজাতির একমাত্র সত্যধর্ম্ম বলে দৃঢ় বিশ্বাস করি। কিন্তু পঙ্কজ, তোমার বিশ্বাসটিও কি সেই রকম দৃঢ় হয়েছে ?"

পঙ্কজিনী বিনা দ্বিধায় বলিল, "হয়েছে বৈকি।"—সে জানিত, অন্যরূপ উত্তর করিলে স্বামী মনে ক্লেশ পাইবেন। আজ বলিয়া নয়, অনেক

দিন হইতেই সে এই প্রকার কপটতা অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। প্রথম দুই এক বৎসর সে সত্য কথা বলিত, স্বামীর সহিত যথাবুদ্ধি তর্কবিতর্কও করিত—কিন্তু দেখিল, তাহাতে স্বামীকে আঘাত করা ছাড়া আর কোনও ফল হয় না। তাহার বিশ্বাস, মিথ্যা বলাও পাপ, স্বামীর মনে ক্লেশ দেওয়াও পাপ; কিন্তু স্বামীর মনে ক্লেশ দেওয়ার পাপ, মিথ্যা বলার পাপের চেয়ে শতগুণ গুরুতর।

হরসুন্দর বলিলেন, "আচ্ছা, সে ত গেল ধর্ম্মসম্বন্ধে। সমাজনীতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া না শিখিয়ে, ঘরে বন্ধ করে রাখার চেয়ে ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া আর স্বাধীনতা দেওয়া, সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর তা তুমি বিশ্বাস কর ত?"

পঙ্কজিনী মুখস্থ পড়ার মত বলিল, "তা আর নয়? পুরুষ, স্ত্রী উভয়ে মিলে ত সমাজ। পুরুষ লেখাপড়া শিখবে স্ত্রীলোক মূর্খ হয়ে থাকবে—এমন হলে সমাজের আধখানাই যে অন্ধকারে ঢাকা রইল। স্ত্রীলোককে ঘরে বন্ধ করে রাখা সেই বর্ব্বরযুগের প্রথা মাত্র—তাতে কখনই মঙ্গল হতে পারে না।"

হরসুন্দরবাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। রামটহল এই সময় পর্দ্দার বাহিরে দাঁড়াইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল, "মেমসাহেব, বাবুর জন্য বার্লি তৈয়ারি হইয়াছে, আনিব কি?"

পঙ্কজিনী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বার্লিটুকু এখন খাবে কি?"

হরসুন্দর বলিলেন, "থাক্। ন'টা বাজুক।"

তদনুরূপ আদেশ পাইয়া রামটহল চলিয়া গেল। হরসুন্দরবাবু স্ত্রীর হাতখানি নিজ হস্তযুগলের মধ্যে লইয়া বলিলেন—"পঙ্কজ, আর—বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত কি?"

এবার ছলনা করিয়া মিথ্যা উত্তর দেওয়া পঙ্কজিনীর পক্ষে একটু কঠিন হইল। এ সম্বন্ধেও পঙ্কজিনী পুরাতন প্রচলিত হিন্দুমতই পোষণ করিত—কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এটার উল্টা উত্তর দিতে তাহার প্রাণে বাজে। স্বামী এতাবৎকাল বিধবা-বিবাহের ঔচিত্য ও প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন—তাই পঙ্কজিনী একটু বিপন্ন হইয়া পড়িল।

হরসুন্দরবাবু পঙ্কজিনীর হাতখানির উপর স্নেহের সহিত, বড় ভালবাসিয়া, হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রশ্নটির পুনরুক্তি করিলেন। পঙ্কজিনী তখন দুইদিক বজায় রাখিবার চেষ্টায়, থামিয়া থামিয়া বলিল—"হ্যাঁ—তা মন্দ কি?—কারু কারু পক্ষে—দরকার হতে পারে।"

হরসুন্দরবাবু বলিলেন—"সেই কথাই ঠিক পঙ্কজ, সেই কথাই ঠিক। এক সময় আমি মনে করতাম, ত্রিশ বৎসরের নীচে যে কোনও স্ত্রীলোক বিধবা হলে, তার পক্ষে বিবাহ করাই কর্ত্তব্য—নইলে সামাজিক নীতির হানি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু কিছু দিন থেকে আমার সে মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন আমার মনে হয়, যে স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয়েছে, স্বামী মারা গেলেও যার অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না—এমন স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধবাবিবাহ করা বোধ হয়, সঙ্গত নয়। তোমার কি বিশ্বাস পঙ্কজ?"

এ প্রশ্ন শুনিয়া পঙ্কজিনীর বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন কি রকম হইল। তাহার মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল। দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুজল যেন ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল। সে কথা কহিতে পারিল না।

একটু অপেক্ষা করিয়া হরসুন্দরবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি বিশ্বাস পঙ্কজ?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পঙ্কজিনী বলিল, "আমার কি বিশ্বাস, শুনবে?"

"বল।"

"আমার বিশ্বাস, যে স্ত্রীলোক তার স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে, তার বয়স পঞ্চাশই হোক আর পনেরোই হোক, সে দশ ছেলের মা-ই হোক আর নিঃসন্তানই হোক, রাজরাণীই হোক আর পথের ভিখারিণীই হোক—তার যদি কপাল পোড়ে—যদি সে বিধবা হয়—তাহলে আবার বিবাহ করা তার পক্ষে মহাপাপ।"

পঙ্কজিনী চুপ করিল। তাহার নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছিল। ঘরে যথেষ্ট আলো ছিল না, থাকিলে দেখিতে পাইত, তাহার স্বামীর রোগক্লিষ্ট মুখে একটা প্রসন্নতার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরসুন্দরবাবুর পীড়া ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিল, উপশমের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। মাঝে মাঝে দুই একদিন করিয়া কলেজ কামাই হইতে লাগিল। একদিন একটু রক্ত দেখা দিল। বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে সে দিন ১৬৲ ভিজিট দিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে একজন বিখ্যাত সাহেব-ডাক্তারকে আনিয়া দেখান হইল। তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন করিয়া হরসুন্দরবাবু একটু ভাল আছেন, আজ পাঁচ দিন পরে কলেজে গিয়াছেন।

দ্বিপ্রহরের পর পঙ্কজিনীর একজন সখী শরৎশশী আসিয়া দর্শন দিল। শরৎ পঙ্কজিনীর সমবয়স্কা, ব্রাহ্মণকন্যা, তাহার স্বামী হাইকোর্টের একজন এটর্ণি। শরৎশশী হিন্দুঘরের বধূ হইলেও, বেশ লেখাপড়া জানে—বরং পঙ্কজিনীর অপেক্ষা বেশীই জানে। স্বামীর কাছে একটু ইংরাজিও পড়িয়াছে। শরৎশশীর একটি ছেলে হইয়াছিল, সেটি পাঁচ বৎসরের হইয়া মারা যায়। পঙ্কজিনীর ছেলেটি নাকি কতকটা তাহারই মত দেখিতে। তাই শরৎ মাঝে মঝে এখানে আসিয়া, খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরে। খোকাও মাসীমা বলিতে অজ্ঞান।

আজ আসিয়া সকল কথা শুনিয়া শরৎশশী বলিল, "দেখ ভাই, তোমরা যে ব্রহ্মজ্ঞানী, তাই হয়েছে মুস্কিল কিনা। নইলে এ রোগ ত এতদিন কোন্ কালে আরাম হয়ে যেত।"

পঙ্কজিনী আগ্রহের সহিত বলিল, "কেমন করে ভাই?"

শরৎ বলিতে লাগিল, "আমার বাপের বাড়ীর গ্রামে বাবা ষণ্ডেশ্বর বলে' খুব জাগ্রত এক ঠাকুর আছেন। তাঁর যিনি পুরুত, হরিমোহন ঠাকুর, তিনি তেল পড়ে দেন। আর কিছু না, পোয়াটেক খাঁটি সর্ষের তেল সেখানে নিয়ে যেতে হয়। পুরুতঠাকুর তার উপর কি মন্তর তন্তর বলে, তেলের ভাঁড়টি সমস্ত রাত বাবা ষণ্ডেশ্বরের পায়ের কাছে রেখে দেন। পরদিন, বাবার প্রসাদী একটি বিল্বপত্র আর সেই তেল

নিয়ে আসতে হয়। বিল্বপত্রটি মাথায় ছুঁইয়ে, ভক্তি করে সেই তেল বুকে মালিস করতে হয়। বললাম কি না একেবারে ধন্বন্তরী—যে ব্যবহার করেছে সেই ভাল হয়ে গেছে।”

পঙ্কজিনী বলিল, “তা ভাই, আমরা ব্রাহ্ম বলে কি সে তেলে উপকার হবে না?”

“কেন হবে না—খুব হবে।”—এই সময় খোকা কোথা হইতে আসিয়া শরৎশশীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাসীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া, মার দিকে ফিরিয়া বলিল, “খুব হবে—খুব হবে।”

শরৎশশী বালককে আদর করিতে করিতে বলিল, “দেখ, শিশুর মুখ দিয়ে ঠাকুর কি বলছেন শোন।”—পঙ্কজিনীর গা যেন শিহরিয়া উঠিল।

শরৎশশী বলিল, “কত মুসলমান পর্য্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ভাল হচ্ছে—আর তোমাদের হবে না? ঠাকুরদের কাছে কি আর হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম খৃষ্টান আছে ভাই? তাঁদের কাছে সব সমান।”

খোকা হাত নাড়িয়া বীর-রসাত্মক স্বরে বলিল—“থব্ থোমান।”

পঙ্কজিনী নিজের স্বামীর চরিত্র বেশ জানিত। বাবা যণ্ডেশ্বরের তৈল শুনিলে ব্যবহার করা দূরে থাকুক, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিবেন ইহা নিশ্চয়। সুতরাং পঙ্কজিনী স্থির করিল, তিনি নিদ্রা গেলে গোপনে বিল্বপত্রটি মাথায় ছোঁয়াইয়া বুকে তেল মালিস করিয়া দিবে। সখীকে বলিল, “আচ্ছা ভাই, সে তেল তুমি আমাকে আনিয়ে দাও। আমি চুপি চুপি তাঁর বুকে মালিস করে দেব—তিনি জানতে পারবেন না। কবে নাগাদ আসতে পারে?”

শরৎশশী কোলের উপর খোকাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে বলিল—“আমি আজই দেশে চিঠি লিখে দেব এখন। কিন্তু দেখি দাঁড়াও। চিঠি লিখে দিলে হয়ত তেল পাঠাতে তারা দেরী করবে; তার চেয়ে বরং একটা চাকরকে পাঠিয়ে দেব।”

“সেই হলেই ভাল হয়। তা হলে কালই যাতে পাঠান হয়, তাই কর ভাই। কখন গাড়ী আছে?”

“ভোরের গাড়ীতে পাঠাব। পর্শু সেখান থেকে তেল নিয়ে বেলা বারটার সময় বেরুলে, বিকেলে এখানে এসে পৌঁছবে।”

পঙ্কজিনী মিনতির স্বরে বলিল—"তবে তাই দাও ভাই। তার যাবার আসবার গাড়ীভাড়া কত লাগবে? টাকা নিয়ে যাও।"

শরৎ বলিল, "সে বেশী কিছু নয়। তার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমি কাল সকালে লোক পাঠাব এখন। কিন্তু আর একটি কথা আছে ভাই।"

"কি?"

"ভাল হয়ে গেলে বাবা ষণ্ডেশ্বরকে পূজো দিতে যেতে হয়। যে যেমন মানৎ করে। সে বছর আমার দেওরের যখন এই ব্যারাম বেড়েছিল, আমিও মানৎ করে তেঁলপড়া এনেছিলাম। তারপর সে ভাল হয়ে গেলে, বাবার কাছে আমি ষোল আনার পূজো দিলাম, আর মাথায় এক সরা, দু হাতে দু সরা ধূনো পোড়ালাম।"

পঙ্কজিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "আমিও তাই করব। বাবা ওঁকে ভাল করে দিন, আমিও গিয়ে বাবাকে ষোল আনার পূজো দেব, মাথায় এক সরা, দু হাতে দু সরা ধূনো পোড়াব।"

শরৎ বলিল—"কিন্তু বাবু তোমাকে কি যেতে দেবেন ভাই?"

"জানতে পারলে কি যেতে দেবেন? কোন একটা ছল করে যেতে হবে আর কি! সে যেমন করে হোক তখন করা যাবে। এখন উপস্থিত বিপদ থেকে ত রক্ষা পাই!"

খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শরৎশশী সন্তর্পণে তাহার মুখে একটি চুম্ব খাইয়া, পঙ্কজিনীর কোলে তাহাকে দিয়া, গৃহে গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্যদিন কলেজ হইতে হরসুন্দর পদব্রজেই বাড়ী আসিয়া থাকেন, কিন্তু আজ গাড়ীভাড়া করিয়া আসিলেন। ডাক্তার সাহেবের ঔষধে যেটুকু বা সুফল ফলিয়াছিল, আজ তিন ঘণ্টা কাল কলেজে চীৎকার করিয়া তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয়া কষ্টে উপরে আসিয়া, তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া

পঙ্কজিনী অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল, ডাক্তার সাহেবের সেই ঔষধ সেবন করাইতে লাগিল; বেলা পাঁচটা বাজিতে হরসুন্দরবাবু প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। সন্ধ্যার পর জ্বরঘোরে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন।

ভৃত্য রামটহল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর, ডাক্তারকে খবর দিব কি?"

পঙ্কজিনী বলিল, "না, এখন ডাক্তারের কোনও প্রয়োজন নাই।" মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল—'হে বাবা ষণ্ডেশ্বর, আমি তোমারই পায়ে আশ্রয় নিয়েছি। তুমি যদি মুখ তুলে না চাও, তা হলে আমার কি উপায় হবে বাবা? আমি আর কোনও ডাক্তার ডাকব না। তুমিই আমার ডাক্তার। যাতে আমার হাতের নোয়া বজায় থাকে তাই তুমি কর—দোহাই বাবা সাত দোহাই তোমার।'—একটি টাকা বাহির করিয়া অচেতন স্বামীর কপালে ছোঁয়াইয়া, বাবা ষণ্ডেশ্বরের পূজার জন্য পঙ্কজিনী সেটি একটি সিন্দুর কৌটায় তুলিয়া রাখিল।

রাত্রি ত কোন ক্রমে কাটিয়া গেল। সংবাদ পাইয়া পরদিন প্রাতে হরসুন্দরবাবুর ধর্ম্মবন্ধুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবস্থা দেখিয়া একজন ছুটিয়া সাহেব ডাক্তারকে আনিতে গেলেন। সাহেব আসিয়া নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইঁহারা যখন ঔষধ সেবন ও শুশ্রূষাদি সম্বন্ধে পঙ্কজিনীকে উপদেশ দিতেছিলেন, সে তখন মাথা হেঁট করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "দেখুন, ওষুধপত্র অনেক রকমই হল, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা না হলে এ রোগ ভাল হবে কি?"

ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রাচীন ছিলেন তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ মা, তুমি ঠিক বলেছ। ঈশ্বরের কৃপাই আসল জিনিষ। তাঁর কৃপা হলে বিনা ওষুধেও ভাল হতে পারে, কৃপা না হলে স্বয়ং ধন্বন্তরীও কিছু করতে পারবে না।"

পঙ্কজিনী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তাই বলছিলাম—এখন কিছুদিন বরং ওষুধ বন্ধ রেখে—"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আচ্ছা মা, সে খুব ভাল কথা। তোমার মনের ভাব আমি বুঝতে পেরেছি। আজ সন্ধ্যেবেলা আমরা সকলে এসে, এখানে

বসে ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁর কৃপাভিক্ষা করব। এটি পূর্ব্বে আমাদের করা উচিত ছিল। কিন্তু পাপী আমরা—সে কথা আমাদের মনেই হয়নি। আজ তোমার কাছে শিক্ষা পেলাম মা। কিন্তু ওষুধ বন্ধ করবার প্রয়োজন নেই। ওষুধও তাঁরই দান! তাঁর চরণামৃত মনে করে রীতিমত তোমার স্বামীকে সেবন করাও। সন্ধ্যার সময় আমরা আসব।"

সন্ধ্যার পর ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া দেখিলেন, অবস্থা পূর্ব্ববৎ আছে—তবে জ্বরটা একটু কম। একজন ডাক্তার ছিলেন, তিনি উত্তম রূপে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া পঙ্কজিনীর অশ্রাব্য স্বরে গোপনে মত প্রকাশ করিলেন—আজিকার রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ!

তাহার পর সকল ব্রাহ্ম মিলিয়া রোগীর শয্যার নিম্নে মেঝের উপর বসিয়া একঘণ্টা কাল একান্ত মনে উপাসনা করিতে লাগিলেন। অদূরে পৃথগাসনে নিদ্রিত খোকাকে কোলে লইয়া বসিয়া, পঙ্কজিনীও ইঁহাদের সহিত সমবেত উপাসনার ভান করিতেছিল। সে কিন্তু মনে মনে বলিতেছিল—'বাবা ষণ্ডেশ্বর, কাল যতক্ষণ তোমার তেলপড়াটি এসে না পৌঁছোয়, ততক্ষণ আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখ বাবা! তোমার তেলপড়া এসে পৌঁছলে আর আমি ভয় করিনে। দুঃখিনীর পানে মুখ তুলে চাও—দোহাই বাবা—সাত দোহাই তোমার।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিরাকার পরব্রহ্মের অনুকম্পাতে হউক, অথবা বাবা ষণ্ডেশ্বরের তেলপড়ার গুণেই হউক—ডাক্তারি ঔষধের প্রভাবেই হউক, অথবা রোগভোগের কাল পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, হরসুন্দরবাবু দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। পঙ্কজিনীর মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

একমাস গেল, হরসুন্দরবাবু এখন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন। তাঁহার চোখের কোণের কালি দূর হইয়াছে, কণ্ঠের অস্থি ঢাকিয়া আসিতেছে, বিলক্ষণ ক্ষুধা অনুভব করেন, রাত্রিতে সুনিদ্রা হয়। বাবা

ষণ্ডেশ্বরের প্রসাদী সেই শুষ্ক বিল্বপত্রটি, নিজের ব্রহ্মসঙ্গীত বইখানির ভিতর চাপিয়া, পঙ্কজিনী বাক্সে লুকাইয়া রাখিয়াছে। এখনও মাঝে মাঝে সেই বিল্বপত্রটি বাহির করিয়া, সুযোগ মত নিদ্রিত স্বামীর মস্তকে স্পর্শ করায়।

শরৎশশী মাঝে মাঝে আসিয়া তাগাদা করে—"অনেক দিন হয়ে গেল, মানৎ রক্ষা না করাটা আর ত ভাল হচ্ছে না ভাই। শেষে কি বাবার কোপে পড়ে যাবে?"

কি অছিলা করিয়া পূজা দিতে যাওয়া যাইতে পারে, দুই সখীতে মিলিয়া প্রায়ই তাহার পরামর্শ হয়—কিন্তু কোনও মীমাংসা হয় না। শরৎশশীর পিত্রালয় সৃষ্টিপুর গ্রাম, পায়রাডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে নামিয়া দুই ক্রোশ পথ। এই পথেই, সৃষ্টিপুরে পৌঁছিবার অর্দ্ধক্রোশ বাকী থাকিতেই বাবা ষণ্ডেশ্বরের মন্দিরটি পাওয়া যায়। বিকালের গাড়ীতে রওনা হইলে, রাত্রিটা সৃষ্টিপুরে থাকিয়া, পরদিন পূজা দিয়া অপরাহ্ণ কালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসা যায়। কিন্তু এই চব্বিশ ঘণ্টার ছুটি—কি উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে পঙ্কজিনী ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না।

একদিন পঙ্কজিনী কপাল ঠুকিয়া স্বামীকে বলিল, "ওগো দেখ—শরৎশশী একদিনের জন্য আমাকে তার বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে চায়।"

হরসুন্দরবাবু কহিলেন, "কেন?"

"এই বেড়িয়ে আসবার জন্যে—আর কেন?"

"সেখানে খাবে কি?"

"তারা যা খায় তাই খাব—ভাত ডাল তরকারী"

"তারা যে হিঁদু। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা থাকে। তারা যা রাঁধে বাড়ে, সমস্তই সেই শালগ্রামকে ভোগ দিয়ে তবে খায়। তুমি ত সে প্রসাদ খেতে পারবে না। তবে খাবে কি?"

পঙ্কজিনী মনে মনে হাসিল। বলিল, "ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়ায় তোমার আপত্তি যদি, আমি না হয় নিজেই চারটি রেঁধে খাব।"

হরসুন্দরবাবু কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "দেখ পঙ্কজ, আসল কথা তোমায় খুলে বলি। যারা মিথ্যা

পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা কর, এটা আমি পছন্দ করিনে। সেখানে তোমার যাওয়া হবে না।"

ফাল্গুন মাস পড়িল। আজিও পূজা দিতে যাইবার কোনও কিনারা হইল না। একদিন শরৎশশী আসিলে পঙ্কজিনী বলিল, "আমার ত ভাই এই মুস্কিল, তুমি যদি গিয়ে আমার হয়ে পূজোটি দিয়ে এস তা হলে হয় না ?"

শরৎ বলিল, "আমার মানৎ সে ত নয়। তুমি মানৎ করেছিলে, নিজে গিয়ে বাবার পূজো দেবে, সরা পোড়াবে—এ কথা বলেল চলবে কেন ?—ছি ছি— ও কথা মনেও কোরো না। শেষকালে কি বাবার কোপে পড়ে যাবে ?"

দিন দুই পরে একদিন হরসুন্দরবাবু কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তাঁহার শরীর আবার খারাপ হইয়াছে। খুক্ খুক্ করিয়া একটু একটু কাসিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া পঙ্কজিনীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি তাহার ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না। সে কেবল মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল—'আমার বড় অপরাধ হয়ে গেছে, আমায় মাফ কর বাবা। এক মাসের মধ্যে যেমন করে হোক গিয়ে তোমার পূজোটি দিয়ে আসব, তাতে আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক। আমার উপর কোপ কোরো না বাবা—আমার স্বামীকে ভাল রাখ।'

এবার হরসুন্দরবাবু অতি অল্পেই সারিয়া উঠিলেন এবং দুই সপ্তাহ পরে, পঙ্কজিনীর প্রার্থিত সুযোগটিও উপস্থিত হইল। হরসুন্দরবাবু একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া বলিলেন, "গুডফ্রাইডে উপলক্ষে চারদিন ছুটি হচ্ছে— এ চারদিন আমি বাড়ীতে থাকব না।"

পঙ্কজিনী বলিল, "কেন ? কোথায় যাবে ?"

"আমরা ক'জন বন্ধু মিলে কয়েকটি গ্রামে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন করে আসব।"

"কোন্ কোন্ গ্রামে যাবে ?"

"হালিসহরে আমাদের আড্ডা হবে। যারা যাঁরা যাবেন তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের ঐ অঞ্চলেই বাড়ী। কয়েকটি গ্রামে এক একদিন সঙ্কীর্ত্তন করব।"

পঙ্কজিনী আপত্তি করিতে লাগিল। বলিল—"একে এই কাহিল শরীর—কষ্টে অনিয়মে আবার অসুখ করতে কতক্ষণ?"

হরসুন্দর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "যদি ঈশ্বরের কার্য্যে শরীরপাত হয় তবে তার চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে? কোন ভয় কোরো না পঙ্কজ, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন।"

ছুটির প্রথম দিন প্রাতে হরসুন্দরবাবু যাত্রা করিলেন। গতরাত্রে তিনি যখন নিদ্রায় অচেতন, সেই সময়ে পঙ্কজিনী বাবা ষণ্ডেশ্বরের সেই প্রসাদী বিল্বপত্রটি বাহির করিয়া তাঁহার মাথায় বুকে বুলাইয়া দিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শুক্র শনি রবি সোম চারিদিন ছুটি, সোমবার বিকালে হরসুন্দরবাবু গৃহে ফিরিবেন। শরৎশশী পিত্রালয়ে চিঠি লিখিয়া বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। শনিবার অপরাহ্ণের গাড়ীতে ইহারা যাত্রা করিল—সঙ্গে গেল শরৎশশীর দেবর উমাপদ।

শরৎশশীর মাতা প্রভৃতি মহা সমাদরে পঙ্কজিনীর অভ্যর্থনা করিলেন। বাড়ীর গোরুর গাড়ী আছে, সেই গাড়ীতে প্রাতে উঠিয়া ষণ্ডেশ্বরতলায় যাইয়া পূজা দিয়া, সেখান হইতে পায়রাডাঙ্গা ষ্টেশনে যাত্রা করিবার পরামর্শ হইল। শরৎশশীর মাতা ইহাতে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন. 'বাছারা আসিল, একদিন ভাল করিয়া খাওয়াইতে পাইলাম না—ইত্যাদি।' কিন্তু শরৎশশী মাকে বুঝাইল, পঙ্কজের সংসারে সে একা, বাড়ীতে আর কেহ নাই, আজ অপরাহ্ণে উহার বাড়ী না ফিরিলেই নয়। পূজা দিয়া, আবার আহারাদির জন্য ফিরিয়া আসিলে বারোটার গাড়ী আর ধরা যাইবে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে অন্য গাড়ী নাই ইত্যাদি।

প্রাতে উঠিয়া স্নান করিয়া, শরৎশশীর একখানি তসরের শাড়ী পরিয়া পঙ্কজিনী প্রস্তুত হইল। ট্রেণে জলযোগ করিবার জন্য লুচি প্রভৃতি বাঁধিয়া শরৎশশীর মাতা কন্যার হস্তে দিলেন। উমাপদ আহারাদি করিয়া পদব্রজেই যথাসময়ে ষ্টেশনে যাইবে।

পূজা সমাপনান্তে শরৎশশীদের গাড়ী যখন পায়রাডাঙ্গা পৌঁছিল, তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। তখনও উমাপদ আসিয়া পৌঁছে নাই।

বারোটা বাজিল, গাড়ী রাণাঘাট ছাড়িল, টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। পথ যতদূর দেখা যায়—তাহার মধ্যে উমাপদ নাই।

পঙ্কজিনী বলিল—"এখন কি উপায় হয়? এ গাড়ী না পেলে সেই সন্ধ্যের আগে ত আর গাড়ী নেই!"

শরৎ বলিল—"তার জন্যে আর ভয় কি? ঠাকুরপো না এসে পৌঁছয়—আমাদের রিটার্ণ টিকিট ত রয়েইছে, গাড়োয়ান গিয়ে আমাদের মেয়ে-কামরায় চড়িয়ে দেবে এখন, আমরা শেয়ালদয়ে নামব। সেখানে বাড়ী থেকে গাড়ী ত আসবেই।"

অবশেষে তাহাই হইল। উমাপদ আসিয়া পৌঁছিল না। গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান অতুল গিয়া ইঁহাদিগকে মেয়ে-কামরায় উঠাইয়া দিল।

সঙ্গে বোতলে ভরা দুধ ছিল, খোকাকে তাহা পান করান হইল। লুচি প্রভৃতি বাহির করিয়া উভয়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিল। ঘটিতে জল ছিল, মুখ হাত ধুইয়া ডিবা হইতে পান বাহির করিয়া খাইতে খাইতে গাড়ীর অপরাপর রমণীদের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিল।

ট্রেণ যখন কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছে, তখন দেখা গেল, প্ল্যাটফর্ম্মের এক স্থানে প্রায় পনেরো জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহাদের সঙ্গে খোল করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র রহিয়াছে, কয়েকজনের হস্তে ধ্বজা ও পতাকা। পঙ্কজিনী ও শরৎশশী উভয়েই জানালার কাছে বসিয়াছিল—মার কোলে থাকিয়া খোকাও অপার ঔৎসুক্যের সহিত বাহিরের দৃশ্য দেখিতেছিল।

গাড়ী আরও নিকটে আসিলে পঙ্কজিনী ও শরৎ উভয়েই চিনিল হরসুন্দরবাবু সেই দলে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিবামাত্র তাহারা যুগপৎ মুখ ফিরাইয়া লইল—কিন্তু খোকা সেই দিকে তাহার ক্ষুদ্রহস্তটি বাড়াইয়া দিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা—আমাল্ বাবা।"

পঙ্কজিনী গায়ের রেশমী চাদরখানা তাড়াতাড়ি খোকার মাথায় ঢাকা দিয়া বলিল—"চুপ চুপ।" খোকা বিপুল বিক্রমে হাত পাত ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বলিতে লাগিল—"আমি বাবাল্ কাছে যাব।"

শরৎ বলিল—"চুপ, দুষ্টু ছেলে—কে তোর বাবা? না, তোর বাবা নয়।"

গাড়ী দাঁড়াইল।

ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া খোকা বলিল—"হাঁ আমাল্ বাবা। আমি বাবাল্ কাছে যাব।"

শরৎশশী জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, ধ্বজাপতাকাধারী দলটি এই দিকেই আসিতেছে। পঙ্কজিনীও তাহা দেখিল, দেখিয়া নিজের ও খোকার মস্তক উত্তমরূপে আবৃত করিয়া বেঞ্চের কোণটিতে জড়সড় হইয়া বসিল। শরৎশশী উঠিয়া ধাঁ ধাঁ করিয়া জানালার কবাটগুলা তুলিয়া দিল।

ধ্বজাপতাকাধারী বাবুগুলি ছুটাছুটি করিয়া এই গাড়ীখানির কাছে আসিয়া বলিলেন—"মেয়েদের গাড়ী, আগে চল।"—বলিয়া তাঁহারা ছুটিতে লাগিলেন। এক মিনিট পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কামরার অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ এই ব্যাপারটি অবাক হইয়া দেখিতেছিল। কেহ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

পঙ্কজিনী মুখ খুলিল—খোকাও মুক্তি পাইল। তাহার মুখের ভাব এমন হইয়াছে যেন সে এইমাত্র একটা চুরি কি ডাকাতি করিয়া আসিল।

নিকটে একজন বৃদ্ধা বসিয়া হরিনামের মালা ফিরাইতেছিল, সে ইহাদের পানে সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া বলিল—"তোমরা কারা বাছা?"

পঙ্কজিনী চক্ষু নত করিয়া রহিল।

শরৎ বলিল—"কেন গা?"

"তাই জিজ্ঞাসা করছি। মানুষ কি মানুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না?"

শরৎ গম্ভীরভাবে বলিল—"আমাদের পরিচয় দিতে একটু বাধা আছে।"

এই উত্তর শুনিয়া গাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্পরের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতে লাগিল এবং ইহাদের পানে চাহিয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

বৃদ্ধা কিন্তু নাছোড়বান্দা। জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, পরিচয়ই না হয় না দিলে। তোমরা কোথা যাচ্ছ বল দেখি?"

এই জেরায় বিরক্ত হইয়া শরৎশশী বলিল—"আমরা কাশী যাচ্ছি।"

"কাশী যাচ্ছ? সঙ্গে কে আছে?"

"নারায়ণ।"

বৃদ্ধা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"তা হলে সঙ্গে কেউই নেই বল!"

শরৎশশী বলিল—"যা বোঝ।"

বৃদ্ধা দুই চারিবার মালা ফিরাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ যে ওখানে যে বাবুটিকে দেখে ছেলেটি বাবা বাবা করে উঠল, সে বাবুটি কে?"

পঙ্কজিনী এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল—"অত খোঁজে তোমার কায কি বাছা?"

"তিনি এই খোকার বাবা কি?"

শরৎশশী বলিল—"ক্ষেপেছ?—খোকার বাবার কি ঐ রকম চেহারা? খোকা কাকে দেখে কাকে মনে করেছে।"

বৃদ্ধা বলিল—"ছেলে বলছে বাবা—তোমরা বলছ বাবা নয়! এ সব কি কাণ্ড? তোমরা বাড়ী ঘর ছেড়ে পালাচ্ছ বুঝি?"

শরৎশশী বলিল—"হাঁ, পালাচ্ছি। তুমি পালাবে আমাদের সঙ্গে? কাশী বেশ জায়গা।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল—"কি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?—আমায় তোরা এমন কথা বলিস? কালামুখী শতেকখোয়ারীরে—এ গাড়ীতে সব ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা যাচ্ছে—এ গাড়ীতে তোরা পোড়াকপালীরে কেন উঠেছিস? রোস, এবার গাড়ী দাঁড়াক, টিকিট ম্যাষ্টারকে ডাকিয়ে তোদের নাবিয়ে দিচ্ছি।"

পঙ্কজিনী এই নূতন গোলমালের সম্ভাবনা দেখিয়া আরও ভীত হইয়া পড়িল। বলিল—"বাছা রাগ করছ কেন? ঠাট্টা ক'রে বলেছে বৈ ত নয়!"

বৃদ্ধা বসিয়া গজ্ গজ্ করিয়া আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল।

পঙ্কজিনী শরতের কাণে কাণে বলিল—"এখন কি উপায় হয় ভাই? উনি ত ঐ পাশের গাড়ীতেই রয়েছেন।"

শরৎ বলিল—"উনি কলকাতা যাচ্ছেন কি কোথায় যাচ্ছেন তার

ঠিক কি ? হয়ত পথে কোনও ষ্টেশনে নেমে যেতে পারেন। কোথাও হয়ত সঙ্কীর্ত্তন করতে যাচ্ছেন।"

পঙ্কজিনী বলিল—"তা হলেই বাঁচি। এখন ভরসা নারায়ণ।"

এই চুপি চুপি কথার কিয়দংশ বৃদ্ধার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং সে স্থির করিল, ইহারা বাড়ী হইতে পলাইয়া যাইতেছে—পাশের গাড়ীতে এই খোকার বাপ আছে। পাছে ধরা পড়িয়া যায় সেই চিন্তায় ইহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে।

এই সময় ট্রেণ আসিয়া নৈহাটিতে দাঁড়াইল। ধ্বজাপতাকাধারী বাবুরা নামিয়া, মেয়ে-গাড়ীর নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন।

ইঁহাদিগকে দেখিয়া বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"ওগো বাবুরা—শোন শোন।"

বাবুরা কিন্তু শুনিতে পাইলেন না—চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা তখন তাড়াতাড়ি দ্বারের কাছে গিয়া একজন কুলীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"গাড়ী এখানে কতক্ষণ থামে রে ?"

কুলী বলিল—"দশ মিনিট।"

বৃদ্ধা দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িল। ভীড়ের মধ্যে ধ্বজাপতাকা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল।

পঙ্কজিনী বলিল—"সর্ব্বনাশ করলে ! ডাকতে গেছে বোধ হয়।"

শরৎ ঝুঁকিয়া বাহিরে তাকাইয়া বলিল—"নিশ্চয়।"

পঙ্কজিনী কাতরভাবে বলিল—"তা হলে কি হবে ? এখনি ত এসে পড়বেন !"

শরৎ উঠিয়া বলিল—"এস শীগ্‌গির এস।"—বলিয়া দ্বার খুলিয়া নিজে নামিল, পঙ্কজিনীকেও হাত ধরিয়া নামাইল। বৃদ্ধা যেদিকে গিয়াছিল তাহার বিপরীত দিকে চারি পাঁচখানা গাড়ী ছাড়াইয়া একখানি খালি সেকেণ্ড ক্লাস দেখিতে পাইল। বলিল—"এস, এর মধ্যে উঠে লুকিয়ে থাকি। তা হলে আর আমাদের খুঁজে পাবে না—গাড়ী ছেড়ে দেবে।"

এদিকে বৃদ্ধা ভীড়ের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া সেই বাবুর দলকে বাহির করিয়া নিকটস্থ একজনের গায়ে হাত দিয়া বলিল—"ওগো বাবা—তোমাদের একজনের—কার তা জানিনে—বউটি কাশী পালাচ্ছে !"

এই কথা শুনিয়া সকলেই বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিলেন। একজন সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি বলছ বাছা? বুঝতে পারছিনে।"

বৃদ্ধা বলিল—"ওগো—নাম ত জানিনে, তোমাদেরই মধ্যে একজন-কার বউ, রঙটি শ্যামবর্ণ, এই গাড়ীতে পালিয়ে যাচ্ছে। কোলে একটি ছোট ছেলে আছে—সঙ্গে আর একটি স্ত্রীলোক আছে।"

এখন, এই দলের দুই তিন জনের গৃহে একটি একটি ছোট ছেলেসুদ্ধ শ্যামবর্ণা বধূ ছিল। তাহাদের বাড়ীও এই অঞ্চলে। অপর সকলে ইহাদেরই মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

হরসুন্দরবাবু কাছে আসিয়া বুড়ীকে বলিলেন—"তুমি কি পাগল না কি?"

বৃদ্ধা চটিয়া বলিল—"পাগল বৈকি! তোমাদের কথাতেই পাগল? গাড়ী যখন কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে ঢুকছিল, তোমরা পেলাটফরমে দাঁড়িয়েছিলে, আমাদের মেয়ে-গাড়ীতে একটি তিন চার বছরের ছেলে, তোমাদের একজন কাকে দেখে 'বাবা বাবা' বলে চেঁচিয়ে উঠল। তার মা তাকে থামাতে পারে না। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছি সেই ছেলের মা-টি আর সেই অন্য স্ত্রীলোকটি কাশী পালিয়ে যাচ্ছে। যদি ধরতে চাও ত আমার সঙ্গে এস। না ধরতে চাও, আমার বয়েই গেল। আমি চল্লাম—এখনি গাড়ী ছেড়ে দেবে।"—বলিয়া বৃদ্ধা থর্ থর্ করিয়া চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাবুরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেরই মনে হইল, আমার স্ত্রী কখনই নয়, তাহা একেবারে অসম্ভব—দলের অন্য কাহারও স্ত্রী হইতে পারে, সুতরাং পরোপকারার্থ সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। সেই ধ্বজাপতাকা লইয়া সকলেই বৃদ্ধার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

মেয়ে-কামরার নিকট পৌঁছিয়া বৃদ্ধা বলিল—"এই গাড়ী।"

দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহারা নাই। বাবুরা পৌঁছিয়া বলিলেন—"কৈ? কৈ?"

বুড়ী বলিল—"এই গাড়ীতেই ত ছিল। নেমে কোথায় পালিয়েছে।"

একজন বাবু বলিলেন—"দেখলেন মশায়, আমি সেই কালেই ত বলেছি, মাগী উন্মাদ পাগল, মিছামিছি আমাদের ছুটোছুটি করালে।"

একজন স্ত্রীলোক বলিল—"তারা নেমে ঐ দিকে একখানা গাড়ীতে গিয়ে উঠেছে।"

বাবুটি বলিলেন—"তুমি দেখেছ?"

"স্বচক্ষে দেখেছি। ঐ—ঐ খানটায়।"—বলিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীখানি দেখাইয়া দিল।

বাবুরা সকলে তখন সেই দিকে ছুটিলেন। গাড়ী ছাড়িবারও ঘণ্টা দিল।

অগ্রগামী বাবুটি ছুটিয়া সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর নিকট গেলেন। জানালা দিয়া মাথা গলাইয়া, হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিলেন—"এইখানে—এইখানে—আসুন—আসুন।"

গার্ড সাহেব বাঁশী বাজাইয়া ড্রাইভারকে সবুজ ঝাণ্ডী দেখাইল।

অপর বাবুগণ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঠেলাঠেলি করিয়া সেই পনেরো জন কামরার মধ্যে উঠিয়া পড়িলেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ভিতরে দাঁড়াইয়া বাবুরা দেখিলেন, বেঞ্চির একেবারে প্রান্তভাগে দুইটি স্ত্রীলোক সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া বসিয়া আছে। একজনের কোলে ছেলে আছে—জুতা মোজাসুদ্ধ ছেলেটির পা দুটি বাহির হইয়া রহিয়াছে।

পরস্পরকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"কার স্ত্রী?"—সকলে বিস্ময়ে স্ত্রীলোক দুইটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

বদ্ধ-জানালা গাড়ী অত লোকের নিশ্বাসে অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। একটি বাবু কয়েকটি জানালার সার্সি ঝিলমিল নামাইয়া দিলেন।

অপর একটি বাবু উচ্চ স্বরে বলিলেন—"হ্যাঁ গা, তোমরা কার স্ত্রী?"

বলা বাহুল্য, কোনই উত্তর পাওয়া গেল না।

একটু অপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় একজন বলিলেন—"তোমরা কোথা থেকে আসছ, কোথা যাচ্ছ, আমাদের স্পষ্ট করে বল। লজ্জার এ সময় নয়।"

তথাপি স্ত্রীলোক দুইটি জড়পুত্তলিকার মত বসিয়া রহিল।

তৃতীয় একজন বাবু বলিলেন—"তোমাদের গতিক দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না। আমরা শুনেছি তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ। এ ভয়ানক অন্যায় কথা। তোমাদের পরিচয় দাও, নইলে পরের ষ্টেশনে পুলিশ ডেকে তোমাদের ধরিয়ে দেব।"

শরৎশশী এবার উস্ খুস্ করিয়া নড়িয়া উঠিল। মুখ হইতে চাদর সরাইয়া সরোষে সে বলিয়া উঠিল—"কি!—আপনারা আমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবেন? পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামুক, দাড়ান, কে কাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয় তা দেখছি। আপনারা স্ত্রীলোকের কামরায় উঠেছেন কোন্ সাহসে? স্ত্রীলোকের কামরায় পুরুষ উঠলে কি হয় তা কি জানেন না?"

এই কথা শুনিয়া বাবুরা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। একজন বলিলেন—"এটা কি মেয়েদের কামরা না কি?"

যে বাবুটি দ্বারের নিকটে ছিলেন, তিনি মাথা বাহির করিয়া লেবেল পাঠ করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—লেডিজ্ লেখা রয়েছে বটে।"

শরৎশশী প্রথমটা আন্দাজি বলিয়াছিল, এবার সুযোগ পাইল। পূর্ব্ববৎ ক্রোধের ভান করিয়া বলিতে লাগিল—"আপনারা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত অসচ্চরিত্র লোক। দুটি স্ত্রীলোক অসহায় অবস্থায় গাড়ীতে বসে আছে, আপনারা কি অভিপ্রায়ে হুড়মুড়িয়ে সে গাড়ীতে উঠে পড়লেন? আপনারা নিশ্চয়ই নেশা করেছেন।"—বলিয়া শরৎশশী সিংহিনীর ন্যায় বাবুগুলির পানে চাহিয়া রহিল।

একজন বাবু বলিলেন—"অমন কথাটি বলবেন না। আমরা কেউই মদ খাই না। আমরা বলি—মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যং।"

শরৎ অধিকতর তীব্রস্বরে বলিল—"মদ না খেয়ে থাকেন, তাড়ি খেয়েছেন। স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠে গুণ্ডামী করবার চেষ্টা করলে কি ফল হয়, সে শিক্ষা আজ আপনাদের ভাল রকমই হবে। আপনাদের কারু কাছে বোধ হয় সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট নেই?"

সেকেণ্ড ক্লাসের ত নহেই—কোনও ক্লাসের টিকিট কাহারও কাছে ছিল না। ইঁহারা নৈহাটিতে সঙ্কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া, কাঁচড়াপাড়া হইতে নৈহাটির ইণ্টারমিডিয়েট টিকিট কিনিয়াই সকলে আসিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া অনেকেরই মুখে ভীতিলক্ষণ প্রকাশ পাইল। একজন সাহস করিয়া বলিলেন—"আপনাদের কাছে কোন্ ক্লাসের টিকিট আছে দেখি?"

শরৎ বলিল—"টিকিট দেখবেন? দাড়ান—গাড়ী থামুক—পুলিশ ডেকে আপনাদের ভাল করেই টিকিট দেখাব। আমার পাশে যিনি বসে রয়েছেন, ইনি কার স্ত্রী আপনারা জানেন? ইনি যাঁর স্ত্রী, তিনি মনে করলে, আপনাদের প্রত্যেককে একটি বছর করে জেলে পাঠাতে পারেন। ঘুঘু দেখতে এসেছিলেন, এবার ফাঁদ দেখুন!"

বাবুরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—'উনি বোধ হয় কোনও জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী।' একজন বিনীত স্বরে বলিলেন—"আমরা ত কোনও অসদভিপ্রায়ে আসিনি।"

"কি অভিপ্রায়ে এসেছিলেন, আদালতে প্রমাণ করবেন।"

হরসুন্দরবাবু এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ব্যাপার এ পর্য্যন্ত গড়াইলে, আর নীরব থাকা তিনি নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। বুঝিলেন, সেই পাগলা বুড়ীর কথা শুনিয়া বাস্তবিকই অত্যন্ত অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইহাদের খোসামোদ ভিন্ন আর উপায় নাই। সঙ্কীর্ত্তন করিতে আসিয়া পুলিশ হাজতে বন্ধ হওয়া মোটেই প্রীতিকর নয়। এই ভাবিয়া অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"আমাদের একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে—দয়া করে আমাদের মাফ করুন। পরের ষ্টেশনেই আমরা সকলে নেমে যাব। আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের ক্ষমা করুন—ঈশ্বর জানেন—আমাদের কোনও মন্দ অভিপ্রায় ছিল না।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই—চাদরঢাকা মাতৃক্রোড়স্থ শিশু চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা!"

হরসুন্দরবাবু বলিয়া উঠিলেন—"কে? খোকা?"

চাদরের ভিতর হইতে "বু—বু—বু" একটা শব্দ হইল—কে যেন

খোকার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। খোকা সজোরে জুতাসুদ্ধ পাদুটি ছুঁড়িতে লাগিল। মা ও ছেলেতে রীতিমত দ্বন্দযুদ্ধ আরম্ভ হইল। মার গায়ের আবরণ খুলিয়া ছিঁড়িয়া ছেলে লাফাইয়া পড়িল। হরসুন্দরবাবু দেখিলেন—তাঁহার স্ত্রী—পরিধানে তসরের শাড়ী, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলায় সিন্দূর ও চন্দনলিপ্ত ফুলের মালা—আঁচল হইতে কতক-গুলা চন্দনমাখা ফুল ও বিল্বপত্র গাড়ীর মেঝেতে ছিটাইয়া পড়িল।

হরসুন্দরবাবু স্তম্ভিত। খোকা আসিয়া তাঁহার জানু ধরিয়া দাঁড়াইল। অপর ভদ্রলোকগণ অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

হরসুন্দরবাবু বলিলেন—"খোকা, কোথা গিয়েছিলি বাবা ?"

খোকা উৎসাহের সহিত শিরশ্চালনা করিয়া বলিল—"থাকুলেল্ প্দো দিতে। আমি গিয়েথিলাম, মা গিয়েথিল, মাচি গিয়েথিল। থাকুলেল্ মাথায় বলো বলো জুতো ছাপ—ফোঁস। বেশ ভাল থাকুল।"

পঙ্কজিনী মাথায় গায়ে চাদর পুনরাবৃত করিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। শরৎশশীও তদ্রূপ। যতক্ষণ সে মনে করিয়াছিল কেহ আমাকে চিনিবে না, ততক্ষণ সে বাচালতা প্রকাশ করিয়াছিল। এখন ধরা পড়িয়া লজ্জায় সে মৃতবৎ। দণ্ডায়মান অন্যান্য বাবুগণ এই ব্যাপার দেখিয়া, কেহ ব্যঙ্গ, কেহ সহানুভূতির দৃষ্টিতে হরসুন্দরবাবুর পানে চাহিয়া রহিলেন।

ট্রেণের গতিবেগ হ্রাস হইতেছিল—ক্রমে বারাকপুরে আসিয়া দাঁড়াইল।—অন্যান্য বাবুগণ টুপ্ টুপ্ করিয়া নামিয়া গেলেন। হরসুন্দর বাবু 'হা জগদীশ্বর' বলিয়া মাথায় হাত দিয়া মাঝের বেঞ্চখানির উপর বসিয়া পড়িলেন। ট্রেণ বারাকপুর ছাড়িল।

খোকা মেঝে হইতে ফুল ও বিল্বপত্রগুলি কুড়াইয়া, 'বাবা নাও—বাবা নাও' বলিতে বলিতে পিতার পাশে রাখিতে লাগিল। হরসুন্দর বাবু হঠাৎ দাঁত খিঁচাইয়া সেগুলি মুঠা মুঠা করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। পিতার ক্রোধের কারণ না বুঝিতে পারিয়া খোকা অপরাধীটির মত তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

দুই এক মিনিট বসিয়া থাকিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরসুন্দর বাবু বেঞ্চির উপর শুইয়া পড়িলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শরৎশশী সভয়ে পঙ্কজিনীর কাণে কাণে বলিল—“মূর্চ্ছা গেলেন না কি ?”

পঙ্কজিনী তখন উঠিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে আসিল। তাঁহার ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিল—“ভাল আছ ত ? শুয়ে পড়লে কেন ?”

হরসুন্দরবাবু কথা কহিলেন না। শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইল।

পঙ্কজিনী স্বামীর শিয়রে বেঞ্চির উপর বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। একটু পরে বলিল—“রাগ করেছ ?”

হরসুন্দরবাবু চক্ষু বুজিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার সঙ্গে উনি কে ?”

“আমাদের শরৎ। ওদেরই বাড়ীতে গিয়েছিলাম।”

হরসুন্দরবাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন—“কেন গিয়েছিলে ?”

পঙ্কজিনী বলি— “তুমি বাড়ী নেই। একলাটি প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। ও বাপের বাড়ী যাচ্ছিল, আমায় বল্লে তুমিও চল, ছুদিন বেড়িয়ে আসবে। তাই গিয়েছিলাম।”

হরসুন্দর চক্ষু খুলিলেন। প্রায় অর্দ্ধমিনিট কাল বিষণ্ণভাবে স্ত্রীর পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—“তোমার কপালে ও ফোঁটা কিসের ? চন্দন মাখান সে সব ফুল বেলপাতাই বা কিসের ?”

পঙ্কজিনী বলিল—“এসব—এসব—খোকা খেলা করবে বলে এনেছিলাম।”

স্ত্রীর এই মিথ্যাভাষণে হরসুন্দরবাবুর মুখে চক্ষে একটা ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন— “তোমার কপালের ও ফোঁটাটা নিয়েও খোকা খেলা করবে নাকি ? আর, তুমি এ তসরের শাড়ীই বা পেলে কোথা ?”

পঙ্কজিনী বলিল—“শরৎ আমায় পরতে দিয়েছিল।”

হরসুন্দর বলিলেন—“এ সব শাড়ী ত হিন্দু মেয়েরা পূজো করবার সময় পরে। এ শাড়ী পরে কোথায় গিয়েছিলে, কি কি করেছ, সব সত্য করে আমায় বল। যে কায করেছ, সেই অপরাধই অমার্জ্জনীয়। মিথ্যা বলে আর অপরাধ বাড়িও না।”

পঙ্কজিনী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। তেল-

পড়া আনাইবার পরামর্শ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কথাই খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া হরসুন্দরবাবু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—"পঙ্কজ, তোমার মনে এই ছিল? এত দিন ধরে তোমায় যে এত শিক্ষা দীক্ষা দিলাম, সে সমস্তই কি ভস্মে ঘি ঢালা হল? ধর্ম্মবন্ধুদের সাক্ষাতে তুমি আজ আমার মুখে চুণকালি মাখালে! সমাজে এ মুখ যে আমার আর দেখাবার উপায় রইল না পঙ্কজ!"

পঙ্কজিনী বলিল—"তোমার পায়ে ধরে বলছি, আমায় মাফ কর। নিতান্ত প্রাণের দায়েই আমি এ কায করেছিলাম। সে তেলপড়াটুকু না পেলে আর কি তোমায় ফিরে পেতাম?"

হরসুন্দরবাবু বলিলেন—"সে পৌত্তলিক তেলপড়া বুকে মালিশ করে আরাম হওয়ার চেয়ে—আমার মৃত্যুই ভাল ছিল।"

ট্রেণ শিয়ালদহ ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

নিষিদ্ধ ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাগবাজারের দুর্গাচরণবাবু তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া সুসজ্জিতা সালঙ্কারা কন্যাটির হস্তধারণ করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এইটি আমার মেঝ মেয়ে, রায় বাহাদুর।"—কন্যাকে বলিলেন, "মা, এঁকে প্রণাম কর।"

ভবানীপুর-নিবাসী রায় প্রফুল্লকুমার মিত্র বাহাদুর পারিষদগণ পরিবৃত হইয়া দরিদ্র দুর্গাচরণের তক্তপোষে বসিয়া বাঁধা হুঁকায় ধূমপান করিতেছিলেন। মেয়েটি সলজ্জভাবে তাহার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া, নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

রায় বাহাদুরের বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে। দিব্য গৌরবর্ণ পুরুষ, মোটাসোটা, হাস্যোজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু, গোঁফ ও দাড়ি দুই-ই কামানো। খুব চওড়া হাঁসিয়াযুক্ত বহুমূল্য শালের যোড়া গায়ে দিয়া বসিয়া ছিলেন। প্রসন্নদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত কন্যাটির পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বাঃ। বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে, বেঁচে থাক মা, সুখে থাক। দিব্যি মেয়েটি, নয় হে সুরেশ?"

সুরেশ-নামা পারিষদ বলিল, "আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "মা, তোমার নামটি কি বল ত?"

মেয়েটির ওষ্ঠযুগল ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু কোন শব্দ উচ্চারিত হইল না। দুর্গাচরণবাবু উৎসাহ দিয়া তাহাকে বলিলেন, "বল মা, বল।"

মেয়েটি তখন অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "শ্রীমতী নন্দরাণী দাসী।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "নন্দরাণী? বেশ। নামটিও বেশ। কেমন হে যতীন দাদা?"

যতীন্দ্র-নামধারী পারিষদ বলিল—"খাসা নাম।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "নন্দরাণী নাম—বাড়ীতে সবাই রাণী বলে ডাকে।"

"রাণী? তা আপনার মেয়ে রাজরাণী হওয়ারই উপযুক্ত বটে। মুখখানি নিখুঁৎ। চোখ দুটিও চমৎকার। ঘোষাল মশায় কি বলেন?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এ মেয়ে আপনারই পুত্রবধূ হবার উপযুক্ত।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তা মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস, এখানে বস। দুর্গাচরণবাবু, আপনিই বা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

মেয়েটি ইতস্ততঃ করিতেছিল। তাহার পিতা বলিলেন, "বস মা, বস।"—বলিয়া নিজেও উপবেশন করিলেন। মেয়েটিও মাথা নীচু করিয়া পিতার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পড় মা?"

"আখ্যানমঞ্জরী দ্বিতীয়ভাগ, পদ্যপাঠ প্রথমভাগ আর সরল শুভঙ্করী।"

"পাণ সাজতে জান?"

"জানি।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আমার বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে অবধি বাড়ীর সব পাণ ঐ ত সাজে। যা খেলেন, ওরই সাজা পাণ।"

রায় বাহাদুর রূপার ডিবা হইতে একটা পাণ লইয়া কপ্ করিয়া মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "বেশ পাণ। রান্না-বান্না কিছু শিখেছ মা?"

রাণী বলিল, "শিখেছি।"

"তাও শিখেছ? বেশ বেশ। আলুভাজা, পটলভাজা, মাছের ঝোল—এ সব রাঁধতে পার?"

মেয়েটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পারি।"

রায় বাহাদুর তাহার স্কন্ধদেশে সস্নেহে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "এরই মধ্যে শিখেছ? লক্ষ্মী মেয়ে!"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আমি আর বাপ হয়ে কি বলব রায় বাহাদুর—যদি আমার মেয়েটিকে গ্রহণ করেন তবে দেখতেই পাবেন। গতমাসে আমার স্ত্রী, যখন আঁতুড়ে, বড় মেয়েটি শিবপুরে, অনেক

কাকুতি মিনতি করাতেও বেয়াই মশাই তাকে পাঠালেন না, রাণীই আমাদের সংসার চালিয়ে দিয়েছে। ওকে যদি নেন, সবই জানতে পারবেন।”

মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে সহাস্যে রায় বাহাদুর বলিলেন, “নেব না? নেব না? লুফে নেব। এমন মেয়ে পেলে কেউ ছাড়ে? কি হে সতীশ?”

সতীশ বলিল, “আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি!”

রায় বাহাদুর বলিলেন, “আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর মাকে ছুটি দিই।”—বলিয়া নন্দরাণীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন, “হাঁ মা, আমার মাথার পাকাচুল তুলে দিতে পারবে? দুপুরবেলা, খেয়ে যখন আমি শোব, বিছানায় তোমার এই বুড়ো নতুন বাবাটির কাছে বসে বসে, একটি একটি করে পাকাচুল তুলে দিতে পারবে কি?—এটি বোধ হয় শেখনি, কি বল মা?—তোমার বাবার মাথায় ত পাকাচুল নেই!”—বলিয়া তিনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

নন্দরাণীর মুখেও ঈষৎ হাস্যসঞ্চার হইল। মুখটি তুলিয়া সে রায় বাহাদুরের মস্তকখানির দিকে চাহিল। দেখিল, সেখানে ‘কলৌ সুজনা ইব’ চুলের সংখ্যা খুবই কম এবং দূর দূরান্তে অবস্থিত।

তাহার মৌনকেই সম্মতিজ্ঞান করিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন, “আচ্ছা মা, সে পরীক্ষাও হবে। যাও, এখন বাড়ীর ভিতরে যাও।”

বাহিরে ঝি দাঁড়াইয়া ছিল। নন্দরাণী তক্তপোষ হইতে নামিবামাত্র, সে আসিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈঠক হইতে হুঁকাটি তুলিয়া লইয়া প্রায় এক মিনিট কাল রায় বাহাদুর নীরবে ধূমপান করিলেন। পরে হুঁকা দুর্গাচরণবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, “তার পর ভায়া, কবে বিয়ে দেওয়া তোমার মত বল? ঐ যা, একবারে আপনি থেকে তুমি বলে ফেল্লাম!”

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "তুমিই বলুন। 'আপনি' বল্লেই বরং আমাকে লজ্জা দেওয়া হয়। আমি আপনার চেয়ে সব বিষয়েই ছোট। বয়সে—ধনে—মানে—"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"হ্যাঁ হে, হ্যাঁ,—তুমি বয়সে আমার চেয়ে ছোট তা ত স্বীকারই করছি। তা বলে, চুল পেকেছে বলেই আমি যে খুব বুড়ো হয়ে গেছি তা ভেব না—হা হা হা।"—বলিয়া তিনি দুর্গাচরণবাবুর পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া দিলেন। পারিষদগণও খুব হাসিতে লাগিল।

দুর্গাচরণবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যবে অনুমতি করেন তবেই বিবাহ হতে পারে। এই ফাল্গুন মাসেই হোক। তবে আমি অতি সামান্য লোক—গরীব—"

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "গরীব ত হয়েছে কি? গরীব ত হয়েছে কি? গরীবই বা কিসের? তুমি কি কারু কাছে ভিক্ষা চাইতে গিয়েছ? আর হলেই বা গরীব? গরীবের মেয়ের কি বিয়ে হবে না? সে আইবুড়ো থাকবে? হিন্দুশাস্ত্রের এমন বিধান নয়। তুমি বোধ হয় আজকালের বরপণ প্রথা ভেবে এ কথা বলছ? সে প্রথার আমি বিরোধী—ভয়ঙ্কর বিরোধী।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই কথা শুনেই ত—"

"শুনেই ত কি? পড়নি? আমার 'সামাজিক-সমস্যা-সমাধান' কেতাব পড়নি? তাতে বরপণ বলে একটা চ্যাপ্টারই যে রয়েছে। বরপণ প্রথাকেই আমি যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিয়েছি—একেবারে যাচ্ছেতাই করে—পড়নি?"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "পড়েছি বৈকি। আপনার বই কে না পড়েছে? আপনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার।"

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "কোথা বিখ্যাত?—হাঁ—বঙ্কিম একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার বটে। সে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু কি না। প্রেসিডেন্সি কলেজে একসঙ্গে আইন পড়তাম। আজকের কথা? বঙ্কিমের খুব নাম হয়েছে বটে। তার একখানি নতুন বই বেরিয়েছে, রাজসিংহ। পড়েছ? হু হু করে বিক্রী হচ্ছে। অথচ

আমার বই পোকায় কাটছে, কেউ কিনছে না। তাই বঙ্কিমকে বলছিলাম সে দিন।"

একজন ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা হল ?"

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "বঙ্কিমকে বললাম, ওহে তোমার যে রকম নাম হয়েছে, তুমি এখন ঐ সব লভ্ আর লড়াই ছেড়ে, এমন খানকতক উপন্যাস লেখ যাতে দেশের উপকার হয়। আমার কথা ত কেউ শোনে না, তোমার কথা শুনবে। এই যে বরপণ প্রথাটি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, ক্রমে যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে! বরপণ প্রথার দোষ দেখিয়ে চুটিয়ে একখানা নভেল লেখ দেখি ? আর একখানা লেখ, যা পড়ে বাঙ্গালীর বিলাসিতা—বিশেষ চা খাওয়াটা—একটু কমে। একখানা লেখ, যৌথ কারবার সম্বন্ধে। কেন বাঙ্গালীর যৌথ কারবার ফেল হয়ে যায়, কি কি উপায় অবলম্বন করলে তা সফল হতে পারে, তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি বেশ করে বুঝিয়ে দাও। প্লটও তোমায় বলে দিচ্ছি। তাতে দেখাও যে জনকতক বাঙ্গালী যুবক কলেজ থেকে বেরিয়ে, এক সঙ্গে মিলে যৌথ কারবার আরম্ভ করলে, আর দিন দিন তাদের খুব উন্নতি হতে লাগল। ক্রমে তারা এক একটি লক্ষপতি হয়ে দাঁড়াল, গভর্ণমেণ্ট থেকে খেতাব পেলে ইত্যাদি। তা নয়, খালি লভ্ আর লড়াই—লভ্ আর লড়াই! ও সব লিখে দেশের কি উপকার হবে বল দেখি ?"

ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্কিমবাবু কি বললেন ?"

হুঁকাটি হাতে লইয়া রায় বাহাদুর বলিলেন, "হাসতে লাগল। বললে—'আচ্ছা তা হলে যৌথ কারবারের নভেলটাই আরম্ভ করি। কাঁচা মালের কি দর আর কোথায় কোন্ জিনিষ পাওয়া যায়, রেলভাড়াই বা কত, সেগুলোও পরিশিষ্ট করে ছেপে দেব কি ?'—বিদ্রূপ হল!—'তোমার যা খুসী তাই কর'—বলে রাগ করে আমি চলে এলাম।"

রায় বাহাদুরের মুখখানি অত্যন্ত অপ্রসন্ন দেখাইতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিট ক্যাল তামাক খাইয়া তবে তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন।

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমার প্রতি অনুগ্রহ যদি

করেন, তা হলে ত আর কোন বাধাই নেই। যে দিন অনুমতি করেন, সেই দিনেই বিবাহ হতে পারে। সামনে ফাল্গুন মাসে—"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "রও—রও। আরও কথা আছে। আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। বিবাহ সম্বন্ধে আমার আর একটী মত আছে। সে বিষয়ে যদি তুমি স্বীকার হও, তবেই আমি ছেলের বিবাহ দিতে পারি।"

দুর্গাচরণবাবু একটু শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "কি মত, আজ্ঞা করুন।"

রায় বাহাদুর একটু নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া বসিয়া বলিলেন, "সামাজিক সমস্যা-সমাধান কেতাবে বাল্যবিবাহ বলে একটি পরিচ্ছেদ আছে। পড়েছ?"

দুর্গাচরণবাবু বিপন্নভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে—বোধ হয়—কি জানি—ঠিক মনে পড়ছে না।"

"সে প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি, বাল্যবিবাহ খুব ভাল জিনিষ। আমাদের সমাজে এই একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথা যত দিন প্রচলিত থাকবে, ততদিন বাল্যবিবাহ ভিন্ন উপায় নেই। কেবলমাত্র স্বামীটিই স্ত্রীলোকের পরিজন নয়, তার শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর দেওর ননদ ভাজ—এ সব নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হবে। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই বউকে সেই পরিবারভুক্ত হতে হবে। কেমন কিনা?"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ—ঠিক কথা।"

"আচ্ছা, প্রমাণ হল, বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এটা অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু—এর মধ্যে একটু 'কিন্তু' আছে ভায়া। সেটি আমার আবিষ্কার। কি বল দেখি? কিন্তু —কি?"

দুর্গাচরণবাবু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। কিছুই বলিতে পারিলেন না।

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "বাল্যবিবাহ হবে বটে, কিন্তু একটু বয়স না হলে স্বামী স্ত্রীর দেখা সাক্ষাৎ হবে না। আমার কেতাবে, মেয়ের বয়স ষোল বৎসর আর ছেলের বয়স চব্বিশ—নির্দ্দিষ্ট করে

দিয়েছি। এর পূর্ব্বে তাদের একত্র হতে দেওয়া উচিত নয়। ডাক্তারি-শাস্ত্র খুলে দেখ, আমার মত যথার্থ কি না বুঝতে পারবে।”—বলিয়া রায় বাহাদুর একটু গর্ব্বের হাসি হাসিয়া, মুখটি উন্নত করিয়া রহিলেন।

দুর্গাচরণবাবু অধোমুখে কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, “কথা ত ঠিকই। কিন্তু বড় মুস্কিল যে! আমার রাণীর বয়স, এখন ধরুন বারো, শ্রাবণ মাসে বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়বে। তবে কি তিন চার বছর এখন জামাই আনতে পাব না? বাড়ীর মেয়েরা তা হলে যে—”

রায় বাহাদুর বাধা দিয়া বলিলেন, “কেন জামাই আনতে পাবে না? অবশ্যই পাবে। যে দিন বলবে, তোমার জামাইকে পাঠিয়ে দেব। তাকে খাওয়াও দাওয়াও, আদর কর যত্ন কর—বাড়ীর মেয়েরা আমোদ আহ্লাদ করুক—কিন্তু ঐ নিয়মটি প্রতিপালন করতে হবে।”

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, “বড় সমস্যার কথা!”

রায় বাহাদুর উৎসাহে উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিলেন—“সমস্যাই ত! সমস্যাই ত!—এই রকম সব সমস্যার সমাধান করেছি বলেই ত আমার কেতাবের নাম ‘সামাজিক-সমস্যা-সমাধান।’ এর সুন্দর উপায় আমি বের করেছি। যদিও হঠাৎ সেটা কারু মনে আসে না, আসলে উপায়টি কিন্তু খুবই সোজা।”

“কি উপায়?”

“বউ অন্দরে থাকবে, ছেলে বাইরের ঘরে শোবে। বস্, হয়ে গেল।—কেমন, সহজ উপায় নয়?”—বলিয়া রায় বাহাদুর হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দুর্গাচরণবাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, “লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সেটা কি ভাল হয়?”

কেহ কথার প্রতিবাদ করিলে রায় বাহাদুর অত্যন্ত রাগিয়া যান। বলিলেন, “আমি ভাল বুঝেছি—তাই লিখেছি। তোমার ভাল বোধ না হয়, অন্যত্র তোমার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা দেখতে পার। আমার এক কথা। পাহাড় নড়ে ত নড়বে, প্রফুল্ল মিত্তিরের কথা নড়বে না।”—বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন।

রায় বাহাদুরের এই ভাবান্তর দেখিয়া দুর্গাচরণবাবু ভীত হইয়া

পড়িলেন। পাত্রটি হাতছাড়া হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। বৎসরে চল্লিশ হাজার টাকা জমিদারির আয়, কলিকাতায় দুই তিনখানি বাড়ী আছে, রায় বাহাদুরের ঐ একমাত্র পুত্র, বি-এ পড়িতেছে, সুশীল, সচ্চরিত্র, সুপুরুষ—এক পয়সা পণ দিতে হইবে না—এমন সুযোগটি আর কোথায় পাওয়া যাইবে? তাই সবিনয়ে, নানা মিষ্ট কথায় দুর্গাচরণবাবু তাঁহার ভাবী বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান হইলেন। "বাড়ীতে" পরামর্শ করিয়া, যেমন হয়, আগামী কল্য প্রাতে গিয়া রায় বাহাদুরকে জানাইয়া আসিবেন বলিলেন।

রায় বাহাদুর তখন, হাসিতে হাসিতে স-পারিষদ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ী, যুগল ওয়েলারের পদভরে দুর্গাচরণবাবুর ক্ষুদ্র গলি কাঁপাইয়া সদর রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাসেই শুভবিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। রায় বাহাদুর পুত্রের নাম শ্রীমান হেমন্তকুমার।

ফুলশয্যা হয় নাই? হইয়াছিল বৈকি। কিন্তু তাহার পর যে কয়টি দিন বধূ সেখানে রহিল, বরের সহিত আর তাহার সাক্ষাৎ হইল না। রায় বাহাদুর পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারস্থ অন্য সকলের প্রতি তাঁহার ভীষণ আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৃহিণী নিজের স্বামীকে চিনিতেন, সুতরাং হুকুম রদ করাইবার জন্য আর বৃথা চেষ্টা করিলেন না।

সপ্তাহ কাল থাকিয়া রাণী পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

দুর্গাচরণবাবু জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। গৃহিণী কর্ত্তৃক এ বিষয়ে বারবার অনুরুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেখ, জামাইকে সকাল বেলা নিয়ে এসে, বেলাবেলি ফিরে পাঠাতে পারি। কিন্তু তাঁর ছেলের সঙ্গে বউয়ের দেখা হয় নি, এ কথা বেয়াই যদি বিশ্বাস না করেন, আমি তখন সাফাই সাক্ষী পাব কোথা? বেয়াইয়ের মেজাজ জান ত?"

জ্যৈষ্ঠমাসে জামাইষষ্ঠী হইল। দুর্গাচরণবাবু রাণীকে শিবপুরে তাঁহার বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে রাখিয়া মাতব্বর 'এলিবাই' সাক্ষী সৃষ্টি করিয়া আসিয়া, তাহার পর হেমন্তকুমারকে গৃহে আনিয়া জামাতার্চ্চনা করিলেন।

আষাঢ় মাসে রায় বাহাদুর বধূকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিলেন। হেমন্ত এতদিন অন্তঃপুরেই শয়ন করিত, এইবার বহির্ব্বাটীতে নির্ব্বাসিত হইল। এ বৎসর তাহার এগজামিনের পড়া, কিন্তু মেঘদূত মুখস্থ করিয়া ও পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরহমূলক নানা কবিতা লিখিয়া সে বর্ষাযাপন করিতে লাগিল।

দুইবার জলযোগ ও দুইবার আহার করিবার জন্য মাত্র হেমন্তকুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত। বধূ আসিবার দিন-পনেরো পরে একদিন হঠাৎ উভয়ের চোখোচোখি হইয়া গেল।

মাঝে মাঝে এইরূপ চোখোচোখি হইতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট চারিবার ভিন্ন, আরও দুই তিনবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অছিলা হেমন্ত আবিষ্কার করিয়া লইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে একদিন জল খাইয়া ফিরিবার পথে হেমন্ত দেখিল, বধূ একস্থানে জড়সড় হইয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আশে পাশে কেহ নাই। যাইবার সময় সে বধূর শাড়ীটি স্পর্শ করিয়া গেল।

ইহার পর হইতে প্রায় প্রতিদিনই এরূপ ঘটিত। ক্রমে পত্র বিনিময়, তাম্বুল বিনিময় এবং আরও কি কি বিনিময় ঠিক জানি না—সেই ক্ষণিক মিলনেই সম্পন্ন হইতে লাগিল।

বর্ষা কাটিল, শরৎকাল আসিল। ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে, (মাসের পয়লা তারিখে কাগজ বাহির হওয়া তখনও রেওয়াজ হয় নাই) 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় 'চকোরের ব্যথা' শীর্ষক হেমন্তের এক কবিতা ছাপা হইল। নিম্নে তাহার নাম স্বাক্ষরিত ছিল। কবিতাটি কেমন করিয়া রায় বাহাদুরের চক্ষে পড়িয়া যায়। পরদিন তিনি বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন—'বধূমাতা অনেকদিন আসিয়াছেন। মার জন্য বোধ হয় তাঁহার অত্যন্ত মন-কেমন করে। অতএব আশ্বিন মাস পড়িলেই তাঁহাকে তুমি কিছুদিনের জন্য লইয়া যাইবে।'

দুর্গাচরণবাবু আসিয়া কন্যাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিবার দুই তিন দিন পরে ক্লাসে বসিয়া হেমন্ত একখানি পত্র পাইল। শিরোনামার হস্তাক্ষর অপরিচিত—বাঙ্গালায় লেখা এবং স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া বোধ হইল।

দেখিয়া হেমন্ত একটু আশ্চর্য্য হইল, কারণ কলেজের ঠিকানায় কখনও তাহার পত্রাদি আসে না। টিকিটের উপর মোহর দেখিল—শিবপুর।

পার্শ্বোপবিষ্ট জনৈক ছাত্র বলিল, "গিন্নীর চিঠি নাকি?"

"না"—বলিয়া পত্রখানি হেমন্ত কোটের বুকপকেটে লুকাইয়া রাখিল এবং অধ্যাপকের বক্তৃতার প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগের ভাণ করিয়া রহিল।

আসলে তাহার মনের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উদিত হইতেছিল—

(১) শিবপুরে আমার বড় শ্যালীর শ্বশুরবাড়ী, সেখান হইতে কি পত্র আসিল?

(২) কখনও ত আসে না, আজ আসিল তাহার কারণ কি?

(৩) রাণী কি তাহার দিদির মারফৎ তাহাকে চিঠি পাঠাইয়াছে?

(৪) তাহাই যদি হয়, তবে দিদির মারফৎ তাহাকে চিঠি লেখা আমার উচিত হইবে কি না?

(৫) যদি লিখি তবে বাবার তাহা ধরিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে কিনা?

(৬) সকলের বাবা যেরূপ, আমার বাবা সেরূপ নহেন কেন? এমন কঠিন, এমন নিষ্ঠুর কেন?

এই সকল দুরূহ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, হঠাৎ হেমন্ত পিপাসা অনুভব করিল। ক্লাসের শেষ দিকে এবং দরজার অতি নিকটেই সে বসিয়াছিল—সুরুৎ করিয়া বাহির হইয়া গেল। জলের জন্য দ্বারবানের নিকট তাহাকে যাইতে হইল না—কারণ পকেটের ভিতর লেফাপার

মধ্যে তাহার তৃষাহর পদার্থটি ছিল। বাগানে নামিয়া গিয়া পত্রখানি খুলিয়া সে পাঠ করিল।

তাহাতে লেখা ছিল—

১৭নং বিনোদ বোসের গলি,
শিবপুর।
২৫শে কার্ত্তিক।

কল্যাণবরেষু

ভাই হেমন্ত, আমাকে চিনিতে পারিবে কি না বলিতে পারি না, কারণ একদিন মাত্র বাসরঘরে আমায় তুমি দেখিয়াছিলে, তাহাও ৮।৯ মাস পূর্ব্বে। আমি তোমার দিদি হই, তোমার শ্বশুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। উপরে লিখিত ঠিকানায় আমার শ্বশুরালয়।

আমার দিদিশ্বাশুড়ী তোমায় দেখেন নাই—একবার দেখিতে ইচ্ছা করেন। তোমার কলেজ হইতে শিবপুর এমন ত কিছু দূর নহে—বড় জোর এক ঘণ্টার পথ। শিবপুর ঘাটে নামিয়া, যাহাকে আমাদের ঠিকানা বলিবে, সেই পথ দেখাইয়া দিতে পারিবে। তোমার সঙ্গে আমারও অনেক অত্যাবশ্যক কথা আছে—অতএব যত শীঘ্র পার, অবশ্য অবশ্য একদিন আসিবে। বেলা বারোটা হইতে দুইটার মধ্যে আসিলেই ভাল হয়। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুমতি অনুসারে এ পত্র তোমায় লিখিতেছি।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার দিদি যামিনী।

পুঃ—রাণী গতকল্য হইতে এখানে। আগামী রবিবার বাবা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবেন।

পত্রখানি, বিশেষতঃ শেষ দুই লাইন দুই তিনবার পাঠ করিয়া হেমন্ত ক্লাসে ফিরিয়া গেল। অধ্যাপক মহাশয় তখন সনেটের স্বরূপ বুঝাইয়া বলিতেছিলেন—শেষ দুই লাইনেই সনেটের সমস্ত মিষ্ট রসটুকু জমা হইয়া থাকে।

সেদিন কলেজে বাকী কয় ঘণ্টা কি যে বক্তৃতা হইল, হেমন্ত তাহার কিছু বলিতে পারে না।

রাত্রে শয়ন করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, রাণী আসিয়াছে বলিয়া কি দিদি ডাকিয়া পাঠাইলেন? না তাঁহার দিদিশাশুড়ী সত্য সত্যই আমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল? সেখানে গেলে, রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হইবে কি? যে রকম কপাল, ভরসা হয় না। 'পিতৃসত্য রক্ষা করিবার জন্য রামচন্দ্র বনে গিয়াছিলেন—আমি কন্যা হইয়া বাবার সত্য-ভঙ্গ করাই কেন?' এইরূপই যদি দিদির মনের ভাব হয়?—হয়, হউক। তাহারা যদি আমায় জল খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে, কখনই খাইব না। একটা পাণ পর্য্যন্ত খাইব না।—আবার তাহার মনে হয়—না, দেখা হইবে বৈকি, অবশ্যই হইবে। সকল কথা জানিতে পারিয়াই বোধ হয় দিদি আমাকে সেখানে লইয়া যাইতেছেন। দিদির বাবাই সত্যবদ্ধ—দিদি ত আর সত্যবদ্ধ হন নাই। বোধ হয় আমাদের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়াছে—তাই এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। নহিলে, বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি না লিখিয়া, কলেজের ঠিকানায় চিঠি লিখিলেন কেন? রাণী সেখানে রবিবার অবধি আছে, এ কথাই বা বিশেষ করিয়া লিখিবার কারণ কি?—দেখা বোধ করি হইতে পারে।

এইরূপ নানা চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল। হেমন্ত আজ স্নানাহার একটু তাড়াতাড়ি সারিয়া লইল—অন্যদিন অপেক্ষা এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই আজ কলেজ যাত্রা করিল। আজ নাকি এগারটা হইতেই লেকচার আরম্ভ।

পৌনে এগারটার সময় কলেজের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিয়া কোচ-ম্যানকে হেমন্ত বলিল, আজ বাড়ী ফিরিতে তাহার দেরী হইবে, চারিটার পূর্ব্বে গাড়ী আনিবার প্রয়োজন নাই।

গাড়ী চলিয়া গেল। দ্বারবানের নিকট পুস্তকাদি রাখিয়া হেমন্ত এক-খানি ঠিকা গাড়ী লইল। তখনও কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রাম হয় নাই—ঘোড়ার ট্রাম—মাঝে মাঝে অচল হইয়া পড়িত। ট্রামকে হেমন্ত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

ঠিকাগাড়ীতে চাঁদপাল ঘাট—সেখান হইতে নৌকাযোগে শিবপুর। গঙ্গাবক্ষ হইতে শিবপুর দেখা যাইতে লাগিল। হেমন্ত সেইদিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া রহিল। নৌকাখানা চলিতেছে—একেবারে গজেন্দ্রগমনে!—দাঁড়ি বেটারা কুড়ের বাদশাহ!

শিবপুর ঘাটে নামিয়া, বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া লইতেও কিছু সময় নষ্ট হইল। শুনিল, গৃহকর্ত্তা হাওড়ার উকীল। তাঁহার পুত্র—বাগবাজারে যাহার বিবাহ হইয়াছে—সে কলিকাতায় কোন হউসের নায়েব খাজাঞ্চি। পথের লোকের নিকটেই এ সকল সংবাদ হেমন্ত সংগ্রহ করিল।

১৭ নম্বরের সম্মুখীন হইবামাত্র হেমন্ত ঘড়ি খুলিয়া দেখিল—কলেজ হইতে আসিতে এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট লাগিয়াছে।

ডাকাডাকিতে একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। পরিচয় লইয়া অন্তঃপুরে সে সংবাদ দিতে গেল। ক্রমে একজন ঝি আসিয়া বলিল, "জামাইবাবু ভাল আছেন ত? আসুন, বাড়ীর ভিতর আসুন।"—তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হেমন্ত ক্রমে দ্বিতলের একটি কক্ষে উপনীত হইল।

অল্পক্ষণ পরেই "কি ভাই চিনতে পার?"—বলিয়া উনিশ কিংবা কুড়ি বৎসর বয়সের, গৌরবর্ণা হাস্যময়ী এক যুবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কোলে এক বৎসরের একটি শিশু।

হেমন্তের মনে পড়িল, বাসরঘরে ইঁহাকে দেখিয়াছিল বটে।—"যামিনী দিদি?"—বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল।

যামিনী বলিল, "হয়েছে ভাই, আমি অমনিই তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি। আর, আশীর্ব্বাদের দরকারই বা কি? রাণীর সঙ্গে যেদিন তোমার বিয়ে হয়েছে—সেই দিনই ত রাজা হয়েছ।"—বলিয়া যামিনী সুমিষ্ট হাসির লহরী তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে, রুদ্ধ জানালার বাহিরে বারান্দা হইতে একাধিক তরুণীকণ্ঠে চাপা হাসির একটা গুঞ্জনধ্বনিও শুনা গেল।—"কে লা ছুঁড়িগুলো—পালা বলছি এখান থেকে"—বলিয়া যামিনী বাহির হইবামাত্র, ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে কয়েক যোড়া চরণ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

যামিনী ফিরিয়া আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, আমায় ডেকেছেন কেন?"

"কেন বল দেখি? যদি বলতে পার ত—সন্দেশ খাওয়াব"—বলিয়া যামিনী হাসিতে লাগিল।

"বলতে পারলাম না দিদি—সন্দেশ আমার ভাগ্যে নেই"—বলিয়া হেমন্ত খোকাকে লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

খোকা এই অপরিচিত ব্যক্তির কোলে যাইতে রাজী হইল না। তাহার মা তাহাকে কত করিয়া বুঝাইল, "যাও বাবা—কোলে যাও, তোমার মেছো মছাই হন, তোমায় কত ভালবাসেন, কত আদর করবেন, নক্ষি বাবা—যাও বাবা। পাজি হতভাগা ছেলে, কোলে না গেলি ত ওঁর বয়েই গেল।"

বাড়ীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর যামিনী বলিল, "হ্যাঁ ভাই, ক'টা অবধি তুমি এখানে থাকতে পারবে?"

হেমন্ত এ অঙ্কটি পূর্ব্বেই মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিল। বলিল, "বেলা আড়াইটের সময় আমাকে বেরুতে হবে দিদি।"

ঘরে ক্লক ছিল, যামিনী দেখিল সাড়ে বারো প্রায় বাজে। বলিল, "আচ্ছা দিদিমাকে তবে ডেকে আনি।"

তুই মিনিট পরে হেমন্ত শুনিল, ঝুম্ ঝুম করিয়া মলের শব্দ নিকটে আসিতেছে। হেমন্ত ভাবিল, যামিনী-দিদির পায়ে ত একগাছি করিয়া ডায়মন-কাটা মল দেখিয়াছি—ঝুম্ ঝুম্ করিয়া কে আসে? দিদিমার আওয়াজ কি এ রকমটা হইবে?

সে শব্দটা কিন্তু ঘর অবধি আসিল না, বাহিরেই থামিয়া গেল। যামিনী একাকিনী প্রবেশ করিয়া হাসিয়া বলিল, "দিদিমার এখন অবসর হ'ল না ভাই—এখনও তাঁর আহ্নিক সারা হয় নি। অন্য কাউকে তোমার যদি দরকার হয় ত বল। আর কাউকে চাই?"

হেমন্তের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। আশায় ও আনন্দে তাহার বুকটি ঢিব্ ঢিব্ করিতে লাগিল।

যামিনী হাসিয়া বাহির হইতে যাহাকে টানিয়া আনিল, কুসুম রঙের শাড়ীতে তাহার আপাদমস্তক আবৃত। তাহাকে ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সে বলিল, "এই নাও—তোমার রাণী নাও ভাই রাজা। রাজা ও রাণীর অভিনয় আমরা কেউ আড়ি পেতে দেখব না—সে আমরা থিয়েটারেই দেখে নিয়েছি। আমি এখন চললাম, নিশ্চিন্ত হয়ে দুটো অবধি তুমি রাজত্ব কর। আমি ততক্ষণ তোমার জন্যে জলখাবার তৈরি

করিগে।"—বলিয়া যামিনী কোন উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া, সশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক মাস কাটিল, অগ্রহায়ণ আসিল। রাণী পিত্রালয়ে। এখন আর হেমন্তের কলেজ নাই, বক্তৃতা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফাল্গুন মাসে পরীক্ষা। কয়েকদিন বাড়ীতে থাকিয়া হেমন্ত বলিল, "এখানে গোলমালে আমার পড়াশুনোর বড়ই ব্যাঘাত হচ্ছে। কলকাতায় মেসে গিয়ে এ ক'টা মাস আমি থাকি।"

পুত্রের এই অধ্যয়নস্পৃহায় পিতা কোনও বাধা দিলেন না।

হেমন্ত মেসে গিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহার শ্যালীপতি কুঞ্জলালের সহিতও আলাপ হইয়াছিল। মাঝে মাঝে আপিসের পর কুঞ্জ আসিয়া তাহাকে শিবপুরে 'ধরিয়া' লইয়া যাইত। যামিনীর ভগিনীস্নেহও এ সময় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল—প্রায়ই সে রাণীকে পিতৃগৃহ হইতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিত।

ফাল্গুন মাসে হেমন্তের পরীক্ষা হইল, রায় বাহাদুরও বধূকে নিজ বাটীতে পুনরানয়ন করিলেন।

বৈশাখের শেষে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল। হেমন্তের নাম গেজেটে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলিলে রায় বাহাদুর পুত্রকে বলিলেন, "বাড়ীতে গোলেমালে পড়াশুনো ভাল হবে না। তুমি বরং কলকাতায় মেসে গিয়ে থাক।"

পিতাকে হেমন্ত কিছু বলিতে সাহস করিল না। মার কাছে গিয়া মেসে থাকা যে কি কষ্ট, আহারাদির বন্দোবস্ত সেখানে যে কিরূপ শোচনীয় ও স্বাস্থ্যহানিকর, সমস্তই সবিস্তারে বর্ণনা করিল। গৃহিণী সভয়ে স্বামীর নিকট এ কথা উত্থাপন করিয়া, তর্জ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মেসেই হেমন্তকে যাইতে হইল।

পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে প্রতি রবিবার প্রাতে হেমন্ত বাড়ী আসে, জলযোগাদির পর বৈকালে আবার বাসায় ফিরিয়া যায়। অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথে রাণীর শাড়ীর রঙটি পর্য্যন্ত আর সে দেখিতে পায় না।

দুই রবিবার এইরূপে কাটিলে, বাড়ীর একজন ঝিকে ঘুস দিয়া, স্ত্রীর নিকট হেমন্ত পত্র পাঠাইল। রবিবারে রবিবারে ঝির মারফৎ উভয়ের পত্রব্যবহার চলিতে লাগিল।

ক্রমে পূজা আসিল। ছুটিতে হেমন্ত বাসা ছাড়িয়া বাড়ী আসিল। বড় আশা করিয়াছিল, অন্ততঃ বিজয়ার প্রণাম করিবার উপলক্ষ্যেও রাণী একবার তাহার কাছে আসিতে পাইবে—কিন্তু তাহার সে আশাও বিফল হইল। হেমন্ত এখন হইতে বড়ই হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। যখন বাড়ী আসে, চুপ করিয়া উদাস নেত্রে বসিয়া থাকে। কখনও কখনও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবে।

এক রবিবারে ঝি নিরিবিলি পাইয়া হেমন্তকে বলিল, "দাদাবাবু বৌদিদি রোজ রাত্রে কাঁদেন।"

হেমন্ত বলিল, "কেন ঝি? কাঁদে কেন?"

ঝি বলিল, "হাজার হোক দাদাবাবু, সোয়ামি ত! বউদিদিমণি বলেন, 'এমন কপাল করে ভারতে এসেছিলাম যে সোয়ামিকে চোখেও একবার দেখতে পাইনে।'"

"তুই কি করে জানলি ঝি?"

"যে ঘরে বউদিদিমণি শোন, আমিও সেই ঘরের মেঝেতে বিছানা করে শুই কি না।"

পর রবিবারে ঝি বলিল, "দাদাবাবু, একটিবার আপনি বউদিদিমণির সঙ্গে দেখা করুন।"

হেমন্ত বলিল, "উপায় কি?"

"আপনি যদি এক কাজ করেন ত হয়।"

"কি কাজ ঝি?"

"আপনি যেমন রবিবারে আসেন, একদিন যদি বলেন আমার শরীর খারাপ হয়েছে কি কিছু হয়েছে, এই বলে যদি থেকে

যান, তাঁহলে অনেক রাত্রে সবাই ঘুমুলে, আমি আস্তে আস্তে উঠে এসে আপনাকে দোর খুলে দিতে পারি।"

হেমন্ত বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রাণী যে ঘরে শয়ন করে, সিঁড়ি দিয়া দুতলায় উঠিয়া সেই প্রথম ঘর। তাহার পিতার শয়ন ঘর সেখান হইতে কিছু দূরে। খুব সাবধানে যাইতে পারিলে বোধ হয় সফল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বড় ভয় করে। যদি ধরা পড়িয়া যাই—ছি ছি—সে বড় কেলেঙ্কারি!

ঝি বলিল, "কি বলেন দাদাবাবু?"

"তোমার বউদিদিমণি কি বলেন?"

"তিনি বলেন, না ঝি ওসব কায নেই, আমার বড় ভয় করে।"

"আচ্ছা আমি ভেবে দেখব"—বলিয়া ঝিকে হেমন্ত আপাততঃ বিদায় দিল।

বাসায় ফিরিয়া গিয়া 'রোমিও জুলিয়েট' নাটক পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যদি দড়ির মই পাই, তবে বাগান দিয়া পশ্চাতের জানালার পথে আমিও রাত্রে রাণীর ঘরে প্রবেশ করিতে পারি। অনেক সন্ধানে জানিতে পারিল, সাহেব বাড়ীতে ১৫৲ মূল্যে দড়ির মই কিনিতে পাওয়া যায়। কালবিলম্ব না করিয়া সেই মই একটি হেমন্ত কিনিয়া আনিল।

পরবর্ত্তী রবিবারে ছোট একটি হাত ব্যাগের মধ্যে সেই মইটি লুকাইয়া হেমন্ত বাড়ী গেল। যথাসময়ে ঝির দ্বারায় সেই মই এবং একখানি পত্র স্ত্রীর নিকট চালান করিয়া দিল।

পত্রে এই প্রকার লেখা ছিল:—

হৃদয়ের রাণী আমার,

এক বৎসর কাল বিচ্ছেদ সহিলাম, আর পারি না। তোমায় একটিবার দেখিতে না পাইলে এইবার আমি পাগল হইয়া যাইব। ঝি যে উপায় বলিয়াছিল, তুমি তাহাতে অমত করিয়াছিলে। আমিও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, উহা নিরাপদ নহে। এবার কিন্তু একটি সুন্দর উপায় আমি আবিষ্কার করিয়াছি। তুমি যদি সাহস কর, তবেই আমাদের মিলন হইতে পারে।

ঝির হাতে যে জিনিষটি পাঠাইলাম, তাহা একটি দড়ির মই। উহার একটা প্রান্ত, তোমার ঘরের বাগানের দিকে যে জানালা আছে, সেই জানালায় বাঁধিয়া যদি নিম্নে ঝুলাইয়া দাও, তবে আমি বাগান হইতে ঐ মই দিয়া অনায়াসে তোমার ঘরে উঠিয়া যাইতে পারি। দড়ি খুব শক্ত—ছিঁড়িবার কোনও ভয় নাই। এখন তুমি সাহস করিলেই হয়।

কল্য রাত্রি এগারোটার সময় মইটি জানালায় বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া নীচে ফেলিয়া দিবে। এগারটা হইতে সাড়ে এগারটার মধ্যে আমি প্রাচীর ডিঙাইয়া বাগানের ভিতর দিয়া তোমার জানালার নিকট গিয়া পৌছিব।

এ প্রস্তাবে তুমি যদি সম্মত না হও তাহা হইলে আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইবে জানিও। লক্ষ্মীটি আমার, ইহাতে অমত করিও না। কোনও ভয় নাই, বিপদের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আবার ভোর বেলায় ঐ মই দিয়া নামিয়া আমি কলিকাতায় যাইব।

তোমার স্বামী

ঘণ্টা দুই পরে ঝি আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঝি, মত হয়েছে?"

ঝি বলিল, "হয়েছে, কিন্তু অনেক কষ্টে।"

"তবে, কাল রাত্রে এগারটার পর আমি আসব?"

"আসবেন।"

"আচ্ছা তবে কথা রইল। তোমরা ঠিক থেক।"

"ঠিক থাকব দাদাবাবু।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় শীতটা এবার বড় শীঘ্রই পড়িয়া গিয়াছে। যদিও এখনও অগ্রহায়ণ শেষ হয় নাই, তথাপি জলের দাঁত বেশ তীক্ষ্ণ হইয়াছে, সন্ধ্যারাত্রেও গায়ে লেপ সহ্য হয়, দিবসেও লোকে গরম মোজা ব্যবহার

করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, কোহাট গিরিবর্ত্মে তুষারপাত হইয়া গিয়াছে।

অন্ধকার রাত্রি। বির্জ্জিতলার ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া এগারটা বাজিল। ভবানীপুরের যে অংশে রায় বাহাদুর প্রফুল্ল মিত্রের বাস, তাহা রসা রোড হইতে কিছুদূর পশ্চিমে। সদর ফটকটি বড় রাস্তার উপর, বাড়ীর পশ্চাতের বাগানের দুই দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত জনহীন পথ। বাগানের পশ্চিম দিকের পথটি ত আরও জনহীন, কারণ তাহার অপর পারে কয়েকটা সুরকির কল, রাত্রে সেখানে কেহ বড় থাকে না।

এগারটা বাজিবার অল্পক্ষণ পরেই কাঁসারিপাড়ার রাস্তার মোড়ে একখানি ঠিকা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। কালো আলোয়ানে আবৃত দেহ এক ব্যক্তি গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে ভাড়ার টাকা দিল। গাড়ী তখন সেখান হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

বলা বাহুল্য যুবক আর কেহ নহে, বিরহজ্বরাক্রান্ত আমাদেরই হেমন্ত।

হেমন্ত তখন দ্রুত পদক্ষেপে তাহাদের বাগানের পশ্চাতের রাস্তাটির দিকে চলিল। কাছাকাছি আসিয়া সে নিজ গতিবেগ কিছু হ্রাস করিয়া দিল।

রাস্তাটি যেখানে বাঁকিয়া বাগানের দিকে গিয়াছে, সেখানে হেমন্ত দেখিল একজন কনষ্টেবল কম্বলের ওভারকোট গায়ে দিয়া, এক বাড়ীর দেউড়ীতে বসিয়া সিগারেট খাইতেছে। চোরের মন—হেমন্ত আড়চোখে তাহার পানে চাহিতে চাহিতে গেল।

সেই মোড়ের উপর যে লণ্ঠন ছিল, কিছু দূর অবধি বাগানের, প্রাচীর তদ্দ্বারা আলোকিত। তাহার পর অন্ধকার। হেমন্ত ভাবিল ঐ অন্ধকার অংশের কোনও একটা সুবিধামত স্থানেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হইবে।

অনেক বয়স অবধি সে জিম্ন্যাষ্টিক করিয়াছিল, এখনও রীতিমত ফুটবল খেলে—তাহার হাতে পায়ে বিলক্ষণ বল। প্রাচীর লঙ্ঘনের উপযোগী একটা স্থান সে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে দূরে কাহার পদশব্দ শুনিল। সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইল। অথচ এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। যে দিক হইতে পদশব্দ আসিতেছিল, সেই দিকেই হেমন্ত যাইতে লাগিল। ক্রমে দেখিল, দোকানী অথবা মিস্ত্রী-শ্রেণীর একজন লোক তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেল।

হেমন্ত আবার ফিরিল। যে স্থানটা সে লঙ্ঘনের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছিল, তাহার অপর দিকে বাগানে একটা বৃহৎ জামরুল গাছ আছে। প্রাচীর হইতে লাফ দিয়া সেই গাছের একটা ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়াই তাহার অভিপ্রায়।

অনেক কষ্টে হেমন্ত প্রাচীরে উঠিল। উঠিতে তাহার হাঁটু ছড়িয়া গেল, কুনুইয়ে আঘাত লাগিল। অহো, কবি সত্যই বলিয়াছেন, প্রেমের পথ মসৃণ নহে।

প্রাচীরে বসিয়া ডাল ধরিবার চেষ্টায় হেমন্ত হাত বাড়াইল। কিন্তু কোনও ডাল নাগাল পাইল না। একে অন্ধকার, তাহাতে ডালগুলাও কালো কালো।

এবার হেমন্ত কষ্টেসৃষ্টে প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইল। হাত বাড়াইল, তথাপি ডাল ধরিতে পারে না।

এমন সময় আর এক ব্যক্তির পদধ্বনি সে শুনিতে পাইল। ভাবিল, প্রাচীরে দাঁড়াইয়া থাকিলে ও নিশ্চয় দেখিতে পাইবে, অন্ধকারে এই এইখানে ঝুপ্‌টি মারিয়া বসিয়া থাকি।—বসিবার সময় প্রাচীরের সিমেণ্ট কিছু খসিয়া নিম্নে পড়িয়া গেল।

যে আসিতেছিল, সে এই শব্দে দাঁড়াইল, ভাবিল বোধ হয় জামরুল পড়িয়াছে। সে এই পাড়ারই লোক, পূর্ব্বেও এখান হইতে জামরুল কুড়াইয়া খাইয়াছে। জামরুল খুঁজিতে খুঁজিতে উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া, "বাবা গো, চোর!"—বলিয়া সে দৌড় দিল।

তাহার কীর্ত্তি দেখিয়া হেমন্তের হাসি পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল। শুনিল, মোড়ের উপর হইতে একটা গম্ভীর স্বর—"আরে কোন হায়? ক্যা হায় রে?"

কম্পিত স্বর—"একঠো চোর হায় কনেষ্টবলজি।"

"কাঁহা কাঁহা ?"

"ঐ হুঁয়া। মিত্তির বাবুদের পাঁচিলমে একঠো চোর বৈঠা হায়। বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে জামরুল খাতা হায়।"

এই কথা শুনিবামাত্র "জোড়িদার হো" বলিয়া কনষ্টেবল এক ভীষণ চীৎকার ছাড়িল।

হেমন্ত প্রাচীরে বসিয়া প্রমাদ গণিল। পরক্ষণেই শুনিল, নাগরা জুতার আওয়াজ ছুটিয়া আসিতেছে। বুল্‌স্‌-আই লণ্ঠনের তীব্র আলোকও পথে পড়িল।

হেমন্ত তখন নিরুপায় হইয়া বাগানের ভিতর লাফ দিল। সেখানে কতকগুলা ভাঙ্গা ইঁট পড়িয়াছিল, তাহাতে হেমন্তের শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত লাগিল।

কন্‌ষ্টেবলটা ছুটিতে ছুটিতে সেইখান বরাবর আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীরের উপর, গাছের উপর তীব্র আলোকপাত করিয়া, আবার ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া গেল।

হেমন্ত তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, দ্বিতলের একটি জানালা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছে—অপর সমস্ত জানালাগুলি একেবারে অন্ধকার।

দাঁড়াইয়া, ধুতিখানি হেমন্ত খুলিয়া ফেলিল। নিম্নে ফুটবল খেলিবার হাঁটু অবধি পা-জামা পরিয়া আসিয়াছিল, কারণ ধুতি লটরপটর করিয়া দড়ির মইয়ে চড়া অসুবিধা হইবে। ধুতিখানি সে জামরুল গাছের ডালে টাঙ্গাইয়া রাখিল, ভোরে ফিরিবার সময় আবার পরিয়া যাইবে। কোমরে আলোয়ানখানি যেমন বাঁধা ছিল, তেমনি বাঁধা রহিল।

এই অবস্থায় হেমন্ত জানালার দিকে অগ্রসর হইল। কোনও ফুলগাছ পাছে মাড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে, এই ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে, আলপথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া যাইতে লাগিল।

যখন অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছে, তখন হঠাৎ বাগানের দরজা খুলিয়া গেল। তিন চারিজন লোক লণ্ঠন হস্তে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "কাঁহা—কাঁহা কনেষ্টবলজী ?"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "জামরুলকে পেঁড়োয়া ভিরে।"—তখন লোকগুলা ধীরে ধীরে জামরুল গাছের দিকে অগ্রসর হইল।

হেমন্ত একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। কণ্ঠস্বরে চিনিল, তাহাদের বাড়ীর জমাদার মহাবীর সিং এবং দুইজন দ্বারবানের সঙ্গে কন্‌ষ্টেবলটা আসিয়াছে।

কিয়দ্দূর গিয়া মহাবীর সিং বলিল, "কেহু তো না বুঝায়হে?"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "ভাগ গেলই কা?—আপন আঁখিয়াসে হাম কুদ্‌তে দেখলি হো, তোহর্ কির্।"

এক মুহূর্ত্ত পরে—"উ কা হায়—উ কা হায়" বলিতে বলিতে সকলে জামরুল গাছের দিকে চলিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে হেমন্ত দেখিল, বৃক্ষশাখা হইতে লম্বিত তাহার সেই শ্বেত বস্ত্রখানার উপরে লণ্ঠনের আলোক পড়িয়াছে। সেই বিপদের সময়েও তাহার হাসি পাইল।

"ধোগো হো—পাকড়্লি চোর"—বলিয়া তাহারা হাল্লা করিয়া সেই বস্ত্রাভিমুখে ছুটিল। নিকটে গিয়া তাহারা বলিল, "ধেত্তেরিকে—ই ত খালি লুগা বুঝাহে।"—বস্ত্রখানা তাহারা নামাইয়া লইয়া লণ্ঠনের আলোকে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময় দ্বিতলের আর একটা জানালা খুলিয়া আলোকরশ্মি বাহির হইল। রায় বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "ক্যা হায়? কা হায় মহাবীর সিং?"

কন্‌ষ্টেবল প্রভৃতি সেখান হইতে চীৎকার করিয়া বলিল—"হুজুর বাগিচামে চোর ঘুষা হায়।"

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন, "খোজ খোজ—পাকড়ো।"

তখন তাহারা লণ্ঠন লইয়া বাগানের ভিতর খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

হেমন্ত দেখিল, বিপদ—এখনি উহারা আসিয়া পড়িবে। এখন উপায় কি? প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। হেমন্ত জুতা খুলিয়া ফেলিল। ইহারাও যেমন বাগানের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, সেও গাছের আড়ালে আড়ালে প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—"উ কা শারোয়া ভাগে হে !"

সেখানে একটা কৃত্রিম পাহাড় ছিল। হেমন্ত একটা পাথর তুলিয়া সজোরে তাহাদের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

"আরে বাপ্‌রে বাপ্—জান গইল রে বাপ্"—বলিয়া একজন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন, "ক্যা হুয়া ?"

এই সময় আরও দুই তিনখানা প্রস্তর সবেগে আসিয়া পড়িল। লোকগুলা হটিয়া গেল। বলিল, "হুজুর—পাথলসে মহাবীর সিংকা কপার ফোর দিহিস্ হে।"

"আচ্ছা রহো, হাম বন্দুক নিকালতেঁহে"—বলিয়া রায় বাহাদুর সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

হেমন্ত দেখিল, প্রাচীরের নিকটে যাওয়া এখন আর নিরাপদ নহে, রাণীর শয়ন-কক্ষের জানালা বরং কাছে। কোনও গতিকে যদি সে জানালার কাছে পৌঁছিতে পারে, তবে মই দিয়া উঠিয়া যায়,—তার পর বাগানে যত ইচ্ছা উহারা খুঁজুক—বাবা আসিয়া যত পারেন বন্দুক আওয়াজ করুন। এই ভাবিয়া সে গাছের আড়ালে আড়ালে গুটি গুটি জানালার দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে মই পাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

সে যখন অর্দ্ধপথে উঠিয়াছে, তখন খিড়কী দরজা হইতে গুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। লণ্ঠনবাহী ভৃত্যসহ রায় বাহাদুর বাগানে প্রবেশ করিলেন। বধূর জানালার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তিনি হাঁকিলেন, "কে রে ? কে রে ?"

বলিতে বলিতে হেমন্ত জানালায় পৌঁছিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ মই টানিয়া তুলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন, "চোর ঘরমে ঘুষা—চোর ঘরমে ঘুষা। দৌড়ো—সব আদমি ভিতর চলো—পাকড়ো"—বলিয়া তিনি সদলবলে বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া আসিলেন। লোকগুলা উঠানে ঘাঁটি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তিনি বন্দুক হস্তে ছুটিয়া গিয়া উপরে বধূর শয়ন কক্ষের দ্বার ঠেলিলেন।

ঝি কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বার খুলিয়া দিল।

রায় বাহাদুর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মেঝের উপর তাঁহার পুত্রবধূ মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া,—চোর পালঙ্কের উপর লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

পরদিন রায় বাহাদুর 'সামাজিক-সমস্যা সমাধান' পুস্তকের একস্থান খুলিয়া 'চতুর্ব্বিংশতি' কথাটি কাটিয়া 'দ্বাবিংশতি' এবং "ষোড়শ" কথাটি কাটিয়া 'চতুর্দ্দশ' করিয়া দিলেন। যদি কখনও বহিখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তবে এইরূপ সংশোধিত আকারেই ছাপা হইবে।

হীরালাল

হীরালাল জাতিতে ডোম। বৃদ্ধ হইয়াছে, বয়স ৬০ বৎসরের কম হইবে না, আকার খর্ব্ব, দেহখানি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অধিক স্থূলও নহে কৃশও নহে। কিন্তু এত বয়স হইলেও, তাহার দেহে এখনও বিলক্ষণ বল আছে; একদিনে সে অনায়াসে দশ ক্রোশ পথ চলিতে সমর্থ, তাহার চক্ষুর জ্যোতি আজিও অটুট আছে; প্রদীপের আলোকেও ছুঁচে সুতা পরাইতে পারে।

গ্রামখানির নাম মাণিকপুর। গ্রামের যেটা ডোমপাড়া, সেখানে অন্যান্য ডোমেদের বাস, সেখানে হীরু থাকে না। গ্রামের অপর প্রান্তে, শ্মশান হইতে অল্প দূরে, একখানি মাটির ঘরে সে একাকী বাস করে। তাহার স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহই নাই; একে একে সকলেই মরিয়াছে; লোকে বলে ভূতেদের সহিত হীরুর ষড়যন্ত্র আছে। শ্মশান হইতে ভূতেরা গভীর রাত্রিতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে, কথাবার্ত্তা কয়। সেই কারণেই হীরু নাকি ডোমপাড়ায় থাকে না। এবং কথাবার্ত্তার অসুবিধা হয় বলিয়াই হীরুর সম্মতিক্রমে সেই ভূতেরাই নাকি উহার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে একে একে মারিয়া ফেলিয়াছে; এবং সেই ভয়েই, ডোমপাড়ায় হীরুর যে সকল আত্মীয় স্বজন আছে, তাহারা কেহই আসিয়া হীরুর সহিত বাস করিতে সম্মত নহে। কিন্তু আবার কেহ কেহ বলে হীরুর এই ভূত অপবাদ নিতান্ত মিথ্যা কথা; তবে সে একজন গুণী লোক বটে। অনেক রকম ঔষধ তাহার জানা আছে, মন্ত্রেতন্ত্রে, ঝাড়ফুঁকেও সে ওস্তাদ। অমাবস্যার রাত্রে জঙ্গলে সে ঔষধ তুলিতে যায়; গোখুরা সাপ মারিয়া তাহার বিষ নিষ্কাসিত করিয়া লয়—ইত্যাদি। যাহা হউক, ইহা সত্য যে, পাঁচখানা গ্রামের ছোটলোক, বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য হীরুর কাছে ঝাড়াইতে অথবা ঔষধ লইতে আসে।

হীরুর ঘরখানির দুইধারে বাঁশের দুইটি মাচা বাঁধা আছে, একটিতে রাত্রে শয়ন করে, অন্যটিতে হাঁড়ি কলসীতে তাহার চাল ডাল এবং ঔষধপত্র থাকে। বাহিরের দাওয়ার একদিকে তাহার উনান পাতা আছে। অপর দিকে সে আপন জাতিকর্ম্ম করে; কুলা ডালা ধুচুনি বুনিয়া, গ্রামে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসে।

রাত্রি তখন প্রায় ১১টা। শ্রাবণ মাস, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী; কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া চারিদিক অন্ধকার। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, আবার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। হীরু ঘরের মধ্যে প্রদীপের আলোয় বসিয়া, একটা ধুচুনি বোনা শেষ করিতেছিল। দ্বার খোলা ছিল, প্রদীপের খানিকটা আলো দাওয়ার উপর গিয়া পড়িয়াছিল। হীরু হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকের মত কাপড় পরা কে একজন মানুষ তাহার দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছে। হীরু জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?"

মানুষটি আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাড়াইল। পরিধানে একখানি কল্কাপেড়ে বিলাতী শাড়ী, ঘোমটায় মুখখানি ঢাকা। হীরু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?"

আগন্তুক আস্তে আস্তে সেখানে বসিল। বসিয়া অতি স্নিগ্ধ স্বরে প্রায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "হীরু, তুমি বাবা আমার একটু উপকার করবে?"

হীরু সবিস্ময়ে বলিল, "কি উপকার বল।"

স্ত্রীলোকটি পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে বলিল, "একটা ওষুধ"—বলিয়া সে চুপ করিল।

হীরু বলিল, "কিসের ওষুধ চাই তোমার? কি ব্যারাম হয়েছে?"

আগন্তুক একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার কাছে বিষটিষও থাকে ত?"

হীরু সন্দেহপূর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "বিষ? বিষ কোথা পাব? কিছু ওষুধ বিষুধ রাখি বটে। কিসের ওষুধ চাই তোমার, তাই বল না?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "ওষুধ না। বিষই দরকার। কেন আমার সঙ্গে

ছলনা করছ হীরু? তোমার কাছে অনেক বিষ আছে তা আমি জানি। খানিকটে বিষ আমায় দাও, বিশেষ দরকার।”

হীরু তীক্ষ্নস্বরে বলিল, “কেন, বিষ নিয়ে তুমি কি করবে?”

হীরু ‘বিষবৃক্ষ’ পড়ে নাই, ইহা মনে নিশ্চয় জানিয়া, স্ত্রীলোকটি বলিল, “শেয়ালের বড় উপদ্রব হয়েছে, বুঝেছ! রান্নাঘরের বেড়া ফাঁক করে, রোজ রাত্রে শেয়াল ঢুকে, আমার হাঁড়ি খেয়ে যায়। দুটো শেয়াল মরে, এই রকম খানিকটা বিষ তুমি আমায় দিতে পার?”

হীরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বলিল, “কেন মিছে কষ্ট করে এই আঁধার রেতে, এই জলকাদা ভেঙ্গে এসেছ তুমি? বাড়ী যাও। ও সব কথার মধ্যে আমি কোনও দিন থাকিও নি, থাকবও না। পাঁচ-খানা গাঁয়ের মধ্যে, কোথাও কোনও দুর্ঘটনা হলে, তোমরা এসে আমাকেই নিয়ে টানাটানি কর কেন বল দেখি? দুটো ওষুধপালা জানি, তাই পাঁচজনে আমার কাছে আসে। বিষটিষ রাখিও না, কাউকে দিইও না। কেন তোমরা মিছামিছি আমায় সন্দেহ কর?”

রমণী বিস্মিতভাবে বলিল, “আমরা সন্দেহ করি?”

“হ্যাঁ, তোমরা সন্দেহ কর। তুমি কে তাও আমি জানি, কি জন্যে এসেছ তাও আমি জানি।”

সভয় কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, “কে আমি?”

“তুমি পুলিশ। তুমি পুরুষ মানুষ, ছিরিলোক সেজে এসেছ। নইলে এই আঁধার রাতে, এই শ্মশানের মোওড়ায়, ছিরিলোকের বাবার সাধ্যি কি যে আসে?”

রমণী এই কথা শুনিয়া দাড়াইয়া উঠিল। নিজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, “আমি পুরুষ মানুষ? গলার স্বর শুনে বুঝতে পারছ না আমি পুরুষ কি স্ত্রীলোক?”

হীরু বিস্মিত হইল—স্ত্রীকণ্ঠস্বরই ত বটে! তা ছাড়া স্বরটা যেন হীরুর পরিচিত বলিয়াও বোধ হইল। কার কণ্ঠস্বর তাহাই সে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহাকে সংশয়াপন্ন মনে করিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, “এখনও সন্দেহ?—তবে দেখ!”—বলিয়া সেই অবগুণ্ঠনবতী

যুবতী, কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে নিজ বক্ষের বসন সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। নষ্টপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

"রাম রাম!"—বলিয়া হীরু মাথাটি হেঁট করিয়া বলিল, "মা, বস।"

রমণী উপবেশন করিল। হীরু বলিল, আজকাল পুলিশের ভারি উপদ্রব হয়েছে। তোমার ঘোমটা দেখে, তোমার ফিস্ ফিস্ কথা শুনে তাই আমি সন্দেহ করেছিলাম, তুমি জাল মেয়েমানুষ, আসলে পুলিশের কোনও টিক্‌টিকি।"

স্ত্রীলোকটি অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বলিল, "এখন ত তোমার সন্দেহ গেল? আমি যা চাই, আমায় দাও তবে।"—এখন আর ফিস্ ফিস করিয়া নহে, রমণী স্বাভাবিক কণ্ঠেই কথা কহিতে লাগিল।

হীরু বলিল, "তুমি যা চাও, তা আমি তোমায় দিতে পারি। কিন্তু এ সব জিনিষের দাম খুব বেশী তা জান ত?"

রমণী বলিল, "জানি। পঞ্চাশ টাকা আমি এনেছি। এই নাও।"—বলিয়া নিজ কটিদেশ হইতে 'গেঁজে' খুলিয়া লইয়া, হীরুর সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "গুণে নাও।"

হীরু বলিল, "তোমার শেয়াল মরলে, পুলিশ এসে যখন আমায় ধরে নিয়ে যাবে, তখন ও পঞ্চাশ ত তাদের পূজো দিতেই যাবে! আরও পঞ্চাশ চাই।"

স্ত্রীলোকটি ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "আরও পঞ্চাশ চাই? আর ত আনি নি। অত বেশী লাগবে তা ত আমি জানতাম না।"

"কাল টাকা এনে জিনিষ নিয়ে যেও।"

স্ত্রীলোকটি কাতরকণ্ঠে বলিল, "কাল হলে চলবে না হীরু—আজই আমার চাই যে! তা ছাড়া কাল আমার আসবার উপায়ও নেই।"

হীরু বলিল, "সে তুমি বুঝো, কিন্তু একশ' টাকার কমে এ কায আমি পারব না বাছা, আমার সাফ কথা।"

রমণী ক্ষণকালমাত্র কি চিন্তা করিল। তারপর নিজ বাম প্রকোষ্ঠ লইতে স্বর্ণবলয় উন্মোচন করিয়া বলিল, "এই নাও। এর দাম পঞ্চাশ টাকারও বেশী। দাও, আমার জিনিষ দাও।"

হীরু বালাটি হাতে লইয়া, প্রদীপের আলোকে ধরিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেটি পরীক্ষা করিল। তাহার পর গেঁজে হইতে টাকাগুলি খুলিয়া নিঃশব্দে সেগুলি গণিয়া দেখিল ঠিক পঞ্চাশ টাকা আছে। টাকা এবং বালা মাচার উপর শয্যাতলে লুকাইয়া, অপর মাচা হইতে একটি হাঁড়ি নামাইয়া লইল। তাহার ভিতর, গাছের কতকগুলা শুষ্ক শিকড়, কয়েকটা শিশি ও অনেকগুলো ছোট ছোট পুঁটুলি ছিল। একটা শিশি আলোতে ধরিয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া, একটু ছেঁড়া কাগজের উপর তাহা উপুড় করিল। কাগজে পড়িল কিসের কতকটা গুঁড়া। শিশি ছিপিবন্ধ করিয়া কাগজের মোড়ক করিয়া, রমণীর হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিও।"

রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "এতেই হবে ত? দুটো শেয়াল মরবে?"

হীরু বলিল, "যথেষ্ট হবে।"

রমণী মোড়ক লইয়া বলিল, "এ কি?"

"শেঁখো বিষ। ভয়ানক জোর। যে শেয়ালকে খাওয়াবে, এক ঘণ্টার মধ্যে তার শরীরে কলেরার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাবে। দু তিন ঘণ্টার মধ্যেই শেষ। লোকে মনে করবে, সে কলেরা হয়ে মরেছে। বুঝেছ? কলেরা—মনে রেখ।"

"বেশ।"—বলিয়া রমণী অঞ্চলের কোণে মোড়কটি বাঁধিয়া লইল, বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া ধীরপদে বাহির হইয়া গেল।

হীরু তখন আলোটি নিবাইয়া দিল। দাওয়ায় বাহির হইয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিল, কিছুদূরে শ্বেতবস্ত্রাবৃতা রমণী গ্রামাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। আর কয়েক পদ গিয়া রমণী দাঁড়াইল। নিকটেই একটা বটগাছ ছিল, তাহার ছায়াতল হইতে অপর একজন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইল। ছাতা খোলার মত খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল; তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। উভয় মূর্ত্তি অগ্র-পশ্চাৎ ব্যবধানে, গ্রামের দিকে চলিল। হীরু আস্তে আস্তে দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাতে কুলুপ লাগাইয়া, টোকা মাথায় দিয়া পথে নামিয়া, নিঃশব্দে সেই শ্বেতবস্ত্রযুগলের অনুসরণ করিল।

সেই নিশাচর ও নিশাচরীর অনুসরণে, হীরু গ্রামের মধ্যে প্রবেশ

করিল। কিছু দূর গিয়া, তাহাদিগকে একটা বাড়ীর সদর দরজার তালা খুলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিল।

হীরু তখন মনে মনে বলিল, 'ওঃ, তোমায় ঠিকই সন্দেহ ক'রেছিলাম তা হলে!'

হীরু জানিত, ইহা ৺শশী মুখুয্যের বাড়ী—বুঝিল, যুবতী তাঁহারই পুত্রবধূ নীরদা।

এই বাড়ীতে হীরু মাঝে মাঝে আসিয়া, নীরদাকে কুলাটা ডালাটা বিক্রয় করে। গত দুই বৎসর যাবৎ ইহার স্বামী বিদেশে। হীরু শুনিয়াছিল, নীরদার স্বামী শীঘ্র বাড়ী আসিবে। চারি বৎসরের একটি ছেলে মাত্র লইয়া, যুবতী একাকিনী এই গৃহে বাস করে। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে গ্রামে একটা কাণাঘুষা আছে, হীরুও তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বাস করিত না। এবার তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া, আপন মনে সে বলিল, 'তবে ঠিকই ত বলতো লোকে! যা করছিস, করছিস —তার উপর আবার এই! ওরে হারামজাদী!'

হীরু নিঃশব্দে আপন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, পা ধুইয়া, এক ছিলিম তামাক সাজিয়া খাইয়া, মাচাটির উপর উঠিয়া শয়ন করিয়া, অবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতেও আকাশ তেমনি মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

মাণিকপুর গ্রামের দুই ক্রোশ দূরে রেলওয়ে ষ্টেশন। বেলা সাতটার সময়, পশ্চিম হইতে একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইল। মাণিকপুর গ্রামের ৺শশী মুখুয্যের পুত্র বিনোদলাল, একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে ব্যাগ ও ছাতা হস্তে নামিয়া পড়িল। প্লাটফর্ম্মে নামিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কোনও লোক তাহাকে লইতে আসিয়াছে কি না। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মনে

মনে বলিল, 'কেই বা আছে যে নিতে আসবে! বাইরে গিয়ে দেখি যদি গোরুর গাড়ীটাড়ী একখানা পাঠিয়ে থাকে।'

এই সময় বৃষ্টি আসিল। ছাতাটি খুলিয়া তখন সে টিকিট দিবার ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। টিকিটখানি দিয়া, বাহির হইয়া দেখিল, ষ্টেশন-প্রাঙ্গণে দুইখানি গোরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু কোনও গাড়ীর গাড়োয়ানকে নিজ গ্রামের বলিয়া চিনিতে পারিল না। তথাপি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিয়া লইল—তাহারা স্থানীয় গাড়োয়ান, ভাড়া জুটিবার আশায় ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিনোদ একবার ভাবিল, একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া লয়। আবার ভাবিল, হয়ত একটা টাকা ভাড়া চাহিয়া বসিবে, সে টাকায় ছেলের জন্য, গ্রামে প্রবেশ করিয়া একহাঁড়ি রসগোল্লা কিনিতে পারা যাইবে। রৌদ্র নাই, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এই দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে আর কতক্ষণ লাগিবে? পথে কাদা হইয়াছে বটে, তা জুতা যোড়াটা খুলিয়া হাতে করিয়া লইলেই চলিবে। এইরূপ ভাবিয়া, বিনোদ ষ্টেশনের প্রাঙ্গণ পার হইয়া, জুতাযোড়াটি হাতে করিয়া লইয়া, নিজ গ্রামের পথ ধরিল।

এই বিনোদ লোকটির বয়স এখন ৩০ বৎসর। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, চোখ দুইটি বড় বড়, সর্ব্বদাই প্রফুল্ল বদন। বাল্যকালে লেখাপড়ায় বড় মন দেয় নাই। ১৮ বৎসর বয়সে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িবার সময় তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। বাজারে পিতার একখানি মণিহারির দোকান ছিল, তাহার আয়েই সংসার চলিত। জমিজমা ছিল—খুব বেশী নয়—তবে সম্বৎসরের ধানটা কলাইটা তাহা হইতে পাওয়া যাইত, কিনিতে হইত না। পিতার মৃত্যুর পর দোকানখানি হাতে পাইয়া, বৎসরখানেকের মধ্যেই বিনোদ তাহা লোপাট করিয়া ফেলিল। কিছুদিন ঘরে বসিয়া রহিল; কিন্তু দিন চলে না। সংসারে যদিও দুইটি বিধবা মাত্র—মা এবং পিসিমা—তথাপি দিন গুজরাণ করা কষ্টকর হইল। প্রতিদিনের বাজার খরচ, মা পিসিমার দশমী দ্বাদশীর খরচ, তাঁহাদের ব্রত পার্ব্বণ, কাপড় চোপড়—নিজের জুতাটা জামাটা ছাতাটা সিগারেটটা, তার পরে জমিদারের খাজানা আছে—এ সব আসে কোথা হইতে? এ

দিকে ছেলে 'সোমত্ত' হইল, মা পিসিমা তাহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু যোত্রহীন নিষ্কর্ম্মা গ্রাম্য যুবককে ভাল মেয়ে কে দিবে? এই অবস্থায় পড়িয়া, বিনোদ কলিকাতায় গিয়া অনেক চেষ্টায় একটি সামান্য কেরাণীগিরি যোগাড় করিয়া লইল। পাঁচ বৎসর সে চাকরি করিল। ইতিমধ্যে তাহার বিবাহ হইল; বেতনও কিছু বৃদ্ধি হইল। ছেলের বিবাহের বৎসরখানেক পরে, মারও বৈধব্য যন্ত্রণা শেষ হইল—একটী নাতির মুখও তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

২০৲ বেতনে ঢুকিয়াছিল, ৫ বৎসরে যদিও তাহার ৩০৲ বেতন হইয়াছে, তথাপি দুঃখ ঘুচে না। কলিকাতার মেসের খরচ, ট্র্যাম ভাড়া, বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়িয়া মাঝে মাঝে থিয়েটার বায়স্কোপেও যাইতে হয়, মাসে দুইবার বাড়ী যাওয়া আছে—বাড়ীর খরচের জন্য মাসে ৫।৭ টাকার বেশী আর দিতে পারে না। ছেলেটী হইয়াছে, তার দুধ আছে, খাবার আছে, অসুখ করিলে বিস্কুট বার্লি আছে—৫।৭ টাকায় কি করিয়া চলিবে?

এই সময় বড়বাজারে অমৃতসর-নিবাসী এক শালের মহাজনের সহিত বিনোদের আলাপ হইল। আহার ও বাসস্থান ছাড়া তিনি তাহাকে ৪০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া অমৃতসরে লইয়া যাইতে চাহিলেন। কাযকর্ম্মে পটুতা দেখাইতে পারিলে ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের ২।১ আনার অংশীদারও করিয়া লইবেন ভরসা দিলেন। আশায় লুব্ধ হইয়া, কলিকাতার চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া, বিনোদ সেই চাকরি গ্রহণ করিল। বাড়ী গিয়া, দিন দশ বারো থাকিয়া, স্ত্রীপুত্রকে পিসিমার জিম্মায় রাখিয়া, দুই বৎসর পূর্ব্বে আষাঢ় মাসে বিনোদ অমৃতসর চলিয়া গিয়াছিল, আর আজ ফিরিতেছে।

অমৃতসরে পৌঁছিবার মাস দুই পরেই সে পিসিমার মৃত্যুসংবাদ পায়। মাত্র দুই মাসের চাকরি, মনিব ছুটি দিল না, বলিল 'ইচ্ছা করিলে চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পার'। বিনোদ পাড়া প্রতিবেশী অভি-ভাবক-স্থানীয়গণকে চিঠি লিখিল; তাঁহারা একবাক্যে উত্তর দিলেন, 'আমরা রহিয়াছি, ভাবনা কি? বউমাকে আগলাইবার জন্য একজন প্রবীণা ঝি রাখিয়া দিব, নিজেরা সর্ব্বদা দেখাশুনা করিব।'—বিনোদের

শ্বশুরবাড়ী গ্রাম হইতে অধিক দূরে নহে; কিন্তু তাহার শ্বশুর শ্বাশুড়ী নাই, শালারাও কেহ জীবিত নাই; বিধবা খুড়শ্বাশুড়ী তাঁহার নাবালক পুত্রকন্যাগণ সহ সেখানে বাস করেন। তথাপি বিনোদ সেই খুড়শ্বাশুড়ীকে পত্র লিখিল; তিনি উত্তর দিলেন, 'সে কি হয় বাবা? তোমার বাপ পিতামহের ভিটায় সন্ধ্যা পড়িবে না, এ কেমন কথা। নীরদা সেইখানেই এখন থাকুক। পরে তুমি সুবিধামত তাহাকে তোমার চাকরিস্থানে লইয়া যাইও।'—নীরদা অমৃতসর গেলে বাপ পিতামহের ভিটায় কে সন্ধ্যা দিবে, সে সম্বন্ধে কোনও সদুপায় খুড়ীমা কিন্তু নির্দ্দেশ করেন নাই।

পাড়া প্রতিবেশীরা নিজেরা যত দেখাশুনা করুন আর না করুন, প্রবীণা ঝি একটি তাঁহারা জোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মাস দুই পরে নীরদার সহিত ঝগড়া করিয়া সে চলিয়া যায়। একটি ঠিকা ঝি রাখা হইল, সে হাটবাজার করিয়া, বাসন মাজিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

বিনোদ বাড়ী গিয়া স্ত্রীকে লইয়া আসিবে বলিয়া মাঝে মাঝে ছুটি চাহিয়াছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের আপিস ত নহে, মহাজনী কারবার, আজ না কাল, এ মাসে না ও মাসে, এই করিয়া, এত দিনের পর তাঁহারা বিনোদকে এক মাসের ছুটী দিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"কে রে, হীরেনাল নাকি? এখনও তুই বেঁচে আছিস?"

হীরু ডোম তাহার দাওয়ায় বসিয়া ডালা বুনিতেছিল, চাহিয়া দেখিল, ছাতা মাথায়, জুতা ও ব্যাগ হাতে বিনোদ রাস্তায় দাঁড়াইয়া ঐরূপ চীৎকার করিতেছে।

হীরুকে নিরুত্তর দেখিয়া বিনোদ রাস্তা হইতে নামিয়া হীরুর কুটীরের দিকে আসিতে আসিতে হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, "কিরে হীরু, এখনও বেঁচে আছিস?"

এইবার হীরুর কথা যোগাইল—"আছি বৈকি দাদা ঠাকুর। এস, দাবায় উঠে এস, প্রণাম করি।"

বিনোদ বলিল, "পায়ে যে কাদা রে হীরু!"—বলিয়া রাস্তা হইতে নামিল। নিকটে একটা গর্ত্তে বর্ষার জল দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে পা ধুইয়া, হীরুর দাওয়ায় গিয়া উঠিল। হীরু তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিবার জন্য নূতন এক টুকরা বাঁশের চাটাই বিছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতদিন বাড়ী ছেড়ে কোথায় ছিলে দাদাঠাকুর?"

"অমৃতসরে চাকরি করছিলাম রে। কেন, যাবার সময় ত তোকে বলে গিয়েছিলাম। মনিব ছুটি দেয় না, কাযেই আসতে প্রারিনি। এক মাসের ছুটী পেয়ে বাড়ী এসেছি।"

হীরু গম্ভীর মুখে অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার ভাব দেখিয়া বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "হীরু, তুই মুখখানা এমন হাঁড়ি করে বসে রয়েছিস কেন? দু'বছর পরে দেখা, একটা কথা কচ্ছিস নে। হাঁরে, আমাদের বাড়ীতে কোনও খারাপ খবর আছে না কি? তুই আজকালের মধ্যে আমাদের ওদিকে গিয়েছিলি? আমার ছেলে, পরিবার সবাই ভাল আছে ত?"

হীরু গম্ভীর ভাবে বলিল, "অনেকদিন ওদিকে যাওয়া হয় নি।"

বিনোদ বলিল, "তা যাবি কেন! আমি বিদেশে যাবার সময় তোকে বলে গেলাম, হীরু, আমাদের বাড়ী সর্ব্বদা যাবি, বউ একলা রইল, দেখবি শুনবি খোঁজ খবর নিবি। তুই বল্লি, তা আর খোঁজ খবর নেবনা দাদাঠাকুর, তোমার বাপ একদিন আমার যে উপকারটা করেছিলেন, আমি ত তোমাদের বিনি মাইনের বাঁধা চাকর। তুই এ কথা বলেছিলি কি না বল্?"

হীরু পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে বলিল, "মাঝে মাঝে আমি গেছি বৈকি। তোমাদের বাড়ীতে না গেলেও খবর টবর পাই। বউমাকে কালও আমি পথে দেখেছি। সবাই ভাল আছে।"

বিনোদ বলিল, "আচ্ছা হীরু, তুই বস্—আমি এখন উঠি। বাড়ীতে হয়ত তারা কত ভাবছে।"—বলিয়া বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইল।

হীরু, বিনোদকে প্রণাম করিয়া, গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। বিনোদ চলিয়া গেলে সে আপনার মনে বলিল, "হায় রে সংসার!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আজ আর হীরু কুলা ডালা লইয়া গ্রামে বিক্রয় করিতে বাহির হইল না। সমস্ত দিন ঘরে বসিয়া রহিল, তামাক খাইল, অনেক চিন্তা করিল।

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল। যখন প্রায় বারোটা, হীরু তখন গতরাত্রে প্রাপ্ত সেই বালা ও টাকা পঞ্চাশটি লইয়া কোমরে বাঁধিয়া, ঘর বন্ধ করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইল।

গ্রামের ভিতর গিয়া, ক্রমে বিনোদের বাড়ীর নিকট পৌঁছিল। বাড়ীর চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিল, ভিতরে কোনও সাড়াশব্দ নাই, নিস্তব্ধ, কিন্তু উঠানের আমগাছে আলো পড়িয়াছে। খিড়কী দুয়ারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীরের একটা স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া, কৌশলে তাহার উপর উঠিয়া, হীরু নিঃশব্দে ভিতরে লাফাইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া দেখিল, রান্নাঘরের নিকটে হ্যারিকেন লণ্ঠন মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। হীরু ধীরপদে সম্মুখে গিয়া বলিল, "কি দিদিঠাকরুণ, এখনও ঘুমাও নি?"

সহসা হীরুর আগমনে নীরদা ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গেল। কোনও কথাই সে বলিতে পারিল না। হীরু বলিল, "ভয় পেয়েছ দিদিঠাকরুণ? আমি হীরু, ভয় কি?"

এইবার নীরদার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল। সে বলিল, "হীরু, তুই চোরের মত এখানে কি করছিস? বাড়ী ঢুকলি কি করে?"

হীরু বলিল, "পাঁচিল টপকে এসেছি। কাল ওষুধ নিয়ে এলে, ওষুধের ফলটা কি রকম হল তাই দেখতে এসেছি।"

নীরদা বিস্মিত হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "ওষুধ? আমি আবার কবে তোর কাছ থেকে ওষুধ আনলাম? কি বলছিস পাগলের মত? মদ টদ খেয়েছিস বুঝি?"

হীরু একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ন্যাকামি রাখ না দিদি-ঠাকরুণ! আমি সবই জানি। কাল রাতে তোমার গলার স্বর

তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে তুমি। তারপর, অন্ধকারে পিছু পিছু এসে, তোমাকে আর তাকে, এই বাড়ী ঢুকতে ত দেখেই গেলাম। সে যাক। এখন বল দেখি, যেমন বলে দিয়েছিলাম, দুধের সঙ্গে সেই গুঁড়োটা মিশিয়ে দিয়েছ ত?"

নীরদা দেখিল, আর ভণ্ডামি করা নিষ্ফল। বলিল, "হ্যাঁ হীরু, খাইয়ে ত দিয়েছিলাম। কই এখনও ত কিছু হল না? দিব্যি ত নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে!"

হীরু মৃদুস্বরে হাসিয়া বলিল, "ঘুমবেই ত। ওষুধ দিতে আমারই যে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল কিনা!"

নীরদা শঙ্কিতভাবে বলিয়া উঠিল, "কেন, কি দিয়েছিস?"

হীরু বলিল, "তুমি বিষ চেয়েছিলে ত? বিষও আমার ছিল, কিন্তু একে বুড়োমানুষ, তায় রাত্তির কাল, বিষের গুঁড়ো না দিয়ে, ভুলে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ফেলেছিলাম।"—বলিয়া হীরু ব্যঙ্গভরে আবার হাসিল।

নীরদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হীরুর মুখপানে চাহিল। ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিল, "তবে তুই আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিস বল্? আমাকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছিস, জোচ্চোর কোথাকার!"

এই গালি শুনিয়া হীরু রাগিয়া গেল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁলো হারামজাদি শয়তানী নচ্ছারনী! হ্যাঁ! তোকে ফাঁকি দিয়েই ত টাকা নিয়েছি! এখন আমি যে জন্য এসেছি, তা বলি শোন্। নে, তোর গয়না কাপড় বাক্স থেকে বের করে', পুঁটুলি বেঁধে নে। তোকে, আজ রাত্রেই কলকাতায় যেতে হবে।"

নীরদা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কলকাতায়? কলকাতায় আমি যাব কেন?"

হীরু ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিল, "কলকাতায় যাবি নে ত কি এখানে থেকে স্বামীহত্যে ব্রহ্মহত্যে করবি হতভাগী? নে, কাপড় চোপড় গুছিয়ে নে; ভোর তিনটেয় গাড়ী। আমি তোকে ইষ্টিশনে পৌঁছে দিয়ে, টিকিট কেটে, গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে চলে আসব।"

নীরদা কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বলিল, "হীরেলাল, তোর আস্পর্দ্ধা ত কম নয়? তুই আমায় হুকুম করছিস? আমি যদি কলকাতায় না যাই?"

হীরু বলিল, "না যাস, এখনই বিনোদ দা'ঠাকুরকে জাগিয়ে সব কথা তাকে বলে, তাতে আমাতে দু'জনে মিলে তোকে খুন করে', উঠোনে গর্ত্ত খুঁড়ে তোকে পুঁতে ফেলবো।"

হীরুর ভঙ্গি দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া নীরদা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, "হীরু, আমি যদি দোষ করে থাকি আমার স্বামী তার বিচার করবেন। তিনি যদি আমায় ত্যাগ করেন, তখন আমি কলকাতায় যাব—যেখানে হয় যাব। তুমি কেন এর মধ্যে—"

হীরু বলিল, "আহা, নেকু! স্বামী তোমার বিচার করবেন। বেচারি অঘোরে পড়ে ঘুমুচ্চে, তুমি যদি আজ রাতেই তার গলাটি ছুরি দিয়ে কেটে দাও? যে বিষ খাওয়াতে পারে, সে কি আর গলা কাটতে পারে না? ওসব কথা আমি শুনবো না। ভোর তিনটের গাড়ীতে তোমায় যেতেই হবে কলকাতা। না যদি রাজি থাক, বল, আমি সোরগোল সুরু করে দিই।"

নীরদা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। সে ধপ করিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কিন্তু হীরু, কলকাতায় যে আমায় যেতে বলছ, সেখানে গিয়ে আমি কি খাব?"

হীরু বলিল, "তোমাদের দলের লোক সেখানে ঢের আছে। তারা যেমন ক'রে খায়, তুমিও সেই রকম করে খাবে।"

"কিন্তু হীরু, আমি যে কলকাতায় কখনও যাই নি, কাউকে চিনি নে। আমি কি করে' সেখানে যাব, কি করে' কি করব?"—বলিয়া নীরদা চোখে আঁচল দিল।

কথাটা শুনিয়া হীরু একটুখানি ভাবিল। শেষে বলিল, "হ্যাঁ, তা বটে। আচ্ছা, চল, আমি নিজেই তোমায় সঙ্গে করে' রেখে আসবো। রামবাগানে যে ডোমপাড়া আছে, সেই ডোমপাড়ায় আমাদের ক'জন আত্মীয়লোক থাকে। তাদের ধরে, তোমার একটা ঠায় ঠিকানা করে দিয়ে আমি আসবো।"

নীরদা দেখিল, হীরু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহার হাত হইতে নিস্তারের কোনই আশা নাই। তখন সে বলিল, "আচ্ছা, তাই চল তবে।"

হীরু বলিল, "তোমার স্বামীকে যা ঘুমের ওষুধ দিয়েছি, সে ঘুম

সহজে এখন ভাঙবে না। কাল বেলা ৮টা ৯টা পর্য্যন্ত খুব ঘুমোবে। তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার ঘরে গিয়ে তোমার কাপড়-চোপড় গয়না-গাঁটিগুলো বের করে নাওগে। আমি কিন্তু ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবো।"

"কেন ?"

"পাছে তুমি তোমার স্বামীর গায়ে হাত দাও, কি পালাও।"

নীরদা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল। হীরু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বারান্দায় উঠিয়া, ঠিক দরজা আগলাইয়া দাড়াইয়া রহিল। খাটের উপর দেখিল, ছেলেটিকে পাশে লইয়া, বিনোদ নাসিকাগর্জ্জন পূর্ব্বক অঘোরে ঘুমাইতেছে।

নীরদা বাক্স পেটরা খুলিয়া নিজ বস্ত্রালঙ্কার বাহির করিয়া একটি পুঁটুলিতে বাঁধিতে লাগিল।

হীরু বলিল, "এই নাও, তোমার বালা নাও, আর চল্লিশ টাকা— পুঁটুলিতে বেঁধে নাও। দশটা টাকা আমি রাখলাম পথখরচের জন্যে।"

নীরদা দ্বারের কাছে আসিয়া টাকা ও বালা লইল। পুঁটুলি বাঁধা হইলে, সেটি কাঁধে করিয়া হীরুর সহিত বাহির হইল।

হীরু, নীরদাকে লইয়া, প্রথমে নিজ কুটিরে আসিল। বাক্স খুলিয়া সাফ ধুতি বাহির করিয়া পরিল, বহুকালের একটি পিরাণ ছিল তাহা গায়ে দিল, একখানি উড়ানি চাদর ছিল তাহা মাথায় বাঁধিল। জুতা পায়ে দিয়া, ছাতা লইয়া, ঘরে দ্বারে কুলুপ দিয়া নীরদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষ্টেশনের দিকে চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে বিনোদ স্ত্রীকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাহার অন্বেষণে ব্যাপৃত হইল। ছেলেটা মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে বিনোদ, অভাগিনীর পদস্খলনের বৃত্তান্ত অবগত হইল, কিন্তু সেই রাত্রে কাহার সহিত কোথায় যে নীরদা অন্তর্দ্ধান করিল, তাহার সে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

এ ঘটনার পর গ্রামে আর বাস করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, বাস্তু-ভিটা ও জমিজমা আধাকড়িতে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া, ছুটি অন্তে ছেলেটিকে লইয়া বিনোদ অমৃতসর চলিয়া গেল। সেখানে বন্ধুবান্ধবের নিকট স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিল। ছেলেটির কষ্ট দেখিয়া পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসেই অমৃতসরপ্রবাসী একজন সদ্‌ব্রাহ্মণ বাঙ্গালীর কন্যাকে সে বিবাহ করিল। তদবধি বিনোদ সেইখানেই বাস করিতেছে। চাকরিতে তাহার উন্নতি হইয়াছে; নিজের একখানি বাড়ীও সেখানে নির্ম্মাণ করিয়াছে শুনিতে পাই।

পোষ্ট মাষ্টার

খড়ে ছাওয়া গ্রাম্য পোষ্ট অফিসের ভিতরে, নড়বড়ে টেবিলের সামনে, হাতভাঙ্গা চেয়ারের উপর, বেগুনে রঙের আলোয়ান গায়ে ঐ যে যুবকটি বসিয়া কায করিতেছে, ওই এখানকার পোষ্ট মাষ্টার বা ডাকবাবু বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিতেই, বাহিরে ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনা গেল: 'রাণার্' ডাক লইয়া আসিয়াছে। রাণার্ প্রবেশ করিয়া ডাকের ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিল; বাবুকে প্রণাম করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। ডাকবাবু ব্যাগের শিলমোহর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। রাণার্ তখন 'তামুক' খাইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

অফিস গৃহ এখন জনশূন্য। পিয়নেরা রান্না খাওয়া সারিয়া লইতেছে—খানিক পরেই আসিয়া জুটিবে, এবং নিজ নিজ বীটের চিঠি মনিঅর্ডার, রেজিষ্টারি প্রভৃতি বুঝিয়া লইবে। ব্যাগটি কাটিয়া বিমল উহা টেবিলের উপর উবুড় করিয়া ধরিল। চিঠিপত্র পার্শেল প্রভৃতির সঙ্গে, একটা প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের পাঁচ ছয়টা বিভিন্ন প্যাকেটও বাহির হইল। একটা প্যাকেট লইয়া বিমল তাহার দেরাজের মধ্যে রাখিল। (ইহা সে বাসায় লইয়া যাইবে এবং আহারাদির পর শয়ন করিয়া, খুলিয়া গল্প ও প্রেমের কবিতাগুলির রসাস্বাদন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবে।) তারপর চিঠির গাদা পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতে ৪।৫ খানি বাছিয়া লইয়া, দেরাজের মধ্যে লুকাইল। এগুলি সমস্তই খামের চিঠি এবং পুরুষের হস্তাক্ষরে স্ত্রীলোকের নামে ঠিকানা লেখা। এগুলিও সে বাসায় লইয়া গিয়া, জল দিয়া খুলিয়া পাঠ করিবে;—শুধু প্রেমের গল্প কবিতা নয়, প্রেমের চিঠি পড়িতেও বিমল অত্যন্ত ভালবাসে। এটা সে একটা নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়াই মনে করে; কারণ, চিঠিগুলি সে নষ্ট করে না, আবার

জুড়িয়া, পরদিন ছাপমোহর লাগাইয়া, বিলির জন্য দিয়া থাকে। ছয়মাসের অধিক কাল বিমল এখানে আসিয়াছে—প্রত্যহই এইরূপ চিঠি অপহরণ করে;—এটা তাহার একটা নেশার মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

সাড়ে দশটা বাজিল; পিয়নেরা একে একে আসিয়া টেবিলের উভয় পার্শ্বে বসিয়া গেল। বিমল তাহাদের বিভিন্ন গ্রামের পত্রাদি বণ্টন করিয়া দিতে লাগিল; এই অবসরে আমরা এই মহাপুরুষের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পরিচয় দিয়া রাখা উচিত বিবেচনা করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিমলের নিবাস যশোহর জেলার কোনও এক গণ্ডগ্রামে। তথায় একটি হাই স্কুল আছে—সেই স্কুলের উপরের ক্লাসগুলির প্রত্যেকটিতে দুই তিন বৎসর করিয়া কাটাইয়া বিমল যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার গোঁফদাড়ি বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং বয়স হইয়াছে ২২ বৎসর। গ্রামের লোকে সে সময় বলিয়াছিল, 'বিমল যে দিন পাস হবে, সেদিন পূবের সূয্যি পশ্চিম দিকে উঠবে।' এইরূপ মন্তব্যের যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল। গ্রামের যত বকাটে ছোকরাই ছিল বিমলের বন্ধু; সখের থিয়েটার দলের সেই ছিল প্রধান পাণ্ডা, এবং গঞ্জিকা সেবন ত অনেকদিন হইতেই চলিতেছিল, ইদানীং থিয়েটারের রিহার্সালে যে বোতলও গোপনে আমদানী হইত, তাহারও বিশ্বাসজনক প্রমাণ আছে।

কিন্তু যে ঘটনা অভাবনীয়, তাহাই ঘটিয়া গেল, গেজেট বাহির হইলে দেখা গেল, বিমল তৃতীয় বিভাগে পাস হইয়াছে,—অথচ সূর্য্যদেব গ্রামের লোকের ভবিষ্যদ্বাণীর কোনও খাতিরই করিলেন না।

বিমল ছোকরাটি দেখিতে বেশ সুপুরুষ, কিন্তু তাহার মন্দস্বভাব জন্য আজিও বিবাহ হয় নাই। সংসারে তাহার মা ও জ্যেঠাইমা (উভয়েই বিধবা), একটী ছোট ভাই, একটী বিধবা ভগিনী এবং দুইটী

জেঠতুতো ভাই বর্ত্তমান। বড়টি স্থানীয় জমিদারী কাছারীতে সামান্য বেতনে মুহুরীনবীশের কর্ম্ম করে—ছোট ভাই দুটী স্কুলে পড়ে। বিমলেরও এখন অর্থোপার্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল—সামান্য যাহা জোৎজমা আছে তাহাতে সংসার চলে না। তাহার এক আত্মীয়ের সঙ্গে, ২৪ পরগণার পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল; তাঁহারই সুপারিশে সে ডাক বিভাগে কর্ম্ম পায়। আলিপুরের হেড আপিসে বৎসর খানেক শিক্ষানবিশী ও একটিনি করিয়া, আজ ছয় মাস হইল সে এই মহেশপুর ডাকঘরের সাব পোষ্ট মাষ্টার হইয়া আসিয়াছে।

হেড আপিসে থাকিতে পাঁচজন উপরওয়ালার অধীনস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে বিমলের মোটেই ভাল লাগিত না। এখানে আসিয়া সে স্বাধীন হইয়াছে। সরকারী বাসাটি ভাল, পিয়নেরা আজ্ঞাকারী, খাদ্যদ্রব্যাদি সুলভ, এমন কি, পল্লীগ্রাম হইলেও এখানে "বিলাতী" পাওয়া যায়—তবে সোডা পাওয়া যায় না, জল মিশাইয়া খাইতে হয়, এই যা একটু অসুবিধা। সুতরাং মোটের উপর বিমল এখানে ভালই আছে বলিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পিয়নগণ স্ব স্ব ব্যাগ ভরিয়া পত্রাদি লইয়া রওয়ানা হইয়া গেলে, বিমল অপহৃত মাসিক পত্রখানি ও চিঠিগুলি হাতে করিয়া আপিস ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাতে তালাবন্ধ করিল। বাসায় প্রবেশ করিয়া উঠান হইতে বলিল, "বামুন মা, রান্না কতদূর?"

একজন বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ বিধবা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "রান্না আমার শেষ হয়েছে, তুমি চান করে এস বাবা।"

ইঁহার বাড়ী এই পাড়াতেই, বড় গরীব, মাত্র চারিটি টাকা বেতনে বিমলকে দুই বেলা রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যান।

বিমল নিজ ঘরে গিয়া, চিঠিগুলি ও মাসিক পত্রখানি বালিশের নীচে গুঁজিয়া, কোট প্রভৃতি খুলিয়া রাখিয়া, একটা শিশি হইতে কিঞ্চিৎ

তেল-ঢালিয়া মাথায় দিয়া, সাবান গামছা ও বস্ত্র লইয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেল। স্নান করিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়খানি শুকাইতে দিয়া, জামা পরিয়া, আসি চিরুণী ও বুরুষ লইয়া পরিপাটিরূপে নিজ কেশ সংস্কার করিল। তারপর রান্নাঘরের বারান্দায় বিছানো আসনখানির উপর বসিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

বিমলকে খাওয়াইয়া বামুন মা যখন চলিয়া গেলেন তখন বেলা প্রায় ১২টা। বিমল পাণ চিবাইতে চিবাইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া, শয়ন ঘরে প্রবেশ করিল। এক গেলাস জল ও একখানি ছুরী লইয়া, শয্যাপার্শ্বস্থ (সরকারী) ছোট টেবিলখানির উপর রাখিয়া, বিছানায় বসিয়া, বালিশের তলা হইতে মাসিক পত্র ও চিঠিগুলি বাহির করিল। জলে আঙ্গুল ভিজাইয়া, প্রত্যেক চিঠির মুখে বেশ করিয়া বুলাইয়া সেগুলি সারবন্দি টেবিলের উপর রাখিয়া মাসিক পত্রখানির মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিল। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কোনও চিঠির মুখের জল শুষ্ক হইয়াছে কি না। মাঝে মাঝে সেগুলির মুখ আবার ভিজাইয়া দিতে লাগিল। যখন বুঝিল, এইবার সময় হইয়াছে, তখন মাসিক পত্রখানি রাখিয়া ছুরীর ফলা চিঠির মুখে ঢুকাইয়া উল্টাদিকের চাপ দিয়া একে একে চিঠিগুলি খুলিয়া ফেলিল।

প্রথম চিঠিখানি বাহির করিয়া দেখিল, তাহার সহিত একখানি দশ টাকার নোট। বিমল আপন মনে বলিয়া উঠিল, 'বাঃ, আজ বউনি হল মন্দ নয়!' নোটখানি বালিশের তলায় গুঁজিয়া রাখিয়া চিঠির ভাঁজ খুলিল। 'প্রাণেশ্বরী' বলিয়া সম্বোধন। বিমল সাগ্রহে চিঠিখানি পড়িতে লাগিল। কলিকাতা প্রবাসী বিরহী স্বামী স্ত্রীর বিরহ যন্ত্রণার অনেক বর্ণনা করিয়াছে; লিখিয়াছে বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী আসিয়া তাহার হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধরিয়া সকল জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে পারিবে—সে জন্য দিন-গণনা করিতেছে। প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়া, খোকার দুধ খরচের জন্য ১০টি টাকা পাঠাইতেছে।

এ ব্যক্তির আরও কয়েকখানি পত্র ইতিপূর্ব্বে বিমল পাঠ করিয়াছিল—সে জানিত, লোকটি কলিকাতায় চাকরির জন্য উমেদারী করিতেছিল।

এ পত্রখানি রাখিয়া, বিমল দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিল। 'পূজনীয়া পিসিমা!' সম্বোধন দেখিয়া—"ধূত্তোর" বলিয়া সক্রোধে চিঠিখানি বিছানার উপর ফেলিয়া, তৃতীয় পত্রখানি উন্মোচন করিল।

এই লোকের চিঠিও মাঝে মাঝে বিমল পড়িয়াছে—তাহা হইতে ইহাদের পূর্ব্বকথা কিছু কিছু সে অবগত ছিল। মেয়েটির নাম চারুশীলা—সে বিধবা, বোধ হয় বালবিধবা। এই মহেশপুর গ্রামের দক্ষিণে রসুলপুরে তাহার বসতি—খুব সম্ভব ঐ স্থানে তাহার শ্বশুরালয়। তাহার পিত্রালয় কলিকাতায়;—কলিকাতা নিবাসী এই পত্রলেখকের সহিত তাহার প্রণয় সংঘটিত হয়। পত্রলেখককে পত্রশেষে কখনও নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না—সে সহি করে—'তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী', 'তোমার ভালবাসা', 'তোমার সে'—এইরূপ সব মাথামুণ্ড। বিগত ৩।৪ মাস হইতে ইহাদের এইরূপ প্রেমপত্র চলিতেছে—তবে মেয়েটির লেখা চিঠি বিমল কখনও দেখিবার সুযোগ পায় নাই,—নাম না জানাতে, রওয়ানা চিঠিগুলির মধ্য হইতে সেখানি বাছিয়া বাহির করা শক্ত বলিয়াও বটে; এবং সময় পাওয়া যায় না বলিয়াও বটে,—কারণ ভিন্ন গ্রামের ডাকবাক্স হইতে পিয়নের চিঠি ঝাড়িয়া আনিবার সময় ডাকঘরে অনেক লোকজন থাকে, ছাপমোহর দিয়া ব্যাগ ভর্ত্তি করিবার ধুম পড়িয়া যায়।

বিমল সাগ্রহে পত্রখানি পাঠ করিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

কলিকাতা

২২শে অগ্রহায়ণ

আমার হৃদয়েশ্বরী,

গতকল্য তোমায় একখানি পত্র লিখিয়াছি—তাহা তুমি পাইয়া থাকিবে। তাহাতে লিখিয়াছিলাম, আমি আগামী শনিবার দিন গিয়া তোমায় লইয়া আসিব। কিন্তু শনিবারে যাওয়ার সুবিধা করিতে পারিলাম না। পরদিন অর্থাৎ রবিবার দিন আমি নিশ্চয় যাইব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তুমি পূর্ব্ব পরামর্শ মত, রাত্রি ঠিক ১২টার সময় তোমাদের বাড়ীর পশ্চিমে সেই শিবমন্দিরের

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে—আমি মন্দিরের পার্শ্বস্থ সেই বটবৃক্ষের ছায়ায় লুকাইয়া থাকিব; এবং তুমি আসামাত্র তোমাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিব। যানবাহনাদির কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিব তাহা এখন বলিতে পারি না—হয় ত হাঁটিয়াই উভয়ে ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে উঠিব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আইন অনুসারে আমাদের বিবাহের সমস্ত আয়োজন আমি করিয়া রাখিয়াছি—পুরোহিতও ঠিক হইয়াছে—সোমবার দিন আমি যথাশাস্ত্র তোমার পাণি-গ্রহণ করিব। এ সম্বন্ধে আমি উকীল ব্যারিষ্টারগণের পরামর্শ লইয়াছি। তাঁহারা বলেন, যদি তোমার শ্বশুরকুলের কেহ, এই লইয়া আমার উপর মামলা মোকর্দ্দমা করিতে উদ্যত হয়, তবে তোমার বয়স ১৬ বৎসরের অধিক হইয়াছে এবং স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে আসিয়াছিলে, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেই, কেহ আর আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। সেইজন্য আমি জন্মমৃত্যু রেজেষ্টারি অপিস হইতে তোমার জন্ম-দিনের সার্টিফিকেটের নকল পর্য্যন্ত আদায় করিয়া আনিয়াছি। সুতরাং সকল দিকেই আটঘাট বাঁধা রহিল। রবিবার সন্ধ্যার ট্রেণে আমি রওয়ানা হইয়া ষ্টেশনে নামিয়া, রাত্রি দশটার মধ্যেই তোমাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিব। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, গৃহের বাহির হইও—আশা করি তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের মিলনের পথ হইতে সকল বাধাবিঘ্ন অপসারিত হইবে।

অধিক আর কি লিখিব। আমার শূন্য গৃহে আসিয়া তুমি লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হও—আমার শূন্য হৃদয়ে বসিয়া আমায় চিরসুখী কর। ইতি—

তোমার (মন) চোর

এই পত্রখানি পড়িয়া বিমল আপন মনে বলিয়া উঠিল—'কি চমৎকার! এ যে রীতিমত একটা নভেলী ব্যাপার! বাঃ—বাঃ—ক্যা মজাদার! ক্যা তোফা। বাহবা চারুশীলা—ব্রাভো! জিতা রহো বাবা—থ্রি চিয়ার্স' ফর চারুশীলা। বেশ বেশ—বরের কাছে তুমি যাবে—মাইকেল ত বিধানই দিয়ে গেছে—'যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে'—ব্রজাঙ্গনা কাব্য দেখহ! গড্ ব্লেস্ দি হ্যাপি পেয়ার্—তোমাদের বিয়েতে আমায় নেমতন্ন করবে না বাবা? লুচি খেয়ে আসতাম!'

অতঃপর বিমল বাকী পত্র দুইখানি পড়িয়া দেখিল। এ দুইখানিই মামুলি স্বামীর মামুলি প্রেমের চিঠি—তাহাতে প্রেমের চেয়ে ঘরকন্নার কথাই বেশী—কোনও বিশেষত্ব নাই। বিমল এই ছয় মাসের মধ্যে বৈধ ও অবৈধ সহস্রাধিক প্রেমপত্র পড়িয়াছে, সে জানে বৈধ প্রেমের চিঠি অপেক্ষা, অবৈধ প্রেমের চিঠিতেই "মজা" বেশী থাকে; পত্রগুলি আবার জুড়িয়া রাখিয়া, বিমল মাসিক পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে ক্রমে উহা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল; সে তখন পাশ ফিরিয়া পাশের বালিশে পা দিয়া আরামে ঘুমাইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নকালে বিভিন্ন গ্রাম হইতে পিয়নেরা ফিরিয়া আসিলে বিমল তাহাদের নিকট হইতে মনিঅর্ডার, রেজিষ্টারি প্রভৃতির রসিদ বুঝিয়া লইয়া, খাতাপত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। কার্য্যশেষ হইলে, ভৃত্যকে বলিল, "ওরে, যা দেখি, হরেন সা'র দোকান থেকে এক বোতল "বিহাইব্" নিয়ে আয়। চাদরের ভেতর বেশ করে লুকিয়ে আনবি—বুঝেছিস? আর করিমদ্দিকে আমার কাছে ডেকে দিয়ে যাস"—বলিয়া বিমল, সরকারী তহবিল হইতে ভৃত্যের হস্তে ছয়টি টাকা দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে পিয়ন করিমদ্দি সেখ আসিয়া বলিল, "হুজুর ডেকেছেন?"

বিমল বলিল, "হ্যাঁ। আজ একটা ফাউলের কারি বানিয়ে দিতে পারবে হে শেখের পো?"

করিম বলিল, "কেন পারবো না হুজুর?"

"আচ্ছা—এই টাকা নাও। বেশ মোটা তাজা দেখে একটা মুরগী কিনে এনো। বেশ করে' লঙ্কাবাটা দিও—আমরা বাঙ্গাল মানুষ, ঝালটা কিছু বেশী খাই।"—বলিয়া বিমল ক্যাশ হইতে তাহাকেও একটি টাকা দিল।

কাজকর্ম্ম শেষ হইলে, ক্যাশ হইতে আর তিনটি টাকা লইয়া,

দ্বিপ্রহরে লব্ধ সেই দশ টাকার নোটখানি ক্যাশে রাখিয়া ক্যাশ পূরণ করিল। ক্যাশ মিলাইয়া তাহা লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া, আপিস ঘরে চাবি দিয়া বিমল বাসায় গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বামুন মাকে দেখিয়া বলিল, "মা, আজ শরীরটে কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে, আজ রাত্রে আর ভাতটা খাব না, খানকতক পরোটা ভেজে রেখে যেও। তরকারী-ফরকারী বেশী কিছু দরকার নেই—খানকতক আলুভাজা হলেই চলবে।"—বলিয়া সে মুখহাত ধুইতে চলিয়া গেল। (মাঝে মাঝে—বিশেষ বেতন পাইবার পর দুই চারিদিন বিমলের এরূপ গা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করিয়া থাকে—এবং রাত্রে ভাতের পরিবর্ত্তে লুচি বা পরোটা ফরমাস করে।)

মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া বিমল এক পেয়ালা চা পান করিয়া, পাণ মুখে দিয়া ঘোষেদের বৈঠকখানায় পাশা খেলিতে গেল—প্রত্যহই এইরূপ যায়।

রাত্রি ৮টা বাজিতেই বামুন মা পরোটা ও আলুভাজা বিমলের শয়ন ঘরে ঢাকিয়া রাখিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে বিমল বাসায় আসিয়া রামচরণ ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "করিমদ্দি এসেছিল?"

রামচরণ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ রেখে গেছে।"—বিমল দেখিল একটি এনামেলের বড় বাটীতে তাহার আকাঙ্ক্ষিত ফাউল কারি ঢাকা রহিয়াছে।

বিমল তখন ভৃত্যকে রাত্রের মত বিদায় দিয়া, সদর দরজা বন্ধ করিয়া, শয়ন ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেওয়ালে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছিল—তাহার আলো বাড়াইয়া দিয়া যথাস্থান হইতে বোতল, গ্লাস এবং 'কাক ইস্কুরু' বাহির করিয়া, শয্যাপার্শ্বস্থ (সরকারী) টেবিলের উপর রাখিল; জুতা মোজা ত্যাগ করিয়া, বিছানার ধারে বসিয়া বোতলটি খুলিয়া ফেলিল।

এক গ্লাস পান করিয়া, বেহালাটি পাড়িয়া তাহাতে ছড়ি দিতে লাগিল। একটা গৎ বাজাইয়া আর এক গ্লাস পান করিয়া, বেহালা যথাস্থানে রাখিয়া ভাবিল, সেই মজার চিঠিখানা আর একবার পড়িতে হইবে। দেওয়াল-আলমারি খুলিয়া, চিঠিগুলি বাহির করিয়া, চারুশীলার খানি বাছিয়া লইয়া বলিল—"এঃ, জুড়ে ফেলেছি যে দেখছি! কুছ পরোয়া নেই—ফের খুলবো!"—বলিয়া টলিতে টলিতে বিছানায়

আসিয়া বসিল। চিঠিখানিকে সামনে ধরিয়া বলিল, "কি চাঁদ, জল খাবে? না ব্র্যাণ্ডি?"—বলিয়া গেলাসে খানিক ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া, আঙুলে একটু লইয়া চিঠির মুখ ভিজাইয়া বলিল, "যা বেটা, তোর চিঠিজন্ম সাথক হ'য়ে গেল।" পরে ব্র্যাণ্ডিটুকু পান করিতে করিতে, চিঠিখানি খুলিতে চেষ্টা করিতেই উহার মুখ ছিঁড়িয়া গেল। চিঠিখানি উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ছিঁড়ে গেলি? কাল বিলি হবি কি ক'রে রে শালা?"—বলিয়া খাম হইতে চিঠি বাহির করিয়া, খামখানা ছিঁড়িয়া মেঝের উপর ফেলিয়া বলিল "জাহন্নামে যাও!" চিঠি খুলিয়া পড়িল—"আমার হৃদয়েশ্বরী!" চিঠি রাখিয়া নিজ বক্ষে হাত দিয়া, চক্ষু মুদিয়া অভিনেতার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল—"হৃদয়েশ্বরী!—হৃদয় জ্বলে গেল,—পুড়ে গেল,— খাক্ হয়ে গেল! আর একটু খাই"—বলিয়া চক্ষু খুলিয়া, গেলাসের বাকীটুকু পান করিয়া, পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু জিহ্বা তখন তাহার জড়াইয়া আসিয়াছে। তা ছাড়া, নেশা হইলে, সে আর 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না—'স' স্থানে 'ছ' বলিত। একটি একটি কথায় জোর দিয়া পড়িতে লাগিল—

"কিন্তু ছনিবারে, যাওয়ার ছুবিধা করিতে—পারিলাম না। পরদিন অর্থাৎ রবিবারে—আমি নিচ্চয় যাইব তাহাতে কোন ছন্দেহ নাই। তুমি—পূর্ব্ব পরামর্ছ মত—রাত্রি ঠিক ১২টার ছময়—তোমাদের বাড়ীর পচ্চিমে ছেই ছিবমন্দিরের ছম্মুখে আছিয়া দাঁড়াইবে।"

চিঠি রাখিয়া, আর কিঞ্চিৎ পান করিয়া, গম্ভীর মুখে কি ভাবিতে লাগিল; অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল—"এ চিঠি ত তুমি পাবে না মণি! খামখানাই যে ছিঁড়ে ফেলেছি। আগেকার চিঠি মত—তুমি ছনিবারে রাত বারটায় এছে ছিবমন্দিরের কাছে দাঁড়াবে ত? তার আছাপথ চেয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—অবছেছে ক্লান্ত হয়ে বছে পড়বে—বছে বছে ক্রমে ছুয়ে পড়বে। কিন্তু ছে ত হায় আছবে না। অল্‌রাইট—আমি যাব, আমি গিয়ে তোমায় বলবো—

উঠ উঠ হে ছুন্দরী,
তব পদছ্‌পচ্ছ যোগ্য নহে এ ধরণী!
তুমি কেন ধূলায় পতিত?

তুমি চল—আমার ছঙ্গে চল। ছল ছখি, তুমি আমার হৃদয়েচ্ছরী হবে। হৃদয়ের চ্ছরী—না ছুরি? হৃদয়ের ছুরি হোয়ো না দোহাই বাবা, ছাত দোহাই তোমার!"—বলিয়া চক্ষু খুলিয়া, আপন রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া একটু হাসিল। গ্লাসের বাকীটুকু পান করিয়া ফেলিয়া আবার চিঠিখানি লইয়া পড়িতে বসিল। পড়িল—

"আমার ছুন্য গৃহে আছিয়া, তুমি লক্ষীরূপে অবতীর্ণা হও। আমার ছুন্য হৃদয়ে বছিয়া আমায় চিরছুখী কর। ভগবানের নাম ছরণ করিয়া গৃহের বাহির হইও—আছা করি তাঁহার আছীর্ব্বাদে আমাদের মিলনের পথ হইতে ছকল বাধাবিঘ্ন অপছারিত হইবে।"

চিঠি রাখিয়া বিমল বলিতে লাগিল—"উত্তম কথা!—কিন্তু দাদা, তোমারই হৃদয় কি ছুন্য? আমারও যে তাই ভাই! আমার ছব ছুন্য ছব ছুন্য! আমার হৃদয় ছুন্য—প্রেম নেই; গৃহ ছুন্য—ইছ্তিরি নেই—বাক্ছো ছুন্য, টাকা নেই! আমার ছব ছুন্য—মহাব্যোম—ব্যোম ভোলানাথ—ছনিবার রাত বারটায় আমি যাব—তোমার মন্দিরের কাছে বটগাছের নীচে আমি লুকিয়ে থাকবো—চারুছীলাকে নিয়ে এছে, আমার ছুন্য গৃহ, ছুন্য হৃদয় পূর্ণ করবো। তুমি হচ্চ বিঘ্ন বিনাছনের বাপ—তাকে ছাবধান করে দিও—যদি কোনও বাধা বিঘ্ন ঘটে—তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্তুরকে এর জন্যে রেছ্পান্ছিবিল্ হতে হবে—এই ছাপ্ কথা আমি বলে রাখলাম।"—বলিয়া বিমল বীররসের সহিত বিছানায় এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া চক্ষু খুলিল। আর খানিকটা সুরা ঢালিয়া, জল মিশাইয়া পান করিয়া, হাত নাড়িয়া বক্তৃতার সুরে বলিতে লাগিল, "লেডিজ্ এণ্ড জেনেল্মেন্, তোমরা ভাবছো—মাতালছ্য নানাভঙ্গি—এখন এ বেটা মদের খেয়ালে এই ছব বলছে—কাল এছব কিছুই মনে থাকবে না। তা নয় তা নয়—হাম যায়েঙ্গা।—আলবৎ যায়েঙ্গা।—ঢেকে যায়েঙ্গা—আমায় চিনতে পারবে না। তার পর এই বাছায় এনে তাকে বন্দিনী। আদরে যত্নে মিছ্টি কথায় তিরিলোককে বছীভূত করতে কতক্ষণ?—আর আমার এ চেহারাটাও কি কোনও কাযে লাগবে না?—এখন একটু ছোয়া যাক।"—বলিয়া মাতাল বিছানায় দেহ লুটাইয়া দিয়া, নিদ্রাঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল।

কোথায় রহিল তার পরোটা—আর কোথায় রহিল তার সাধের কাউল কারি!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খামের উপর শ্রীমতী চারুশীলা দাসী ঠিকানা লেখা থাকিলেও, এবং রসুলপুর গ্রামে যথার্থই একজন চারুশীলা দাসী থাকিলেও, পত্রখানি তাহার জন্য উদ্দিষ্ট নহে। তাহার নামেই পত্র আসে বটে, কিন্তু পত্র না খুলিয়াই, চারুশীলা সেখানি কাগজের মধ্যে লুকাইয়া পাশের বাড়ীতে তাহার প্রিয়সখী বনলতাকে দিয়া আসে। ইহাই গোপন বন্দোবস্ত। সব কথা তবে খুলিয়াই বলি।

বনলতা বনে জন্মগ্রহণ করে নাই—খাস কলিকাতা সহরে তাহার মাতুলালয়ে জন্মিয়াছিল। বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া বনলতা মামার বাড়ীতেই মানুষ হইতে থাকে। মামা বড়লোক ছিলেন, নিজের মেয়েদের সঙ্গে বনলতাকেও ভালরূপ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বজাতীয় একটি যুবক কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িত—তাহার সহিত বনলতার বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু মাস কয়েক পরেই সেই হতভাগ্য যুবক কালকবলিত হয়। বনলতার মামা, অভাগিনী ভাগিনেয়ীকে আরও লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। গত বৎসর উইল করিয়া তাহাকে বিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়া ইহধাম হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

যে লোকটি 'তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী' 'তোমার মনচোর' ইত্যাদি বলিয়া চিঠি সহি করে, তাহার নাম নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ইঁহাদেরই জ্ঞাতি। সে লোকটিও সুশিক্ষিত এবং উদারমতাবলম্বী। ব্রহ্মদেশে সেগুন কাঠের তাহার বিস্তৃত কারখানা আছে—কলিকাতায় তাহার ব্র্যাঞ্চ আছে। বনলতার মামার শ্রাদ্ধ উপলক্ষেই বম্মা হইতে নরেন কলিকাতায় আসে এবং বিধবা বনলতার সহিত পরিচিত হয়। তাহাদের বাড়ী ভিন্ন হইলেও, প্রত্যহই এ বাড়ীতে সে আসিতে লাগিল এবং এসব ক্ষেত্রে

যাহা হয়—প্রথমে আঁখি মজিল, তারপর মন মজিল। ব্যাপার অবগত হইয়া বনলতার মামাতো ভাইয়েরা, নরেনের সহিত তাহার বিধবা-বিবাহ দিতেও কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এই খবর কাকমুখে রসুলপুর গ্রামেও আসিয়া পৌছিল। উইলের সংবাদও পূর্ব্বে পৌছিয়াছিল। বনলতার শ্বশুর কলিকাতায় গিয়া বনলতার মামাতো ভাইয়ের উপর উকিলের চিঠি দিয়া, মহা হাঙ্গামা করিয়া, পুত্রবধূকে "উদ্ধার" করিয়া আনেন।

রসুলপুরে আসিয়া বনলতা প্রথমে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। মাস খানেক পরে পাশের বাড়ীর সমবয়সী চারুশীলার সহিত তাহার সখিত্ব জন্মে। চারু তাহার স্বামীর অভিমতে, বনলতার সহিত তাহার হস্তাকাঙ্ক্ষীর পত্রবিনিময়ে এইভাবে সহায়তা করিতে সম্মত হয়।

অপহৃত পত্রখানিতে লেখা ছিল, 'গতকল্য তোমায় পত্র লিখিয়াছি যে, শনিবার রাত্রে গিয়া তোমায় লইয় আসিব।' সে পত্রখানি যথাসময়ে চারুর হস্তগত হয়, এবং যথানিয়মে বনলতাকে সেখানি সে দিয়াও আসে। অন্যান্য পত্র, বনলতা পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত। কিন্তু এ পত্রখানিতে সময় তারিখ ইত্যাদি লেখা ছিল বলিয়া, বাক্সে লুকাইয়া রাখে। বনলতার শ্বাশুড়ী তাহাকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। তাহার অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে তিনি তাহার বাক্স পেটরা গোপনে খানাতল্লাসীও করিয়াছেন—কিন্তু এ পর্য্যন্ত "দোষজনক" কিছুই পান নাই। এই পত্রখানি পৌছিবার পর দিন, দ্বিপ্রহরে বনলতা চারুশীলাদের বাড়ী গিয়াছিল—সেই সুযোগে তাহার শ্বাশুড়ী অন্য চাবি দিয়া তাহার বাক্স খুলিয়া, পত্রখানি পাঠ করেন এবং স্বামীকে দেখান। স্বামী বলেন, "আচ্ছা, আসুক না পাজি, তাকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া যাবে।"

শনিবার দিন বনলতার শ্বশুর তাহার দুইজন বন্ধুকে রাত্রে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। শ্বাশুড়ী, নানা অছিলায়, রান্নাবান্নায় বিলম্ব করিলেন। অতিথিদ্বয়ের আহার যখন শেষ হইল, রাত্রি তখন ১১টা।

অন্য দিন রাত্রি ১০টা না বাজিতেই বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়ে। আজ বনলতা ছটফট করিতেছে, কিন্তু বাড়ীর সকলে

জাগিয়া; শাশুড়ী-ননদেরা তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছেন। ওদিকে বৈঠকখানা হইতে ১২টার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, বনলতার শ্বশুর, তাঁহার বন্ধুদ্বয় সহ, লাঠি ও দড়ি সঙ্গে লইয়া, শিব মন্দিরের পশ্চাতে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই, ওভারকোট গায়ে, মাথায় মুখে কম্ফটার জড়ানো, বিমল ধীরে ধীরে আসিয়া বটবৃক্ষের অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়াইল। ক্ষণ-পরেই তিন জন লোক আসিয়া তাহার মাথায়, পার্শ্বে, বুকে, পদদ্বয়ে লাঠি, কিল, চড়, ঘুসি ও লাথি মারিতে মারিতে তাহাকে মাটীতে পাড়িয়া ফেলিল। প্রহারের চোটে তৎপূর্ব্বেই বিমল সংজ্ঞাহীন হইয়াছিল।

লোক তিনজন তখন, অচেতন বিমলের হস্তপদ উত্তমরূপে রজ্জুবদ্ধ করিল। এক ব্যক্তি কহিল, "বেটা বেঁচে আছে ত? না মরেছে?"

অপর ব্যক্তি তাহার নাকে হাত দিয়া বলিল, "না—নিশ্বাস বেশ পড়ছে।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "এখন, একে কি করা যায় বল দেখি? এই-খানেই কি পড়ে থাকবে?"

"না না—আমাদের বাড়ীর কাছে কেন? শেষকালে কি কোনও পুলিশ হাঙ্গামায় পড়বো?"

"তবে চল বেটাকে নিয়ে খানিক দূরে কোথাও ফেলে রেখে আসা যাক।"

"দেশলাইটে জ্বাল ত, লোকটা কে, দেখি?"

এক ব্যক্তি দেশলাই জ্বালিল। তিন জনেই তখন বলিয়া উঠিল, "এ কি! এ যে মহেশপুরের পোষ্ট মাষ্টার!"

দেশলাই পুড়িয়া গেল। আবার যেমন অন্ধকার তেমনই অন্ধকার।

তখন তিন জনে ফিস্ ফিস্ করিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল। "এ বেটাই বা এখানে এল কেন? যে বেটার আসবার কথা, সেই বা এল না কেন?"

"সে যা হোক তা হোক—এখন চল একে মহেশপুরে পোষ্ট আপিসের বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে আসা যাক।"

তিনজনে তখন বিমলের অচেতন দেহ বহন করিয়া লইয়া চলিল। পল্লীগ্রামের পথ—রাত্রি দ্বিপ্রহর—রাস্তায় আলো নাই—জনমানবের সঞ্চার নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শীতে খোলা-বারান্দায় পড়িয়া থাকিয়া, ঘণ্টা দুই পরেই বিমলের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে সেই আবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া, নানারূপ উপায় ফন্দি চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্রমে ভোর হইল। একজন পিয়নকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া, বিমল ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে ডাকিল।

পিয়ন আসিয়া বলিল, "বাবু, ব্যাপার কি ?"

বিমল চিঁ চিঁ করিয়া বলিল, "ডাকাতি রে, ডাকাতি! আগে আমার প্রাণটা বাঁচা।"

সে ব্যক্তি ছুটিয়া গিয়া অন্যান্য পিয়নকে ডাকিয়া আনিল। সকলে মিলিয়া বিমলের বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিল।

বিমল বলিল, "আমার বুকপকেট থেকে চাবি নে। ডাকঘর খোল্, খুলে মেঝের উপর আমায় শুইয়ে দিয়ে থানায় খবর দিগে যা।"

পিয়নেরা তাহাই করিল। বিমল কাৎরাইতে কাৎরাইতে বলিল, "সব পিয়ন যা। দারোগা প্রথমে তোদেরই জবানবন্দি নেবে কিনা!"

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলবো হুজুর ?"

"যা জানিস—যা দেখেছিস—সবই বলবি।"

পিয়নগণ যখন চলিয়া গেল তখন বেশ ফর্সা হইয়াছে। বিমল টলিতে টলিতে উঠিয়া, সরকারী লোহার সিন্দুক খুলিল। তাহার মধ্যে নোটে টাকায় ৫৪২৲ ছিল—সেগুলি সমস্ত বাহির করিয়া, রুমালে বাঁধিয়া, বাসায় গিয়া নিজ ট্রাঙ্কে লুকাইয়া রাখিয়া, ডাকঘরের মেঝেতে পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুইদিন পরে, কলিকাতার কাগজে কাগজে ছাপা হইল—

ভীষণ ডাকাতি! পোষ্ট অফিস লুট!

বিগত শনিবার রাত্রে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামের পোষ্ট অফিসে একটি ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। পোষ্ট মাষ্টার বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাত্রি ১১টার সময় ডাকঘরে বসিয়া হিসাব মিলাইতেছিলেন, পিয়নেরা তৎপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল, সেখানে আর কেহ ছিল না। ৫।৬ জন যুবক হঠাৎ ডাকঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, রিভলভার বাহির করিয়া বলে—'খবরদার চীৎকার করিও না, গুলি করিব। লোহার সিন্দুকের চাবি দাও।' ইহাতে পোষ্ট মাষ্টার বলেন, 'তা কখনই দিব না—প্রাণ দিব, তবু সরকারের টাকা দিব না।' একজন যুবক তৎক্ষণাৎ পিস্তলের বাঁট দিয়া বিমলবাবুর মস্তকে সজোরে প্রহার করে; অপর যুবকগণ তাঁহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া, তাঁহার বুকে বসিয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলে। তারপর হস্তপদাদি রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া চাবি খুঁজিতে থাকে। চাবি পাইয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া পূর্ব্বদিনের ক্যাশ ৫৪২৲ লইয়া, সিন্দুক বন্ধ করণান্তর পোষ্ট মাষ্টারকে বাহিরের বারান্দায় শোয়াইয়া দেয়। অফিস ঘরে তালাবন্ধ করিয়া, চাবির গোছা পোষ্ট মাষ্টারের পকেটেই ভরিয়া দিয়া তাহারা পলায়ন করে। প্রকাশ, ডাকাতগণের মুখে কালো মুখস, গায়ে কালো কোট, পায়ে বুটজুতা ছিল, এবং তাহারা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তায় মাঝে মাঝে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতেছিল। এই ডাকাতী সম্পর্কে গতকল্য কলিকাতার কয়েকটি ছাত্রাবাসে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে এবং পুলিশ তিনজন যুবককে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শেষ পর্য্যন্ত ডাকাতেরা কেহই ধরা পড়ে নাই। বিমল আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া সরকারের টাকা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এই

বিশ্বাসে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট তাহাকে ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।

রবিবার রাত্রে নরেন যথাস্থানে আসিয়া, বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। বনলতা পত্রে এখানকার সমস্ত ঘটনা জানাইয়াছিল। মাসখানেক পরে, একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে, বনলতা পলায়ন করিয়া, পদব্রজে রেলের ষ্টেশনে গিয়া নরেনের সঙ্গে মিলিত হয় এবং উভয়ে কলিকাতায় চলিয়া যায়। তাহার শ্বশুর কলিকাতায় গিয়া থানায় এবং উকিল-বাড়ীতে অনেক ছুটাছুটি করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। নরেনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বি-এ পাস কয়েদী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পশ্চিমের একটি সহর। জজের আদালত, ফৌজদারী আদালত, কালেক্টরী প্রভৃতি সহরের ভিতর হইলেও, জেলখানাটি সহরের বাহিরে এক মাইল দূরে অবস্থিত। জেলের কর্ত্তা অর্থাৎ জেলর (Jailor) বাবুর নাম ইন্দুভূষণ সান্যাল—বয়স চুয়াল্লিশ বৎসর। স্ত্রীর নাম মনোরমা, বয়স আটত্রিশ। ইঁহাদের দুইটি পুত্র—নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র, বয়স পনর এবং পাঁচ বৎসর। কন্যা হয় নাই।

জেলখানার ফটকের উপর দ্বিতলে জেলরের সরকারী বাসা। পশ্চাতে টানা বারান্দা। সে বারান্দায় দাঁড়াইলে জেলখানার ভিতরটা অনেকখানি দেখা যায়। জেলরবাবুর স্ত্রী মনোরমা সকালে বিকালে সেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া জেল-প্রাঙ্গণে কয়েদিগণের আহার, গতিবিধি ও অন্যান্য কার্য্যকলাপ দেখিয়া চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন।

মনোরমার বড় কষ্ট। কোনও প্রতিবেশিনী নাই যে, আসিয়া দুই দণ্ড গল্প করিবে, দু'হাত তাস খেলিবে, অথবা চুলটা তাহার বাঁধিয়া দিবে। ডেপুটি জেলরবাবু, অ্যাসিষ্টাণ্টবাবু, জেলের ডাক্তারবাবু—সকলেই বাঙ্গালী, ইঁহাদেরও সরকারী বাসা রহিয়াছে, কিন্তু স্ত্রী নাই, বা থাকিয়াও নাই। ডেপুটিবাবু বিপত্নীক, অ্যাসিষ্টাণ্টবাবুর স্ত্রী তিন মাস হইল সন্তান-সম্ভাবিতা হইয়া পিত্রালয়ে গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন, তাহার স্থিরতা নাই, ডাক্তারবাবুর গৃহের যিনি গৃহিণী, তাঁহাকে ডাক্তারবাবু স্ত্রী বলিয়াই প্রচার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু জনশ্রুতি এই যে, বিবাহটা তাঁহাদের গান্ধর্ব্ব মতে হইয়াছিল—কাযেই উক্ত মহিলার কোনও ভদ্রপরিবারের সহিত মেলামেশা নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পিত্রালয় হইতে মনোরমা এক অনাথা কায়স্থ-কন্যাকে ঝি-স্বরূপ আনিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিল। সে প্রায়

মনোরমার সমবয়সী ছিল, তার নাম ছিল—কাতু বা কাত্যায়নী। নামে ঝি হইলেও, পূর্ব্বকালে রাজকন্যাদের যেমন 'সহচরী' থাকিত, কাতু ছিল মনোরমার সেইরূপ সহচরী। উভয়ে বেশ আনন্দেই ছিল। কিন্তু গত বৎসর কাতুর গুরুজনপদস্থ কোনও আত্মীয়ের বিনা বেতনে একটি ঝির প্রয়োজন হওয়াতে, সে ব্যক্তি অনেক স্নেহ, করুণা এবং আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কাত্যায়নীকে পত্র লেখে এবং অবশেষে পুত্র পাঠাইয়া তাহাকে লইয়া যায়।

মনোরমাকে গৃহকার্য্য বেশী করিতে হয় না। বামুন আছে, চাকর আছে, তা ছাড়া সরকার হইতে দুইজন জল-আচরণী কয়েদী পাওয়া যায়, তাহারা প্রাতে আসিয়া জল তোলে, বাসন মাজে, গ্রীষ্মকালে পাখা টানে। বিকালে পাঁচটার সময় তাহাদের অবশ্য আবার জেলে প্রবেশ করিতে হয়। সাংসারিক কাজকর্ম্ম তেমন নাই, কি করিয়া মনোরমার দিন কাটে? তার স্বামী দুইখানি মাসিকপত্রের গ্রাহক—মাসের প্রথম সপ্তাহটা সেইগুলি পড়িয়া কাটে। আর বাকী সাড়ে তিন সপ্তাহ? উপন্যাস—তাও কাল-ভদ্রে দুই একখানা কেনা হয় মাত্র। সুতরাং মনোরমার বড় কষ্ট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জেলরবাবু প্রাতে উঠিয়া চা-পানান্তে সাতটার সময় আপিসে যান, আবার সাড়ে দশ কিংবা এগারোটায় বাড়ী আসিয়া স্নানাহার করেন। তৎপরে দিবানিদ্রান্তে বেলা সাড়ে তিনটায় উঠেন এবং চারিটার সময় আবার আপিসে গিয়া দুই তিন ঘণ্টা সরকারী কার্য্য করিয়া থাকেন।

আজ আহারাদির পর মনোরমার যখন অবসর হইল, তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

মনোরমা পশ্চাতের বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া, খোলা চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া, একখণ্ড মাসিকপত্র হাতে লইয়া শয়ন করিল। চুল শুকাইবার উদ্দেশ্যেই এ সময় এভাবে তাহার শয়ন। ভিতরের ঘরে

পালঙ্কের উপর তাহার স্বামী নিদ্রিত, বড় ছেলে নগেন স্কুলে গিয়াছে, ছোট খোকা অনেক দুষ্টামি করিবার পর অবশেষে পিতার পাশে শুইয়া ঘুমাইতেছে।

মনোরমা পত্রিকার ছবিগুলি দেখা শেষ করিয়া, তার পর সূচীপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল। এ সংখ্যায় কয়টা গল্প আছে, তাহাই দেখিবার বিষয়। গল্প-সংখ্যার অল্পতা দেখিয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আপন মনে বলিল, 'পোড়ারমুখো কাগজওয়ালাদের একটু যদি আক্কেল আছে! কেবল প্রবন্ধ আর প্রবন্ধ, কচুপোড়া খাও! প্রবন্ধ নিয়ে ত মানুষ ধুয়ে খাবে! হাতীর মত কাগজখানা—তিনটি মোটে গল্প! এ পড়তে কতক্ষণই বা লাগবে?'—বলিয়া প্রথম গল্পটি পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গল্পের অর্দ্ধেকটা পড়া হইবার পূর্ব্বেই পত্রিকাখানি বুকে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা যখন আড়াইটা, তখন হঠাৎ মনোরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কে তার পায়ে হাত দিয়া নাড়া দিতেছে। চক্ষু খুলিয়া দেখিল, ঠিকাদারবাবুর স্ত্রী সরোজিনী। "ও মা তুমি!" বলিয়া মনোরমা উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "কতক্ষণ এসেছ, ভাই?"

সরোজিনী বলিল, "তা প্রায় আধ ঘণ্টা হবে।"

"আধ ঘণ্টা চুপ ক'রে ব'সে আছ? আমায় জাগালে না কেন?"

"আহা অকাতরে শুয়ে ঘুমুচ্চ, তুলতে মায়া হ'ল। শেষে যখন দেখলাম, ঘুম আর ভাঙ্গে না, তখন কি করি, অগত্যা পাপ কাযটাই ক'রে ফেললাম। তা দিদি, খবর সব ভাল ত? ছেলেপিলে ভাল আছে? দশ বারো দিন আসতে পারিনি, মেজ ছেলেটার জ্বর হয়েছিল।"

মনোরমা বলিল, "ফটিকের জ্বর হয়েছিল? কি জ্বর? কেমন আছে, এখন বেশ সেরে উঠেছে ত?"

সরোজিনী বলিল, "হ্যাঁ ভাই, এখন সেরে উঠেছে তোমাদের আশীর্ব্বাদে। সর্দ্দি-জ্বরই হয়েছিল, তবু ভাবনা ত কম হয় নি! চার দিন হ'ল জ্বরটা ছেড়েছে, কাল দু'টি মাছের ঝোল ভাত খেয়েছে। তোমাদের খবর সব ভাল ত?"

"হ্যাঁ ভাই, আমরা ভালই আছি। বোসো একটু, চোখে-মুখে জলটা দিয়ে আসি। এই মাসিকপত্রখানা ওল্টাও ততক্ষণ।"—বলিয়া মাসিকপত্র নবাগতার হাতে দিয়া মনোরমা উঠিয়া গেল।

সরোজিনী মাসিকপত্রের ছবিগুলি দেখা শেষ হইলে, কাগজ রাখিয়া বারান্দার রেলিঙের ফাঁক দিয়া জেলের প্রাঙ্গণের দৃশ্য দেখিতে লাগিল ;—বিশেষ দেখিবার তখন যদিও কিছু ছিল না। কয়েদীরা সব বাহিরে কাষ করিতে গিয়াছে, কেবল চারি জন কয়েদী প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ পুষ্করিণী হইতে ঘড়া-ঘড়া জল তুলিয়া বাঁকে ঝুলাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে, আবার খালি ঘড়া লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

সরোজিনীর স্বামী ভূতনাথবাবু এই জেলের ঠিকাদার। কয়েদীদের আহারের জন্য চাউল, দাইল, নুণ, তেল প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই তিনি সরবরাহ করিয়া, মাসান্তে জেলরবাবুর নিকট তাঁহার বিল দাখিল করেন। সরকারী হুকুম অনুসারে জেলরবাবুকে প্রতি রবিবারে সহরে গিয়া খাদ্য-দ্রব্যাদির বাজার-দর জানিয়া আসিতে হয়, তজ্জন্য তিনি গাড়ীভাড়া পাইয়া থাকেন। তিনি সেই জ্ঞান অনুসারে ঠিকাদারবাবুর বিল সংশোধনান্তে উহা পাস করেন। সুতরাং জেলরবাবুর উপর ঠিকাদারবাবুর অসীম ভক্তি। দেখা হইলেই আভূমি নত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করেন এবং অপর কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিলে, কারণে অকারণে জেলরবাবুর বিদ্যা, বুদ্ধি, ধাম্মিকতা, এমন কি তাঁহার আকৃতি অবয়বের পর্য্যন্ত অজস্র প্রশংসা করিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকগণকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, 'কি বলেন মশাই, অ্যাঁ? আমি একটি বর্ণও বাড়িয়ে বলছি?' এ দিকে আবার ঠিকাদার-গৃহিণীও, জেলর-গৃহিণীকে 'দিদি' বলিতে অজ্ঞান! বাড়ীতে গাই আছে, খাঁটি দুধের ছানা কাটিয়া সন্দেশ করিয়া আনিয়া দেয়, কুল পাকিলে কুলের আচার, কাঁচা আম উঠিলে কাসুন্দি ও আম-তেল প্রস্তুত করিয়া উপহার দেয়। বাজার হইতে উত্তম বোম্বাই আম কিনিয়া আনিয়া মনোরমাকে দিয়া বলে, 'দেশ থেকে এসেছিল, আমাদের বাগানের আম।' বাঙ্গাল-দেশের মেয়ে, ভাল সৌখীন কাঁথা সেলাই করিতে জানে, এবার জেলর-গৃহিণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইলে কাঁথা সেলাই করিতে আরম্ভ করিবে, বলিয়া রাখিয়াছে।

প্রায় দশ মিনিট পরে মনোরমা পাণের ডিবা ও দোক্তার কৌটা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "পাণ ক'টা সেজে আনতে দেরী হয়ে গেল ভাই। চাকর-বাকরের সাজা পাণ আমার মুখে রোচে না জানই ত!"

সরোজিনী বলিল, "হ্যাঁ, তা জানি বৈ কি, দিদি। কি চমৎকার যে তোমার পাণ-সাজা! যে খেয়েছে, সেই জানে। উনি কি বলেন জান? উনি বলেন, 'আমি এই যে কাযকর্ম্ম না থাকলেও, নিত্যি জেলরবাবুর বাড়ী যাই, সে কেবল গিন্নীঠাকরুণের সাজা পাণ খাবার লোভে।' আমায় বলেন, 'তুমি তাঁর কাছে ঐ রকম পাণ-সাজা শিখে এস না কেন?'. দিও ত দিদি, দু'এক দিন দেখিয়ে।"

"আচ্ছা দেবো"—বলিয়া মনোরমা মুচ্‌কি হাসিল, কারণ, নিজ হাতে পাণ সে নিজের জন্যই সাজিয়া থাকে। অতিথি অভ্যাগত ত দূরের কথা, স্বামীর পাণও সে কদাচিৎ সাজে; কিন্তু সরোজিনী অপ্রতিভ হইবে বলিয়া সে আর তাহা প্রকাশ করিল না। পাণ ও দোক্তা সেবন করিতে করিতে দুইজনে গল্প করিতে লাগিল।

দুই চারি কথার পর সরোজিনী বলিল, "ভাল মনে প'ড়ে গেল। আমাদের বাড়ীর পাশে যে উকীলবাবু আছেন না—কেদার ভটচাযি—তাঁদের দেশ থেকে একজন অনাথা স্ত্রীলোক এসে রয়েছে। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক, জাতে ব্রাহ্মণ। তার তিন কুলে কেউ নেই, দেশে থাকতে খেতে পেত না, এখানে এসেছে—যদি কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা রাঁধুনি-গিরি কাযকম্ম জোটে। উকীলবাবুর বাড়ীতে আমি ত প্রায়ই যাই কি না, উকীলবাবুর বউ, মেয়েরাও আমাদের বাড়ী আসে যায়। তোমাদের সব কথাই আমি তাদের বলেছি ত! তাই উকীলবাবুর পরিবার সেদিন বললে, 'তুমি ত জেলরবাবুর বাসায় প্রায়ই যাও, জিজ্ঞাসা কোরো না তাঁদের, তাঁরা যদি মেয়েটিকে রাখেন।'

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "বিধবা ত?"

"না, বিধবা কেন হবে? সধবা। কিন্তু স্বামী তার থেকেও নেই। সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে চলে গেছে, কোনও খোঁজ-খবর নেই।"

"কতদিন নিরুদ্দেশ হয়েছে ?"

"তা দিদি আমি জিজ্ঞাসা করিনি। পাঁচ-সাত বছর হবে বোধ হয়। না, অত হবে না—তার কোলে একটি ছেলে, তার বয়স চার বছর।"

"ছুঁড়ীর বয়স কত ?"

"আমার চেয়ে ছোটই হবে। এই আঠার উনিশ বোধ হয়। বললে, ওটি তার প্রথম সন্তান নয়—আর একটি হয়েছিল, সেটি ছ'মাসের হয়ে মারা গেছে।"

মনোরমার মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে 'আহা!' শব্দটি বাহির হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, "মানুষটা নষ্ট-দুষ্ট নয় ত ?"

সরোজিনী বলিল, "তা কি করে জানবো দিদি ? সে নারায়ণই জানেন। কিন্তু দেখে ত নষ্ট-দুষ্ট ব'লে মনে হয় না। খুব ঠাণ্ডা, মুখে কথাটি নেই, চোখ দু'টি সদাই ছল্‌ছল্‌ করছে। তা ছাড়া ধর, নষ্ট-দুষ্টই যদি হত, রাঁধুনিগিরি করতে আসবে কেন ? ভরা সোমত্ত বয়েস, দেখতেও মন্দটি নয়।"

"নাম কি তার ?"

"মোক্ষদা।"

"কোথায় বাড়ী বললে ?"

"ঐ যে উকীল বাবুদের বাড়ী যেখানে। বরিশাল জেলার কোন্ একটা গ্রাম—নামটা মনে আসছে না।"

মনোরমা একটু ভাবিয়া বলিল, "একদিন নিয়ে এস না তাকে সঙ্গে ক'রে—দেখি মানুষটা কেমন। কর্ত্তার মতটাও জিজ্ঞাসা ক'রে রাখি। তাকে আমরা রাখবো কি রাখবো না, সে কথা এখন থেকে কিছু ব'লে দরকার নেই।"

সরোজিনী বলিল, "বেশ,—তা কবে আনবো বল ? তাকে শুধু বলবো এখন, চল এক জায়গায় বেড়িয়ে আসি।"

মনোরমা বলিল, "কাল কি পরশু যে দিন হয় নিয়ে এস।"

"বেশ, পরশুই তাকে আনবো তা হ'লে।"

কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথার পর সরোজিনী বিদায় গ্রহণ করিল।

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে মনোরমা স্বামীর নিকট কথাটা পাড়িল।

ইন্দুবাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "বামনীর কাজ খুঁজছে, তা বামুন ত তোমার রয়েছে, কি করবে সে?"

মনোরমা কহিল, "রান্না-বান্নার কাযই যে তাকে দিয়ে করাতে চাচ্ছি, তা নয়। ঘর-কন্নার অন্য সব কাযও ত আছে। এই বিদেশে পড়ে আছি, একটা মানুষ-জন নেই, পাড়া-প্রতিবেশী নেই, দু'টো কথা কয়েওত বাঁচবো!"

ইন্দুবাবু হাসিয়া কহিলেন, "ওঃ, তোমার একটি সহচরীর দরকার, তাই বল!"

মনোরমা কহিল, "সে তুমি যাই বল। তার পর, বামুন ঠাকুরের যদি দু'দিন অসুখ-বিসুখই হ'ল, বামুনের মেয়ে, তাকে দিয়ে স্বচ্ছন্দে কায চালিয়ে নিতে পারবো। হ'ল বা, ছোটখোকাকে স্নানটা করিয়ে দিলে। এই রকম সব কায আর কি! তারপর ধর, যা সন্দেহ করছি, তাই যদি শেষে দাঁড়ায়—" বলিয়া মনোরমা লজ্জায় অবনতমুখী হইল।

ইন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে। ছোটখোকা হবার সময় কাতি ছিল, তাই অনেক উপকার পাওয়া গিয়েছিল। আচ্ছা, তুমি ত তাকে আসতে বলেছ। আসুক, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে দেখ, তার পর যা বিবেচনা হয় করা যাবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোক্ষদা আসিলে, তাহাকে দেখিয়া, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মনোরমার ভারি পছন্দ হইয়া গেল। সরোজিনী বলিয়াছিল, তাহার বয়স আঠারো উনিশ, কিন্তু মোক্ষদা নিজে বলিল, তাহার একুশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, বাইশ চলিতেছে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হইলেও কথায়-বার্ত্তায় বেশ সভ্য-ভব্য, আর, একটু লেখাপড়া-জ্ঞানও আছে। বলিল, বাল্যকালে সে স্কুলে পড়িয়াছিল, চতুর্থমান পর্য্যন্ত পড়া হইলে তার বিবাহ হয় এবং সেজন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। বাঙ্গালার সঙ্গে তিনখানা ইংরাজী কেতাবও সে পড়িয়াছিল, মিশ্রভাগ পর্য্যন্ত অঙ্ক

কষিয়া, গঃ সাঃ গুঃ কষিতেও সুরু করিয়াছিল, তা ছাড়া ভূগোল-প্রবেশ, ইতিহাস-পাঠ ইত্যাদিও পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন সে-সব আর তাহার মনে নাই। ছেলেটিও তার বেশ শিষ্ট-শান্ত। কোনওরূপ অন্যায় আব্দার নাই, দৌরাত্ম্য নাই।

মনোরমা তাহাকে খোরাক-পোষাক ও মাসিক চার টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছে। মনোরমা বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মোক্ষদা বলিয়াছিল, "আমি আর কি বলবো—আপনি বিবেচনা ক'রে যা দেবেন, তাই আমার যথেষ্ট। ভদ্রঘরে আশ্রয় পেলাম, এই আমার পরম সৌভাগ্য।"

মোক্ষদার কাপড়-চোপড়ের দুরবস্থা দেখিয়া মনোরমার বড় দুঃখ হইল। স্বামীকে বলিয়া ঠিকাদারবাবুর দ্বারা মোক্ষদা ও তাহার পুত্রের জন্য আবশ্যক বস্ত্রাদি আনাইয়া দিল। ঠিকাদারবাবু যেরূপ সস্তায় জিনিষপত্র কিনিতে পারেন, এমন আর কেহই পারে না।

মোক্ষদা মনোরমার হাতের কায কাড়িয়া নিজে করে। নিজ পুত্র অপেক্ষা মনোরমার পুত্র দুইটিকে অধিক যত্ন করিয়া থাকে। কর্ত্রী-ঠাকুরাণীকে সে 'দিদি' এবং কর্ত্তাকে 'দাদাবাবু' বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—যদিও কর্ত্তার সামনে সে বাহির হয় না, তাঁহার সঙ্গে কথা কহা ত দূরের কথা।

আজ রবিবার। রবিবার বিকালে ইন্দুবাবু অফিস যান না, এই সময় তাঁহার বাজার-দর যাচাই করিবার জন্য সহরে যাইবার কথা। কাছাকাছি কোথাও ঠিকা-গাড়ীর আড্ডা নাই, গাড়ীর আবশ্যক হইলে সেই সহরে লোক পাঠাইতে হয়। ভৃত্য গিয়াছে গাড়ী আনিতে। বড় ছেলে নগেন ম্যাচ দেখিতে গিয়াছে। ইন্দুবাবু স্ত্রীর সহিত পশ্চাতের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, দেখ, ঐ পুকুরের পাড়ে নিমগাছের তলায় ছোকরা-গোছ একজন কয়েদী দাঁড়িয়ে আছে দেখছ?"

মনোরমা বলিল, "হ্যাঁ, কে ও?"

"ও একজন সাধারণ কয়েদী নয়, ও বি-এ পাস।"

"বি-এ পাস? বল কি? চুরি করেছিল না কি?"

"না, চুরি নয়, ডাকাতী করেছিল বলা যায়। ও যে একজন মস্ত স্বদেশী।"

"কোনও স্বদেশী ডাকাতী বুঝি?"

ইন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ডাকাতীও কি স্বদেশী আর বিলিতী হয়?"

"তা নয়। দেশ উদ্ধারের জন্যে টাকা সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে যে ডাকাতী, তাকেই আমি স্বদেশী ডাকাতী বলছিলাম। ওর নাম কি? কোথায় ডাকাতী করেছিল?"

"ওর নাম শরৎ বাঁড়ুয্যে। কোথায় ডাকাতী করেছিল, তা এখন আমার মনে নেই, কিন্তু সে সময় খবরের কাগজে আমি ওর মোকর্দ্দমার কথা পড়েছিলাম।"

"কত দিনের কথা?"

"বছর তিনেক হবে, কিম্বা কিছু বেশী। আমরা তখন পাটনায়। আগে ও আলিপুর জেলে ছিল—এই মাস-দেড়েক হবে এখানে এসেছে।"

"কত দিন পরে ওর খালাস হবে?"

"পাঁচ বছর জেল হয়েছিল, এখনও বুঝি বছর-খানেক বাকী আছে।"

যাহার বিষয়ে এই আলোচনা হইতেছিল, এতক্ষণে সে লোক অদৃশ্য হইয়াছিল।

মনোরমা বলিল, "আহা, ব্রাহ্মণের ছেলে, উচ্চশিক্ষিত, দেখ দেখি একবার কর্ম্মের ভোগ! কেন বাপু, তোরা এ-সব করিস্! কি কায এখানে ওকে করতে হয়? আপিসের কায করে ত? লেখাপড়া-জানা কয়েদী যখন?"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "সাধারণতঃ লেখাপড়া-জানা কয়েদী হ'লে তাকে আপিসের কাযই দেওয়া হয় বটে, কিন্তু এ যে অসাধারণ! গভর্ণমেণ্টের হুকুম নেই। ওকে বাগানের কাযে দিয়েছি, বেশী খাটতে হয় না।"

প্রত্যেক জেলের সংলগ্ন একটা করিয়া বাগান থাকে, সেখানে জেলের খরচের জন্য শাক-সব্জী, তরকারি-পাতি উৎপন্ন করা হয়। জেলের কয়েদীরাই সে-সব বাগানের কার্য্য করিয়া থাকে।

এ সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী আসিয়াছে। ইন্দুবাবু প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

রাত্রিতে আহারাদির পর শয়ন করিয়া মনোরমা স্বামীকে বলিল, "ওগো, দেখ, আমাদের মোক্ষদা ঐ ছেলেটির সম্বন্ধে অনেক কথা জানে। তোমাতে আমাতে যখন কথা হচ্ছিল, ঘরের ভিতরে পাণ সাজতে-সাজতে ও ব'সে শুনেছিল।"

"কোন্ ছেলেটি?"

"ঐ যে তোমার বি-এ পাস করা ডাকাত, শরৎ মুখুয্যে না কি।"

"শরৎ বাঁড়ুয্যে।"

"যখন ঢাকায় ওর মোকদ্দমা হয়েছিল, খবরের কাগজে সব কথা মোক্ষদা পড়েছিল। বললে, ও ত ডাকাতী করেনি, গভর্ণমেণ্ট অন্যায় ক'রে ওকে জেলে পুরেছে। বি-এ পাশ ক'রে ঢাকা জেলার কোন্ ইস্কুলে নাকি ও হেডমাষ্টারি করত। সেখানে ওরা একটা সমিতি করেছিল। সেই গ্রামের আর আশে-পাশের গ্রামের অনেক ছোঁড়া সেই সমিতির মেম্বর ছিল। ও ছিল সেই সমিতির সভাপতি। কাছে একটা বড় গ্রামে কি সাহা নাম বললে, তার কাপড়ের দোকান ছিল। ওরা বারবার তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিলিতী কাপড় আমদানী ক'রে দোকানে বিক্রী করছিল। টাকার মহাজনীও করতো। গরীব চাষাদের বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে ক্রমে তাদের জোৎ-জমা নীলেম ক'রে নিয়ে তাদের সর্ব্বনাশ করতো; এই রকমে সেই সাহা পোড়ারমুখো অনেক টাকা জমিয়েছিল। স্বদেশীওয়ালারা কত বারণ করে, তবু সে শোনে না। তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার হিসেবেও বটে, দেশের কাজে লাগাবার জন্যে টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যেও বটে, সমিতির লোকরা নৌকা ক'রে গিয়ে এক রাতে সেই সাহা-মহাজনের বাড়ীতে ডাকাতী করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়ে। একজন মহারাণীর সাক্ষী হয়ে সব কথা প্রকাশ ক'রে দেয়। ঐ শরৎ বাঁড়ুয্যে, সেই সমিতির সর্দ্দার ছিল কি না, তাই গভর্ণমেণ্ট রাগে ওকে সুদ্ধ জেল দিয়েছে, নইলে ও নিজে ডাকাতী করে নি, ডাকাতদের সঙ্গে ছিলও না।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিও খবরের কাগজে ঐ রকমই যেন

পড়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে। তোমার সহচরী ঐ দেশেরই লোক বুঝি ?"

"না না, ওর বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী দুই-ই ত বরিশাল জেলায়। এ হ'ল ঢাকা জেলার ঘটনা, ও খবরের কাগজে সেই সময় পড়েছিল বললে।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "আমিও ত পড়েছিলাম, আমার মনে ছিল না। ওর খুব স্মরণ-শক্তি ত !"

মনোরমা বলিল, "খবরের কাগজ পড়ায় ওর ভারি সখ কি না। তোমার যে ইংরিজি কাগজ আসে, ও ত পড়তে পারে না। একদিন বলছিল, দাদাবাবু একখানা বাংলা কাগজ নেন না কেন, তা হলে আমরাও পড়তে পারি।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "একখানা ইংরিজি কাগজ নিচ্ছি, আবার একখানা বাংলা—এত টাকা কোথায় ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাসখানেক পরে, ইন্দুবাবুর পাচক ব্রাহ্মণ তিন মাসের ছুটী চাহিল। দেশে তার শ্বশুর নাকি মারা গিয়াছে, কন্যাই তার একমাত্র সন্তান, জ্যোৎজমী যাহা কিছু শ্বশুর রাখিয়া গিয়াছে, সমস্তই তাহার প্রাপ্য, কিন্তু দুষ্টপ্রকৃতি জ্ঞাতিরা সে সকল জবর দখল করিবার চেষ্টায় আছে। এই বলিয়া কয়েকদিন পরেই বামুন-ঠাকুর দেশে রওয়ানা হইল।

ঠিকাদারবাবুর সাহায্যে অন্য একজন পাচক সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। পাকশালার ভার পড়িল মোক্ষদার উপর। মনোরমাও তাহাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করে।

এইরূপ কয়েকদিন চলিলে, ইন্দুবাবু একদিন দ্বিপ্রহরে আহারে বসিয়া বলিলেন, "ওগো দেখ, সেই স্বদেশী কয়েদী শরৎ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে আজ আমার অনেক কথা হ'ল।"

"কি কথা হ'ল ?"

"সে আমায় বলছিল, 'মশাই, জেলের অন্ন খেয়ে খেয়ে আমার ত প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেল! বাড়ীর কায কর্ম্ম করবার জন্যে আপনার ত দু'জন কয়েদী সরকার থেকে বরাদ্দ আছে, আমায় যদি সেই একজনের জায়গায় নিযুক্ত করেন ত একবেলা দুটো খেয়ে বাঁচি।' —আমি বললাম, 'তুমি বি-এ পাস, তুমি কি জলতোলা, বাসনমাজা, এসব নোংরা কাজ করতে পারবে? তা ছাড়া তুমি বামুনের ছেলে, এঁটো বাসনই বা তোমায় দিয়ে মাজাই কি ক'রে? রাঁধতে জান?' সে বললে, 'কেন আপনার বামুন ত আছে।'—জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি ক'রে জানলে আমার বামুন আছে?' সে বললে, 'ঐ নাথুনী আর গুরুচরণ যারা রোজ আপনার বাসায় কাজ করতে যায়, তারা বলে যে।' আমি বললাম, 'বামুন ছিল, পালিয়েছে। রাঁধতে জান ত বল, গুরুচরণের বদলে তোমাকে নিই।' সে বললে, 'আজ্ঞে, রান্না-বান্না মোটামুটি যে না জানি, তা নয়। মা-ঠাকরুণ একটু আধটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিলেই কায চালিতে নিতে পারবো।' আমি হেসে বললাম, 'আচ্ছা, দেখি বিবেচনা ক'রে।'—কি করবো, আনবো তাকে?"

এই বি-এ পাস কয়েদী সম্বন্ধে মনোরমার মনে কিছু কৌতূহল ছিল; তা ছাড়া ব্রাহ্মণ-সন্তান ডাকাতী না করিয়াও কারাক্লেশ ভোগ করিতেছে জানিয়া তাহার উপর সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। তাই সে স্বামীর প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইল।

ইন্দুবাবু বলিলেন, "ও যে বলেছে, ওকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে, তুমি তা পারবে ত?"

মনোরমা বলিল, "সেই ত মুস্কিল। ওর সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা করবে যে!"

"কেন? কাল যদি একজন নতুন রাঁধুনী-বামুন আসে, তুমি কি তার সঙ্গে কথা কইবে না?"

মনেরেমা বলিল, "কিন্তু, সে ত বি-এ পাস হবে না!"

ইন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি ভাগ্যিস্ আমি বি-এ পাস

করি নি! তাহলে ফুলশয্যের রাত থেকে আজ পর্য্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে কথাই কইতে না বল?”

মনোরমা লজ্জিত-হাসি হাসিয়া বলিল, “কি যে বল তুমি, তার ঠিক নেই। তুমি আর ও সমান?”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুই দিন পরে শরৎ আসিয়া, স্নান করিয়া মনোরমার পাকশালায় প্রবেশ করিল। তাহার কথাবার্ত্তা, চালচলন অত্যন্ত বিনীত ও ভদ্র। মনোরমাকে গোড়াতেই মাতৃসম্বোধন করায়, তাহার সম্বন্ধে সঙ্কোচের ভাব মনোরমার মন হইতে অনেকটা দূর হইল। তথাপি মনোরমা মোক্ষদাকে বলিল, “যাও না ভাই, কি রাঁধতে হবে, বামুন-ঠাকুরকে ব'লে দাও গে না।”

মোক্ষদা জিভ কাটিয়া বলিল, “না দিদি, আমি পারবো না ওর সঙ্গে কথা কইতে। তুমি গিন্নী-বান্নি মানুষ, তুমি যাও।”

অবশেষে মনোরমা গিয়া বামুন ঠাকুরকে রান্নার বিষয় বলিল। আরও বলিল, “আমার বড় ছেলে নগেন দশটার সময় খেয়ে ইস্কুলে যাবে। বাবু খেতে বসবেন সাড়ে এগারোটায়।”

বামুন ঠাকুর বলিল, “তা হলে মা, বড়বাবুর ভাত ক'টা আগে চড়িয়ে দেবো এখন, কর্ত্তাবাবুর আর অন্য সবাইকের ভাত শেষে রাঁধবো।”

“তাই কোরো”—বলিয়া মনোরমা চলিয়া আসিল।

মাঝে মাঝে মনোরমা গিয়া আধঘোমটা দিয়া রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইল, দেখিল, বামুন-ঠাকুরের কার্য্যে কোনওরূপ ভুল হইতেছে না।

বামুন ঠাকুর দুই তিনবার শয়ন ঘরের নিকট আসিয়া ঘড়ি দেখিয়া গেল। নগেনকে যথাসময়েই সে ভাত দিল, যদিও সব রান্না তখনও তাহার হয় নাই।

ইন্দুবাবু আপিস হইতে ফিরিয়া, স্নান করিতে যাইবার সময় রান্না-

ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া, সকৌতুকে একবার বি-এ পাস বামুন ঠাকুরের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কি হে শরৎবাবু, রান্নার তোমার কতদূর?"

শরৎ বলিল "আজ্ঞে, আমায় আর বাবু ব'লে লজ্জা দেন কেন? আর সব রান্নাই আমার হয়ে গেছে, ভাতটা চড়িয়েছি, আপনি স্নান করুন, ততক্ষণ ভাতও হয়ে যাবে।"

খাইতে বসিয়া, অর্দ্ধেক খাওয়া হইলে, ইন্দুবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কি বামুন ঠাকুর নিজেই রেঁধেছে? তুমিই বোধ হয় দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছ ওকে?".

মনোরমা বলিল, "আমি কিছুই দেখিয়ে দিই নি।"

"তবে মোক্ষদা দেখিয়ে দিয়েছে বোধ হয়?"

"ও ত রান্নাঘরের ত্রিসীমানায় যায় নি। কেন, বামুন ঠাকুর রেঁধেছে কেমন?"

"বেশ রেঁধেছে গো।"—বলিয়া ইন্দুবাবু শরৎকে ডাকাইলেন।

শরৎ আসিয়া অনতিদূরে বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, "আর কি এনে দেবো?"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "আর কিছু এনে দিতে হবে না। কিন্তু শরৎ, ঠিক ক'রে বল দিকিনি, সত্যিই কি তুমি বি-এ পাস?"

শরৎ কিছু উত্তর করিল না, শুধু একটু হাসিল।

ইন্দুবাবু আবার বলিলেন, "তুমি বলেছিলে, মোটামুটি এক রকম রাঁধতে তুমি জান। এ ত মোটামুটি রকম নয়, এক্সপার্ট হাতের রান্না! এ তুমি শিখলে কি ক'রে?"

শরৎ বলিল, "আজ্ঞে, আমি যখন মাষ্টারি করতাম, তখন ছেলেদের নিয়ে আমি একটা বোর্ডিং বলুন, আশ্রম বলুম, খুলেছিলাম। আমরা আশ্রমই বলতাম। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমরা অনুসরণ করতাম, নিজের নিজের সব কায আমরা নিজেরাই করতাম—এমন কি. বাসনমাজা, ঘর-ঝাঁড় দেওয়া পর্য্যন্ত। কোনও চাকর বাকর আমাদের ছিল না। প্রথম প্রথম পাকপ্রণালী হাতের কাছে রেখে রোজই আমি নিজেই রাঁধতাম, ছেলেরা পালাক্রমে আমার সাহায্য

করত। ক্রমে তারাও সব শিখে ফেললে। তার পর, মাঝে মাঝে রাঁধতাম, পালা ছিল। হাতে-কলমে শেখা আর কি!”

ইন্দুবাবু হাসিতে লাগিলেন। মনোরমা বিস্ময় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিতে বামুন-ঠাকুরের পানে চাহিতে লাগিল। ইন্দুবাবু বলিলেন, “তোমার খালাসের বুঝি আর এক বছর বাকী আছে?”

শরৎ বলিল, “দশ মাস।”

“দশ মাস? হয় ত গুড্ কণ্ডাক্ট-এর (সচ্চরিত্রতার) জন্যে শেষ এক মাস তুমি রেহাই পাবে। তবে তুমি স্বদেশী কয়েদী, বলা যায় না, এ অনুগ্রহ গভর্ণমেণ্ট তোমায় না-ও করতে পারেন। আপাততঃ আমি ব্যবস্থা করেছি, সারাদিন তুমি আমার বাসাতেই থাকবে, ও বেলা তখন খাবার-টাবারগুলো ক'রে দিয়ে পাঁচটার সময়ে জেলে ঢুকবে। সারাদিন ব'সে তুমি কি করবে? তুমি তোমার আত্ম-জীবন-চরিত লেখ, খালাস হ'য়ে সে বই তুমি ছাপাবে। স্বদেশীর যে রকম হিড়িক, তোমার বই হু-হু করেই বিক্রী হবে। যত দিন আবার কায-কর্ম্ম একটা না যোটাতে পার, সেই বইয়ের আয়ে তোমার চ'লে যাবে।”

শরৎ বলিল, “যে আজ্ঞে, আপনার এ পরামর্শ ভাল।”

পরদিন বুড়খোকা (নগেন্দ্র) স্কুল হইতে ফিরিয়া একখানা বাঁধানো এক্সারসাইজ বুক (খাতা) বামুন ঠাকুরকে দিল। মা তাকে পয়সা দিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তিন মাস অতীত হইল, কিন্তু ইন্দুবাবুর বামুন ঠাকুর ফিরিয়া আসিল না। মনোরমা বলিল, “ওরা ত ঐ রকমই করে। একবার ছুটী নিয়ে দেশে গেলে আর সহজে আসতে চায় না।”

ইন্দুবাবু বলিলেন, “শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে তার বোধ হয় অবস্থা ফিরে গেছে, আর চাকরী করবার দরকার নেই। কায

ত চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু শরৎও বোধ হয় আর বেশী দিন এখ-
থাকবে না।"

"বদলির হুকুম এসেছে না কি?"

"না, আসেনি এখনও। কিন্তু আসতে কতক্ষণ? স্বদেশী কয়েদীকে গভর্ণমেণ্ট বেশী দিন ত এক জেলে রাখে না।"

"এখানে কত দিন হ'ল ওর?"

"মাস-ছয়েক হ'ল বুঝি।"

"ওর মেয়াদের ত আর ছ'মাস মাত্র বাকী আছে। বেশ ক- কর্ম্ম করছিল, অতি ঠাণ্ডা স্বভাব, সচ্চরিত্র—বাকী ছ'টা মাস এখ ও থাকলেই বেশ হ'ত।"

এই তিন মাসে শরৎ সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছে অন্যান্য কয়েদী যাহারা জেলরবাবুর বাড়ীতে আসিয়া গৃহকার্য্য করিবার হুকুম পায়, একটা দুর্লভ সুযোগ তাহারা লাভ করে,—লুকাইয় তামাক খাইতে পায়। বাড়ীর চাকর-বাকরের সঙ্গে ভাব করিয়া, এই সুবিধাটুকু ভোগ করিয়া লয়। কিন্তু জেলে ত তামাক খাইবার কোনই উপায় নাই। শরৎ তামাক, সিগারেট, বিড়ি কিছুই খায় না। এমন কি, আহারান্তে পাণ পর্য্যন্ত নয়। প্রথম দিন শরতের আহার হইয়া গেলে মনোরমা ভৃত্য-হস্তে দু'টি পাণ তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু শরৎ বলিয়াছিল, "মাকে বল, পাণ ত আমি খাইনে। দয় ক'রে দু'টো সুপুরি-লবঙ্গ যদি দেন ত খাই।" বড়খোকা, ছোটখোকা, এমন কি, মোক্ষদার ছেলেটির সঙ্গে পর্য্যন্ত শরতের অত্যন্ত ভাব। বড়খোকাকে, শরৎ কত দেশ-বিদেশের গল্প বলে, বিশেষ নেপোলিয়নের যুদ্ধের গল্প এমন সুন্দর করিয়া বলিতে পারে যে, শুধু বড় খোকা নহে, মনোরমা, মোক্ষদাও শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। মনোরমা ত বলে, 'ও আমার বড় ছেলে।' মোক্ষদা মাথায় কাপড় দেয় বটে, কিন্তু শরতের সঙ্গে রীতিমত কথা কহে। পূর্ব্বে ইন্দুবাবু মনোরমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার সহচরীটাকে শরতের কাছে বেশী যেতে-টেতে দিও না। দু'জনেরই পূরো সোমত্ত বয়স; জান ত, চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, ঘি আর আগুন— [illegible] সঙ্গে রাখবে না।"

মনোরমা বলিয়াছিল, "সে বুদ্ধি কি আমার নেই? হাজার হোক গেরস্তর মেয়ে আমাদের আশ্রয়ে রয়েছে। ওর ভাল-মন্দ আমাকেই দেখতে হবে ত!"

কিন্তু অল্পে অল্পে এ নিষেধ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। একদিন মোক্ষদাকে শরতের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া ইন্দুবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মোক্ষদা এখন শরতের সঙ্গে কথা কয় দেখছি।"

মনোরমা বলিয়াছিল, "এক বাড়ীতে থেকে কথা না কইলে চলে? এ'টনো কুটে দেওয়া, বাটনা বেটে দেওয়া, রান্না-বান্নার যোগাড় ক'রে না,দওয়া, সবই ত এখন মোক্ষদাই করে। ওগো, শরৎ সে ছেলে নয়, অ দেবচরিত্র পুরুষ। ওরা দু'জনে রান্নাঘরে ব'সে কায-কর্ম্ম করছে, কতদিন এমন আমি আচম্‌কা গিয়ে পড়েছি, কখনও দু'জনকে কথাবার্ত্তা কইতে দেখিনি। গম্ভীর মুখ। কেউ কারু পানে তাকায়ও না।"

যে-দিন স্ত্রীর সহিত ইন্দুবাবুর শরতের অন্য জেলে বদলি হইবার প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার এক সপ্তাহ পরে তিনি আপিস হইতে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, শরতের বদলির হুকুম এসেছে।"

"কোথা?"

"বক্সার সেণ্ট্রাল জেলে।"

"কবে যেতে হবে?"

"পাঁচ দিন পরে।"

ইন্দুবাবু শরৎকে ডাকিয়াও খবরটা দিলেন। শুনিয়া সে মুখখানি চুণ করিয়া রহিল।

শরতের বদলির সংবাদে বাড়ীসুদ্ধ সকলেই দুঃখিত।

ইন্দুবাবু বলিলেন, "ঠিকাদারবাবুকে বলি, যদি জানাশুনো একটা ভাল বামুন যোগাড় করে দিতে পারেন।"

শেষ দিন কর্ম্ম করিয়া বিকালে জেলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শরৎ মনোরমাকে বলিল, "মা, এ-ক'মাস আপনার বাড়ীতে বড় সুখেই ছিলাম। যেন বাড়ীর ছেলের মত ছিলাম—আমি যে জেল খাটছি, তা আমার মনেই হত না। কাল বেলা ন'টার সময় আমায় নিয়ে যাবে। যাবার আগে একবার আপনার পায়ের ধূলো নিয়ে যেতে চাই। আপনি বাবাকে ব'লে

হুকুমটা করিয়ে দেবেন, নইলে ত সে সময় আমাকে আসতে দিন এখ—

মনোরমা সজল নয়নে স্বীকৃত হইল।

পরদিন যথাসময়ে শরৎ আর আসিল না।

আজ মোক্ষদাই রাঁধিবে। তবে আজ ফতেহাদোয়াজ দাহম-এর ছুটি বলিয়া নগেনের স্কুল নাই। রান্নার তাড়াতাড়ি নাই।

সাতটার সময় যখন জেলরবাবু আপিসে যাইতেছিলেন, তখন মনোরমা তাঁহাকে শরতের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল। ইন্দুবাবু বলিলেন, "আমি গিয়েই তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ইন্দুবাবু চলিয়া গেলে মনোরমা মোক্ষদাকে বলিল, "তুমি তা হ'লে স্নান-টান সেরে নিয়ে রান্নার যোগাড় দেখ। তোমার স্নান হয়ে গেলে আমিও স্নান ক'রে রান্নাঘরে যাব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অন্য দিন অপেক্ষা আজ একটু সকালেই—সাড়ে দশটা না বাজিতেই ইন্দুবাবু আপিস হইতে বাড়ী ফিরিলেন। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় মনোরমা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ইন্দুবাবু বলিলেন, "কি গো, কোথায় ছিলে?"

"রান্না করছিলাম।"

"কেন, মোক্ষদা?"

মনোরমা মুখখানি গম্ভীর করিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। তার পর বলিল, "ওর হাতে আমাদের আর খাওয়া চলবে না।"

"কেন, কি হয়েছে?"

মনোরমা থামিয়া থামিয়া বলিল, "ও—খারাপ—মেয়ে!"

ইন্দুবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ? সে কি? কে বললে? কোথা শুনলে তুমি?"

"আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। ভাত চড়িয়ে দিয়ে এসেছি, এখনও ফুটতে দেরী আছে। সব কথা বলি, শোন।"—বলিয়া মনোরমা একখানা চেয়ারে বসিল।

ইন্দুবাবু শঙ্কিত-নেত্রে স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "কি, বল ঋ ?"

তখন মনোরমা বলিতে লাগিল, "তুমি আপিস যাবার সময়, শরৎকে পাঠিয়ে দিতে তোমায় বললাম ত ? সে আটটার সময় আমায় প্রণাম করতে এল। মোক্ষদা তখন স্নানের ঘরে, আমি এই ঘরে ব'সে তেল মাখছি। শরৎ এসে আমার কাছে বসল। সে থাকতে থাকতেই মোক্ষদা স্নানের ঘর থেকে বেরুল, বেরিয়ে ওদিকে চ'লে গেল। তার পর শরৎ আমায় প্রণাম ক'রে বিদায় নিলে, আমি স্নানের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করলাম। স্নান করতে গিয়ে দেখি, আমার গামছাখানা নেই। আবার বেরিয়ে, গামছা খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরের বাইরে দেখি, শরৎ আর মোক্ষদা দু'জনে জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মোক্ষদার মাথা শরতের কাঁধের উপর, দু'জনে একবারে জ্ঞানশূন্য। তার পর মোক্ষদার মাথাটা শরৎ তুলে, তার মুখে চুমু খেয়ে, চোখ মুছতে মুছতে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মনে করেছিল, গিন্নীমাগী স্নানের ঘরে বন্ধ, কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।"

"তুমি যে দাঁড়িয়ে আছ, তা শরৎ দেখলে ?"

"না।"

"আর মোক্ষদা ?"

"মোক্ষদা আমায় দেখলে বৈকি—একটু পরেই।"

"তুমি কি বললে ?"

"রাগে আমার ব্রহ্মাণ্ড জ্ব'লে যাচ্ছিল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থরথর ক'রে কাঁপছিলাম। মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুচ্ছিল না। কোনও রকমে শুধু বললাম, 'মোক্ষদা, তুমি আর রান্নাঘরে ঢুকো না।' —ব'লেই আমি গামছাখানা নিয়ে স্নানের ঘরে গেলাম। প্রায় পনেরো মিনিট স্নান করতে পারলাম না, কাঠের মূর্ত্তির মত ব'সে রইলাম। তার পর স্নান সেরে মাথা মুছতে মুছতে ও-ঘরে গিয়ে দেখি, কয়েদীদের নিয়ে যাবার জন্যে জেলের গাড়ী ফটকে দাঁড়িয়ে আছে, আর মোক্ষদা জানালার গরাদে ধ'রে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে ফটকের পানে চেয়ে আছে। আমি যে ঢুকেছি, তা বিবির হুঁস পর্য্যন্ত নেই।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "অ্যাঁ, তুমি দেখে ফেলেছ জেনেও? পরেও লজ্জা-সরম একেবারে বিসর্জ্জন?"

মনোরমা বলিল, "ওগো, বুঝছ না, ধরা প'ড়ে দু'কাণ-কাটা হয়ে গেল কি না! এক কাণ-কাটা যায় গাঁয়ের বা'র দিয়ে, দু'কাণ-কাটা যায় গাঁয়ের ভিতর দিয়ে।"

"কোথা সে এখন? পালিয়েছে বোধ হয়?"

"পালাবে কেন? নিজের বিছানায় শুয়ে, বিরহিণী বোধ হয় বিরহের কান্না কাঁদছেন!"

ইন্দুবাবু কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকার পর থামিয়া থামিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "সংসারে মানুষ চেনবার উপায় নেই! ঐ পাজিটাকেই তুমি একদিন বলেছিলে—দেবচরিত্র পুরুষ! আর তাও ঐ মোক্ষদারই সম্বন্ধে। আর মোক্ষদাও যে এমন ভিজে বেড়ালটি, তা ত একদিনের জন্যেও সন্দেহ হয় নি। ছি ছি ছি, ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে এ কি কাণ্ড! দুপুর বেলা আমি ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুই। তুমিও মাঝে মাঝে সহরে বন্ধুবান্ধবের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছ। দিব্যি সুযোগটি পেয়েছিল ওরা। ছি ছি ছি! চুলোয় যাক! এখন, কি করা যায় বল দেখি?"

মনোরমা বলিল, "ঝাঁটা মেরে বিদায় করা ছাড়া আর কি করবার আছে? তুমি স্নান ক'রে ফেল, আমার ভাতও বোধ হয় হয়ে এল।"

আহারান্তে ইন্দুবাবু শয্যায় বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। তামাকটা শেষ হইলেই শয়ন করিবেন।

মনোরমা মোক্ষদার ভাত বাড়িয়া অবহেলাভরে তাহার ঘরে থালাখানা ফেলিয়া আসিয়া, স্বামীর পাতে নিজে খাইতে বসিল।

ইন্দুবাবু তামাকটা শেষ করিয়া, কি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইবেন সেই জন্য একটা বই-টই খুঁজিতেছিলেন, এমন সময় বড়খোকা একখানা খাতা হাতে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাবা, শরৎ দা' তার আত্মজীবনীখানি ফেলে গেছে।"

ইন্দুবাবু অন্য বহি না খুঁজিয়া, কৌতূহলবশতঃ সেইখানা হাতে লইয়াই শয়ন করিলেন। প্রথমে শেষটা দেখিলেন, সমাপ্ত হইয়াছে